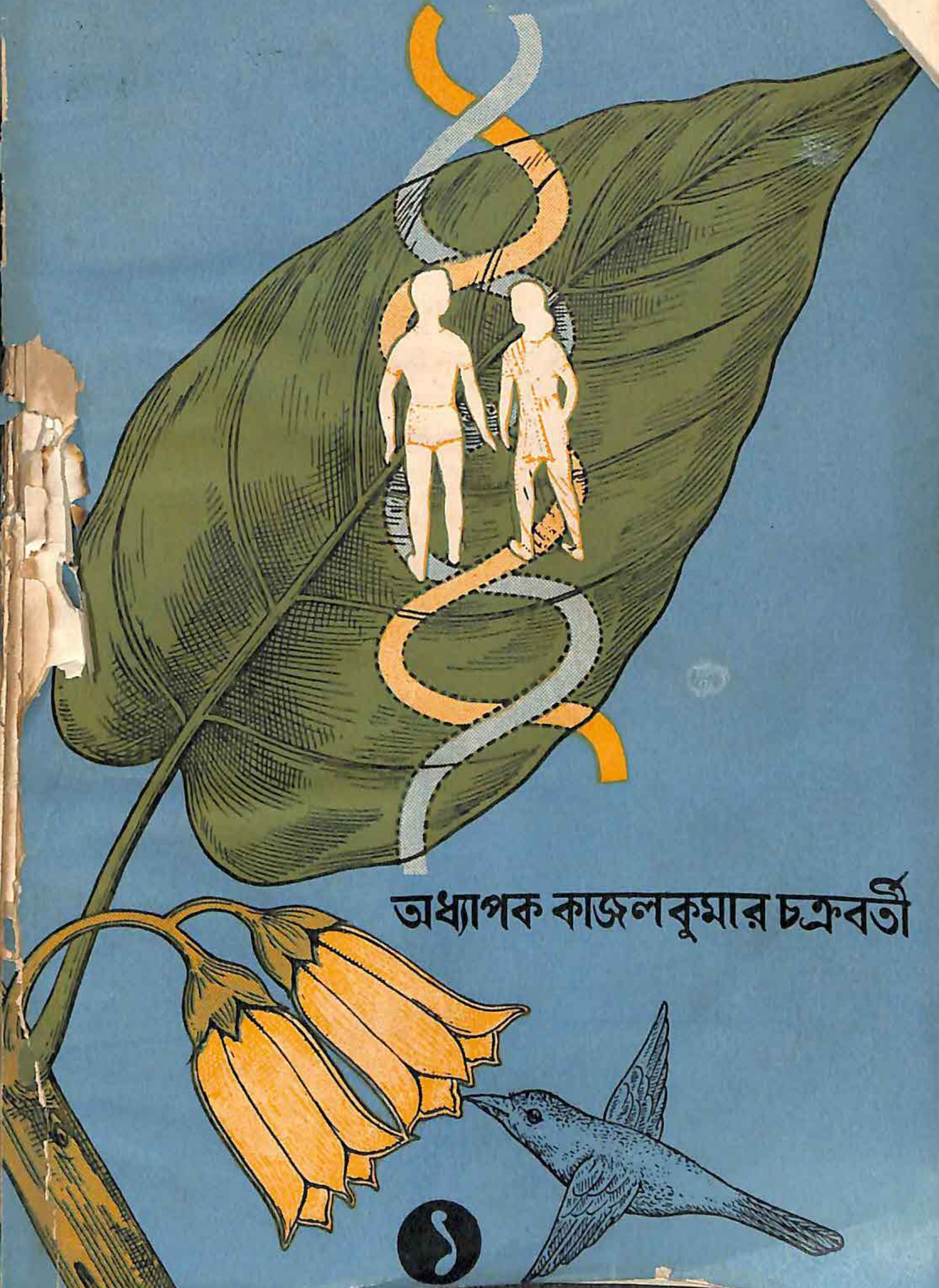
প্রাণ বিজ্ঞান



অধ্যাপক কাজলকুমার চক্রবর্তী

১

প্রকাশক :
শ্রীদীনেশচন্দ্র বসু
মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল, ১৯৭৬
সংশোধিত সংস্করণ : ডিসেম্বর, ১৯৭৬
দ্বিতীয় সংস্করণ : ডিসেম্বর, ১৯৭৭

মূল্য : ৪ টাকা ৮০ পয়সা মাত্র।

চিত্রাঙ্কন : শ্রীচিত্রকুমার রায়

মুদ্রাকর :
শ্রীপ্রদীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
মানসী প্রেস
৭৩, মানিকতলা স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ মাধ্যমিক পর্যায়ে দশ-শ্রেণীর নূতন পাঠক্রমে জীবন বিজ্ঞানকে অবশ্যপাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। বিজ্ঞানের এই নূতন শাখাটি এতদিন শিক্ষাক্ষেত্রে তার নির্দিষ্ট স্থান থেকে বঞ্চিত ছিল। মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণ এবং সর্বতোভাবে জীবনমুখী করার জন্য যে পরিকল্পনা করেছেন তার জন্য ধন্যবাদার্হ।

মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানশিক্ষা শিক্ষার্থীদের কাছে সহজবোধ্য হয়। কিন্তু জীবনবিজ্ঞানের আলোচনায় বহু ইংরাজী, ল্যাটিন ও গ্রীক প্রতিশব্দের বাংলায় কোনও পরিভাষা না থাকায় সেগুলির বিদেশী প্রতিশব্দের সাথে বাংলা ভাষায় যা পরিভাষা হওয়া উচিত তাও দেওয়া হয়েছে। নবম শ্রেণীর প্রাণবিজ্ঞান রচনাকালে পরিভাষা বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত পরিভাষা ও চলন্তিকা অভিধানে নির্দিষ্ট পরিভাষা এবং ভাষা ও বানান বিষয়ে সংসদ অভিধান ও চলন্তিকা অভিধান অনুসরণ করেছি। পুস্তক রচনা বিষয়ে পর্ষৎ কর্তৃক প্রকাশিত জীবনবিজ্ঞান সহায়িকা অনুসরণ করে প্রতিটি বিষয়ের আধুনিক তত্ত্ব ও তথ্য যথাসম্ভব সহজবোধ্য ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। প্রতি পরিচ্ছেদের বিষয়বস্তুর সকল প্রকার প্রশ্ন এবং মৌখিক প্রশ্নগুলি পুস্তকের শেষ অংশে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। আশা রাখি এই পুস্তকটি শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন মেটাতে সাহায্য করবে। এই পুস্তক বিষয়ে মাননীয় শিক্ষক মহাশয়গণের যে কোনও গঠনমূলক সমালোচনা সানন্দে গৃহীত হবে।

এই পুস্তক রচনায় আমার ভ্রাতৃপ্রতিম সহকর্মী অধ্যাপক সুজিতকুমার দত্ত, এম. এস-সি., ডি. ফিল., অধ্যাপক অম্বুজকুমার পাল, এম এস-সি., পি. এইচ. ডি., অধ্যাপক কুন্তল চট্টোপাধ্যায়, এম. এস-সি., পি. এইচ. ডি., এবং ডঃ সুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রিডার, ভূগোল-বিজ্ঞান, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় বহুভাবে সাহায্য করায় আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। পরিশেষে এই পুস্তক প্রকাশে মডার্ণ বুক এজেন্সীর পরিচালকমণ্ডলী এবং কর্মিবৃন্দের সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ইতি—

গুরুদাস কলেজ
জীববিদ্যা বিভাগ
১৯৭৬ সাল।

কাজলকুমার চক্রবর্তী

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় মধ্যশিক্ষা পর্ষদকে জীবন বিজ্ঞানকে পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছিলাম। বর্তমানে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক মহাশয়গণ ও শিক্ষিকা মহাশয়াদের এবং ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করে প্রাণবিজ্ঞান পাঠ্যতালিকার বিষয়বস্তু যে কতখানি আগ্রহের সঞ্চার করেছে তা জানতে পেরেছি, কেবলমাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্যই নয়, ব্যক্তিগত জীবনেও বিজ্ঞানের এই শাখার অবদান অনস্বীকার্য। এই সংস্করণে পুস্তকের বিভিন্ন বিষয়বস্তুর সহজ আলোচনা এবং কোনও কোনও স্থানে কিঞ্চিৎ সংযোজনও করেছি। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের মাধ্যমিক এবং উচ্চমাদ্রাসা পরীক্ষার প্রশ্নগুলি (মৌখিক এবং লিখিত) প্রশ্নমালায় যুক্ত করেছি। মাননীয় শিক্ষক মহাশয়গণ এবং ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে পুস্তকটি গৃহীত হলে আনন্দিত হব। দ্বিতীয় সংস্করণে পুস্তকটির বিভিন্ন বিষয়ে সাহায্যের জন্য শ্রীমান অরুণাভ দাস (গুরুদাস কলেজ), শ্রীমান প্রশান্তকুমার সেন (কেশব একাডেমী), শ্রীমান ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী (পাঁচপোতা ভারাডাঙ্গা বিদ্যালয়) এবং শ্রীমান শঙ্করকুমার চক্রবর্তীকে (নরসিংহ দত্ত কলেজ) আশীর্বাদ জানাচ্ছি। ইতি—

গুরুদাস কলেজ—জীববিদ্যা বিভাগ
১৯৭৭, ডিসেম্বর

কাজলকুমার চক্রবর্তী

সূচীপত্র

9700

প্রথম পরিচ্ছেদ

সালোকসংশ্লেষ ও শ্বসনের তাৎপর্য
(Significance of Photosynthesis & Respiration)

প্রতিটি সজীব বস্তুর জীবন বিভিন্ন প্রকার অত্যাবশ্যক উপাদানের নিয়মিত সরবরাহ ও জৈবিক কার্যের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির উপর নির্ভরশীল। এই সকল উপাদান জীবদেহের বৃদ্ধি, গঠন ও ক্ষতিগ্রস্ত অংশের পূরণ করে। উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহে এই শক্তির সাহায্যে শারীরবৃত্তীয় কার্য, পরিবেশের পরিবর্তনের সাথে নিজেকে মানিয়ে নেয়া এবং পেশীর সংকোচন ইত্যাদি যাবতীয় কার্য ঘটে।

প্রাণী বা উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রকার জৈবিক কার্যের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি তাদের মধ্যে সঞ্চিত খাদ্য দহনের (জারণের) ফলে সৃষ্টি হয়। কিন্তু প্রাণী বা উদ্ভিদের মধ্যে একমাত্র উদ্ভিদ সূর্যের আলো এবং ক্লোরোফিল দ্বারা কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জল সহযোগে শ্বেতসার খাদ্য তৈরী করতে পারে। এইজন্য উদ্ভিদকে স্বভোজী (Autotrophic) বলে। শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য থেকে পরে স্নেহ ও প্রোটিন জাতীয় খাদ্য উৎপন্ন হয়। প্রাণীদের মধ্যে একমাত্র কয়েকটি এককোষী প্রাণী (ইউগ্লিনা) ব্যতীত কেহই নিজেদের খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে না, সকলেই খাদ্যের জন্য উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। সেইজন্য প্রাণীদের পরভোজী (Heterotrophic) বলে। উদ্ভিদ যে খাদ্য উৎপন্ন করে তার বেশ কিছু পরিমাণ কোষের মধ্যে সঞ্চিত রাখে এবং প্রাণীরা সেই খাদ্য গ্রহণ করে জীবন ধারণ করে। উদ্ভিদের খাদ্য প্রস্তুতকরণকে **সালোকসংশ্লেষ** এবং উদ্ভিদ ও প্রাণীর খাদ্য দহনের দ্বারা শক্তি উৎপন্ন করাকে **শ্বসন** বলে। সুতরাং সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদদেহে খাদ্য উৎপাদন হয়, এই প্রকার বিপাককে **গঠনমূলক বিপাক বা উপচিতি** (Anabolism) এবং শ্বসনের ফলে খাদ্য ধ্বংস হয় বলে এই প্রকার বিপাককে **ধ্বংসমূলক বিপাক** বা **অপচিতি** (Katabolism) বলে।

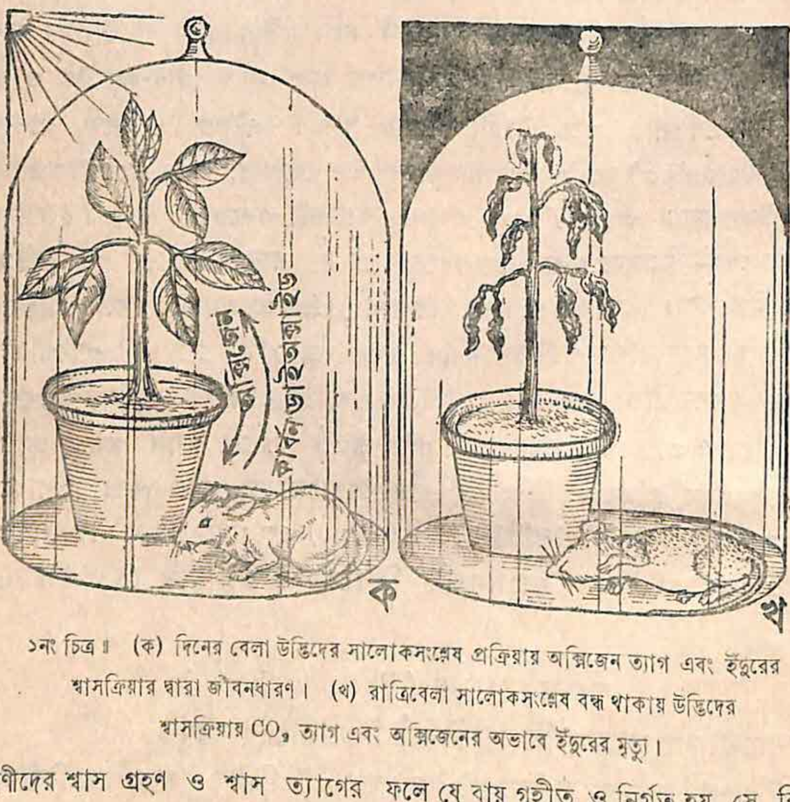
সালোকসংশ্লেষ (Photosynthesis)

সালোকসংশ্লেষের বিষয়ে বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের কার্য ঃ

উদ্ভিদেরা নিজেদের খাদ্য নিজেরাই তৈরী করে এই সিদ্ধান্ত বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর প্রমাণিত হয়েছে। পূর্বে ধারণা ছিল যে, উদ্ভিদ তার মূলের সাহায্যে মাটি থেকে খাদ্য শোষণ করে। ১৬৪৮ খ্রীস্টাব্দে **ভন হেলমণ্ট** (Von Helmont)

নামে একজন বিশিষ্ট ডাচ বিজ্ঞানী মাটি থেকে উদ্ভিদ প্রকৃত খাদ্য নেয় কিনা তা পরীক্ষা করেছিলেন। তিনি একটি ছোট উইলো গাছ একটি মাটি ভর্তি পিপার মধ্যে লাগিয়ে শুধুমাত্র বৃষ্টির জল গোড়ায় দিতে থাকেন। পাঁচ বৎসর পরে ক্ষুদ্র গাছটি বর্ধিত হয়ে একটি ছোট-খাটো বৃক্ষে পরিণত হয় এবং এই সময় গাছটির ওজন প্রায় ৭৪ কেজিতে দাঁড়ায়। হেলমণ্ট পরীক্ষার দ্বারা মাটির ওজন সামান্য কমেছে বলে দেখেন। তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে, মাটি থেকে নয় জল থেকেই উদ্ভিদটির ওজন বেড়েছে এবং মূল, কাণ্ড, শাখা ও প্রশাখার বৃদ্ধি হয়েছে। উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে জলের অবদান বিষয়ে তাঁর ধারণা যে কিছু পরিমাণ সত্য তা বর্তমানে জানা গিয়েছে।

সালোকসংশ্লেষের প্রকৃত রহস্য ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে **জোসেফ প্রিস্টলের** (Joseph Priestley) কাজের মাধ্যমে জানতে পারা যায়। তিনি প্রথমে উদ্ভিদ ও



১নং চিত্র। (ক) দিনের বেলা উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন ত্যাগ এবং ইঁদুরের শ্বাসক্রিয়ার দ্বারা জীবনধারণ। (খ) রাত্রিবেলা সালোকসংশ্লেষ বন্ধ থাকায় উদ্ভিদের শ্বাসক্রিয়ায় CO_2 ত্যাগ এবং অক্সিজেনের অভাবে ইঁদুরের মৃত্যু।

প্রাণীদের শ্বাস গ্রহণ ও শ্বাস ত্যাগের ফলে যে বায়ু গৃহীত ও নির্গত হয় সে বিষয়ে অনুসন্ধান করার সময় একটি ইদুরকে বেলজারের মধ্যে রাখার অল্প সময়ের মধ্যে ইদুরটির মৃত্যু হয়েছে দেখেন। তিনি স্থির করেন যে, শ্বাস ত্যাগ কালে দূষিত বায়ু

নির্গত হওয়ায় ইঁদুরের মৃত্যু হয়েছে এবং প্রকৃতিতে নিশ্চয়ই উদ্ভিদ ও প্রাণীদের শ্বাস ত্যাগের ফলে যে-দূষিত বায়ু জন্মায় তা শোধন করার ব্যবস্থা আছে। উদ্ভিদেরা নিশ্চয়ই বায়ু শোধনের সঙ্গে কোনও-না-কোনও ভাবে জড়িত, এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি পূর্বের ন্যায় বেলজারের মধ্যে ইঁদুরের সাথে একটি ছোট চারা গাছ সূর্যের আলোয় রেখে দেখেন যে, ইঁদুরটি না মরে বেশ সুস্থই আছে। এর দ্বারা তিনি প্রমাণ করেন যে, প্রাণীদের শ্বাসক্রিয়ায় পরিত্যক্ত দূষিত বায়ু উদ্ভিদ শোধন করছে। প্রিস্টলে দিনের আলোয় সবুজ উদ্ভিদের উপস্থিতিতে ইঁদুরের মৃত্যু হয় না দেখেছিলেন কিন্তু রাত্রিবেলা কি ঘটতে পারে তা বুঝতে পারেননি।

১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দে ডাচ চিকিৎসক **জন ইনজেন হাউজ** (John Ingen Housz) অন্য একটি পরীক্ষার মাধ্যমে দেখান যে, রাত্রিবেলা বেলজারের মধ্যে ইঁদুর ও চারা গাছ রাখলেও ইঁদুরের মৃত্যু। তিনি প্রাণীদের ন্যায় উদ্ভিদও দূষিত বায়ু পরিত্যাগ করে বলে ধারণা করেন। প্রিস্টলে বা ইনজেন হাউজ কেহই শ্বাসক্রিয়ায় গৃহীত বা নির্গত বায়ুটি কি তা জানতেন না। পরে **আঁটোয়নি ল্যাভোসিয়র** (Antoine Lavoisier) নামে ফরাসী রসায়নবিজ্ঞানী শ্বাসগ্রহণ ও শ্বাস ত্যাগকালে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড গৃহীত ও পরিত্যক্ত হয় তা আবিষ্কার করেন। জ্যাঁ সেনেবিয়ার (Jean Senebier); ডি সসারে (de Saussure) ইত্যাদি বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের বহুদিনের শ্রম ও কাজের দ্বারা সালোকসংশ্লেষে বায়ুর কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণের ফলে শ্বেতসার জাতীয় ও অন্যান্য খাদ্যের উৎপাদন ও অক্সিজেন নির্গত হওয়ার কথা জানতে পারা গেছে।

সালোকসংশ্লেষের সংজ্ঞা ঃ

যে জটিল প্রক্রিয়ায় মূলরোম দ্বারা মাটি থেকে শোষিত জল ও বাতাস থেকে গৃহীত কার্বন ডাই-অক্সাইড উদ্ভিদের পাতার ক্লোরোফিল ও সূর্যালোকের সাহায্যে সরল শর্করায় পরিণত হয়, সেই প্রক্রিয়াকে সালোকসংশ্লেষ বা ফটোসিন্থিসিস বলে।

সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন রঞ্জক পদার্থ ঃ

ইনজেন হাউজ তাঁর সালোকসংশ্লেষের পরীক্ষায় প্রমাণ করেন যে, উদ্ভিদের সবুজ অংশেই কেবলমাত্র অক্সিজেন নির্গত হয়, কিন্তু মূল, কাণ্ড, ফুল বা ফল থেকে নির্গত হয় না, বরং শ্বাসকার্যের প্রয়োজনে অক্সিজেন গৃহীত হয়। বর্তমানে জানা গিয়েছে, **ক্লোরোফিল** (Chlorophyll) নামক সবুজ রঞ্জক পদার্থ পাতায় বা কাণ্ডে থাকলে সালোকসংশ্লেষ ক্রিয়া ঘটে। রাসায়নিক গঠন অনুযায়ী ক্লোরোফিল অণুর মধ্যে

সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় সূর্যালোকে নিহিত শক্তি অত্যাবশ্যক, তবে যে পরিমাণ সূর্যালোক পাতায় পড়ে তার অতি অল্পপরিমাণই এই প্রক্রিয়ায় লাগে। উদ্ভিদের পাতায় সূর্যালোক পতিত হওয়ার আগেই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে অবস্থিত বিভিন্ন গ্যাস, জলীয় বাষ্প ও ধূলিকণা বেশ কিছু পরিমাণ আলোক বিকিরণ শোষণ করে। সূর্যালোকের যে পরিমাণ বিকিরণ পাতার উপর আঘাত করে তার মধ্যে প্রায় ৫০% শোষিত হয়। সমগ্র শোষিত বিকিরণ সালোকসংশ্লেষে ব্যবহৃত হয় না, কেবল মাত্র ১%—৩% শোষিত বিকিরণ সালোকসংশ্লেষে ব্যবহৃত হয়।

সালোকসংশ্লেষে পাতার বিভিন্ন কোষের কার্য ঃ

বাজার থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করে কারখানায় বিভিন্ন প্রক্রিয়া দ্বারা বহুপ্রকার পণ্যবস্তু ও যন্ত্রাদি উৎপন্ন করা হয়। অনুরূপভাবে মূল দ্বারা মাটি থেকে শোষিত জল জাইলেমবাহিকার মাধ্যমে পাতায় উপস্থিত হয়। পাতার পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে বায়ু থেকে সংগৃহীত কার্বন ডাই-অক্সাইড ও পূর্বে শোষিত জল, পাতার ক্লোরোফিলের সাহায্যে সূর্যালোক থেকে কারখানার বিদ্যুৎ শক্তির মত আলোক শক্তি সংগ্রহ করে শর্করা উৎপাদন করে। **এইজন্য পাতাকে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার কারখানা বলা হয়।**

একটি **বিষম পৃষ্ঠ** (Dorsiventral) পাতার প্রস্থচ্ছেদ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করলে বিভিন্ন প্রকার কলা দেখা যায়। পাতার উপরের পৃষ্ঠ একস্তর স্বচ্ছ কোষ দ্বারা গঠিত, এর মধ্যে সামান্য ক্লোরোফিল থাকে, একে **উর্ধ্ব ত্বক** (Upper epidermis) বলে। এই কোষস্তর স্বচ্ছ হওয়ায় সহজেই সূর্যালোক পরবর্তী কোষে প্রবেশ করে। উর্ধ্ব কোষস্তরের বাইরের দিকে স্বচ্ছ মোমজাতীয় পদার্থ—কিউটিন থাকায় পাতা হতে জলীয় বাষ্প মোচন বাধাপ্রাপ্ত হয়। উর্ধ্বত্বকের মত পাতার ফলকের নিম্নের অংশ একই প্রকার কোষ দ্বারা গঠিত—একে **নিম্নত্বক্** (Lower epidermis) বলে। বিষম পৃষ্ঠ পাতার নিম্নত্বকে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে, এদের **পত্ররন্ধ্র** বা **স্টোমাটা** (Stomata) বলে। প্রতিটি পত্ররন্ধ্র দুটি অর্ধচন্দ্রাকার বা বাংলা পাঁচের আকারের (৫) সোজা ও উল্টা করে সাজানো (৫৲) কোষ দ্বারা গঠিত—এদের **প্রহরী কোষ** (Guard cell) বলে। এই কোষ দুটি পাতার মধ্যে বায়ু চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে।

উর্ধ্ব ও নিম্নত্বকের মধ্যে **মেসোফিল** কলা অবস্থিত। মেসোফিল কলার উর্ধ্বত্বকের নিচের অংশ এক বা দুইসারি স্তম্ভাকার ঘনসংবদ্ধ **প্যালাইসেড প্যারেনকাইমা** (Palisade parenchyma) কোষ দ্বারা গঠিত। এই কোষগুলির অভ্যন্তরে

প্রাচীরের ধারে বহু ক্লোরোপ্লাস্ট শ্রেণীবদ্ধভাবে সাজানো থাকে। এই ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে অবস্থিত ক্লোরোফিল সূর্যালোক থেকে শক্তি শোষণ করে সালোকসংশ্লেষে অংশ গ্রহণ করে। নির্দিষ্ট আকারবিহীন প্রায় গোলাকার আলগাভাবে সাজানো পরবর্তী কোষস্তরকে **স্পঞ্জী প্যারেনকাইমা** (Spongy parenchyma) বলে। এই কোষেও সামান্য পরিমাণ ক্লোরোপ্লাস্ট আছে। প্যালাইসেড প্যারেনকাইমার মধ্যে উৎপন্ন খাদ্যবস্তু এই কোষগুলিতে সাময়িকভাবে সঞ্চিত থাকে। এই কোষগুলির অন্তর্বর্তী অঞ্চলে বায়ুস্থান থাকায় এবং বায়ুস্থানগুলি পরস্পর সংযুক্ত হয়ে পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে মুক্ত হওয়ায়, পত্ররন্ধ্র দ্বারা গৃহীত কার্বন ডাই-অক্সাইড ও সালোকসংশ্লেষে উৎপন্ন অক্সিজেন পাতার অভ্যন্তরে ও বায়ুর মধ্যে বিনিময় হয়।

পাতার মধ্যে শিরা ও উপশিরা **নালিকা বাণ্ডিল** (Vascular bundle) দ্বারা গঠিত। নালিকা বাণ্ডিলের **জাইলেমবাহিকা** জল ও অন্যান্য খনিজ বস্তু পাতায় বহন করে এবং সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত খাদ্য **ফ্লোয়েম** কলার মাধ্যমে উদ্ভিদদেহের বিভিন্ন অংশে সরবরাহ হয়।

সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া :

সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় শর্করা উৎপাদনের জটিল রাসায়নিক সমীকরণ হচ্ছে—

$$6CO_2 + 12H_2O \xrightarrow[\text{(ক্লোরোফিল)}]{\text{সৌরশক্তি 673 Kilo cal}} C_6H_{12}O_6 + 6O_2 + 6H_2O$$

(ছয় অণু কার্বন ডাই-অক্সাইড) (বার অণু জল) (ক্লোরোফিল) (এক অণু শর্করা) (ছয় অণু অক্সিজেন) (ছয় অণু জল)

রাসায়নিক প্রক্রিয়াটি দেখলে শর্করা উৎপাদন অত্যন্ত সরল মনে হয়, কিন্তু শর্করা উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায় অত্যন্ত জটিল এবং সেগুলির সব বিষয় এখনও সম্পূর্ণ জানা নেই।

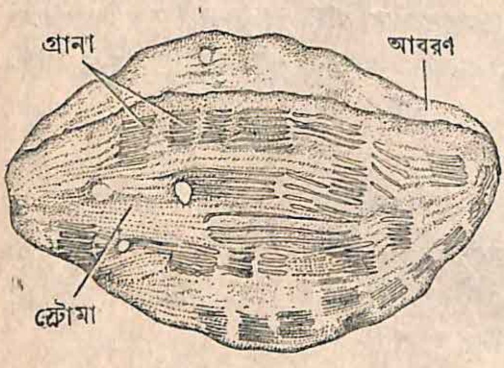
এই সমীকরণে ছয় অণু কার্বন ডাই-অক্সাইড, বার অণু জল, সৌরশক্তি ও ক্লোরোফিলের দ্বারা এক অণু গ্লুকোজ ($C_6H_{12}O_6$) উৎপন্ন করে তা দেখান হয়েছে। পূর্বে সালোকসংশ্লেষে সরাসরি গ্লুকোজ উৎপন্ন হয় মনে করা হত, কিন্তু বর্তমানে গবেষণায় ফ্রাকটোজ প্রথমে উৎপন্ন হয় বলে জানা গিয়েছে। এই সমীকরণে সৌরশক্তির পরিমাণ প্রায় ৬৭৩ কিলো ক্যালোরি লাগে এবং এই শক্তি এক অণু শর্করার মধ্যে রাসায়নিক শক্তিরূপে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। যদি এক গ্রাম মলিকিউলার ওজনের শর্করাকে (প্রায় ১৮০ গ্রাম) জারণ করা হয় তাহলে এই পরিমাণ শক্তির উদ্ভব হয়।

কার্বন (C), হাইড্রোজেন (H), নাইট্রোজেন (N), অক্সিজেন (O), ব্যতীত অণুর কেন্দ্রে **ম্যাগনেসিয়াম** (M_g) থাকে। সবুজ উদ্ভিদ ও বহু শৈবালের ক্লোরোফিল রাসায়নিক গঠন অনুযায়ী দুই ভাগে বিভক্ত; যথা—**ক্লোরোফিল এ** (Chlorophyll a) এবং **ক্লোরোফিল বি** (Chlorophyll b)।

ক্লোরোফিল সূর্যালোকের বর্ণালীর সাতটি বর্ণের মধ্যে লোহিত আলো সবচেয়ে বেশী পরিমাণ শোষণ করে এবং এর পরেই বেগুনী আলো শোষণের পরিমাণ অধিক। কিন্তু সবুজ আলো কম পরিমাণে শোষণ করায় ঐ বর্ণের আলো প্রতিফলিত হয়ে পাতাকে সবুজ দেখায়। ক্লোরোফিল ব্যতীত উদ্ভিদের আরও কয়েক প্রকার রঞ্জক পদার্থ আছে। যথা—**জ্যান্থোফিল**, **ক্যারোটিন** ইত্যাদি। এই রঞ্জক পদার্থগুলি ফুল, টম্যাটো ও গাজর ইত্যাদিতে দেখা যায়। আলোর যে বর্ণগুলি ক্লোরোফিল গ্রহণ করে না সেগুলির মধ্যে যে শক্তি নিহিত তা জ্যান্থোফিল, ক্যারোটিন ইত্যাদি গ্রহণ করে। পরে গৃহীত শক্তি ক্লোরোফিলে সরবরাহ দ্বারা সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় সাহায্য করে।

ক্লোরোফিলের অবস্থান ঃ

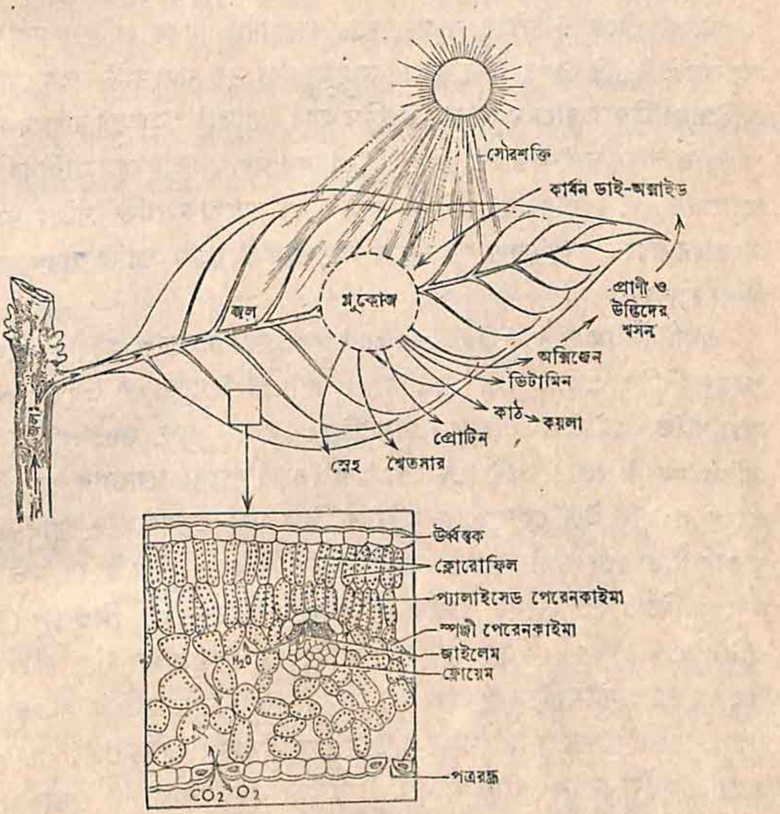
ক্লোরোফিল উদ্ভিদ কোষের সবুজ কণিকা বা **ক্লোরোপ্লাস্টের** (Chloroplast) মধ্যে থাকে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ক্লোরোপ্লাস্টের আকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিমের মত দেখতে, কিন্তু অনেক শৈবালে কাপ, ডিম বা বিস্কুটের আকারেরও হয়। শক্তিশালী ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ (Electron microscope) যন্ত্রের দ্বারা ক্লোরোপ্লাস্টের আভ্যন্তরিক গঠন জানা গিয়েছে। সমগ্র ক্লোরোপ্লাস্টের চারদিকে দ্বিস্তরবিশিষ্ট অত্যন্ত সূক্ষ্ম আবরণীর অভ্যন্তরে সূক্ষ্ম কণিকাকার বস্তুপূর্ণ **স্ট্রোমার** (Stroma) মধ্যে বহু বেলনাকার বস্তু দেখা যায়। বেলনাকার বস্তুগুলি স্তরে স্তরে সাজান মুদ্রা বা চাকতির ন্যায় আকারবিশিষ্ট হয়। এর এক একটিকে গ্রানাম বলে। প্রতিটি গ্রানাম দ্বিস্তরবিশিষ্ট এবং এদের মধ্যে ক্লোরোফিল অণুগুলি অবস্থিত। গ্রানামগুলিকে একত্রে **গ্রানা** (Grana) বলে।



২নং চিত্র ॥ ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ক্লোরোপ্লাস্টের আভ্যন্তরিক গঠনের দৃশ্য

পাতার সূর্যালোক বিকিরণ শোষণ ঃ

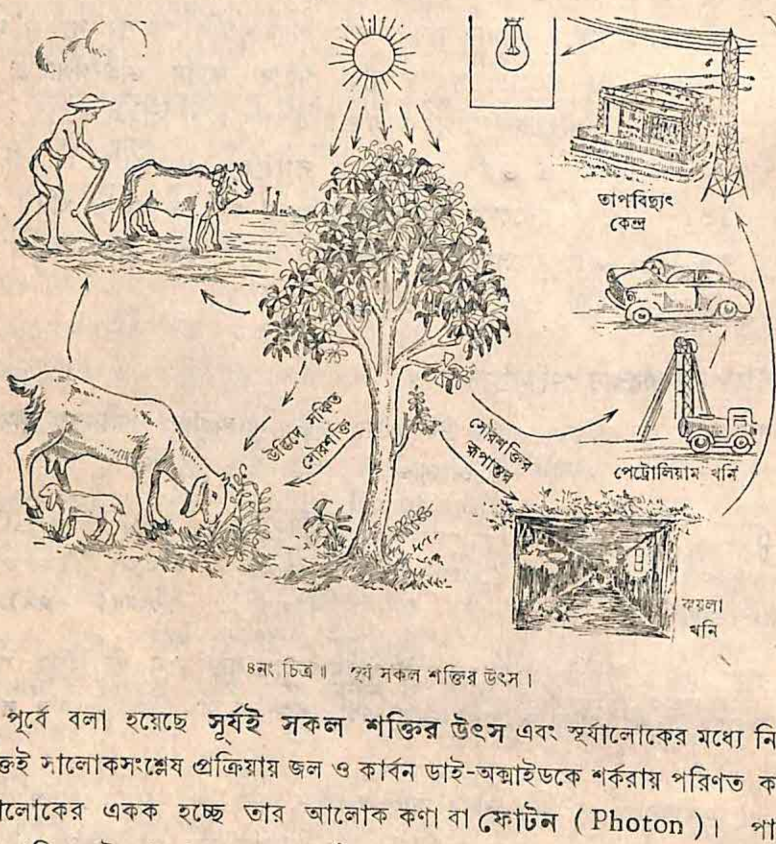
পৃথিবীতে সকল শক্তির উৎসই হচ্ছে সূর্য। সূর্যালোকে যে শক্তির বিকিরণ হয় তা শোষণ দ্বারা উদ্ভিদ খাদ্য উৎপাদন করে এবং প্রাণীরা সেই খাদ্য আহার করে জীবন ধারণ করে। উদ্ভিদ ও প্রাণীর যাবতীয় কার্য এই শক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়। কালক্রমে উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃতদেহ পচন ক্রিয়ার দ্বারা সৌর শক্তির মুক্তি ঘটে অথবা বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক কারণে উদ্ভিদ কয়লায় এবং প্রাণী ও উদ্ভিদ পেট্রোলিয়ামে রূপান্তরিত হয়। আধুনিক সভ্যতায় কয়লা এবং পেট্রোলিয়াম অত্যাবশ্যক বস্তু। কারণ পেট্রোল ও কয়লার সাহায্যে যেমন মোটর গাড়ি ও



৩নং চিত্র। সালোকসংশ্লেষের ফলে গ্লুকোজ ও অন্যান্য পদার্থ উৎপাদন এবং বিভিন্ন কোষের কার্য।

রেলগাড়ি চলছে এবং উড়োজাহাজ উড়ছে সেই রকম কয়লার সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে ট্রাম গাড়ি চলছে, পাখা ঘুরছে, বাড়িতে আলো জলছে, কলকারখানা চলছে।

সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় জল ও কার্বন ডাই-অক্সাইড উদ্ভিদ তাদের পরিবেশ থেকেই সংগ্রহ করে। স্থলে জাত উদ্ভিদ তাদের মূলদ্বারা মাটি থেকে জল ও বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে। **জলজ উদ্ভিদ জলের মধ্যে দ্রবীভূত কার্বন ডাই-অক্সাইড** ও জলের উপরে ভাসমান পাতার পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে বায়ুর কার্বন ডাই-অক্সাইড দ্বারা সালোকসংশ্লেষ ক্রিয়া চালায়।



৪নং চিত্র। সূর্য সকল শক্তির উৎস।

পূর্বে বলা হয়েছে **সূর্যই সকল শক্তির উৎস** এবং সূর্যালোকের মধ্যে নিহিত শক্তিই সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় জল ও কার্বন ডাই-অক্সাইডকে শর্করায় পরিণত করে। সূর্যালোকের একক হচ্ছে তার আলোক কণা বা **ফোটন** (Photon)। পাতার ক্লোরোফিল এই আলোক কণা বা ফোটন সূর্যালোক থেকে শোষণ করে তেজস্ক্রিয় হয়। এই তেজস্ক্রিয়তার ফলে ক্লোরোফিল জলের মূল উপাদান হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনকে পৃথক করে। সালোকসংশ্লেষের বিভিন্ন বিক্রিয়ায় আলোকের প্রয়োজন হয় না বলে বর্তমানে জানা গেছে এবং কার্বন ডাই-অক্সাইডকে শর্করার মধ্যে আবদ্ধ করা আলোকের উপস্থিতিতে বা অন্ধকারেও হতে পারে।

বর্তমানে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় দুটি নির্দিষ্ট পর্যায় আছে তা ব্রিটিশ উদ্ভিদ বিজ্ঞানী

ব্ল্যাকম্যানের (F. F. Blackman) কাজের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে—একটি পর্যায়কে **আলোক বিক্রিয়া** (Light reaction) এবং অন্যটিকে **অন্ধকার বিক্রিয়া** (Dark reaction) বলে।

আলোক বিক্রিয়া (Light reaction) **:**

সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় সূর্যালোক উদ্ভিদের পাতায় পড়বার পর বিভিন্ন প্রকার বিক্রিয়া চলতে থাকে। এই পর্যায়ে আলোক থেকে শক্তি সংগ্রহ করে রাসায়নিক বিক্রিয়া চলতে থাকে বলে একে **আলোকরাসায়নিক বিক্রিয়া** (Photo-chemical reaction) বলে। এই সকল বিক্রিয়াকে তিনটি নির্দিষ্ট ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা—(১) মূল দ্বারা শোষিত জল হাইড্রোজেন (H^+) ও অক্সিজেনে (O) বিভক্ত হয় এবং (২) অ্যাডেনোসিন্ ট্রাইফসফেট (ATP) নামক শক্তি সরবরাহকারী বস্তু আলোক শক্তির দ্বারা উৎপন্ন হয়। এই কার্যকে **ফটোফসফোরিলেসন্** (Photophosphorylation) বলে। (৩) জল অণু বিভাজনের ফলে উৎপন্ন ইলেক্ট্রন (Electron) ও হাইড্রোজেন NADP (**নিকোটিনামাইড অ্যাডেনাইন-ডাই-নিউক্লিওটাইড ফসফেট**) নামক গ্রাহক কর্তৃক সংগৃহীত হয়ে পরবর্তী অন্ধকার বিক্রিয়ায় কার্বন ডাই-অক্সাইডকে বিজারিত করে।

(১) **জল অণুর বিভাজন :** আলোক শক্তির একক—ফোটন শোষণের ফলে ক্লোরোফিল তেজস্ক্রিয় হয়ে জল অণুকে হাইড্রোজেন (H^+) ও হাইড্রোক্সিল (OH^-) আয়নে বিশ্লেষণ করে ($H_2O \rightleftharpoons H^+ + OH^-$), এই প্রক্রিয়াকে **ফটোলিসিস** (Photolysis) বলে। হাইড্রক্সিল আয়ন (OH^-) পরে বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে অক্সিজেন ও জল উৎপন্ন করে এবং অক্সিজেন পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে বায়ুতে নির্গত হয়। সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় নির্গত অক্সিজেন জল থেকে উৎপন্ন হয়, কার্বন ডাই-অক্সাইড থেকে যে হয় না তা অক্সিজেন **আইসোটোপ** (Isotope) ব্যবহার করে প্রমাণিত হয়েছে। কোনও বস্তুর পরমাণুভার পরিবর্তিত করলেও যদি রাসায়নিক গুণ একই থাকে —তাদের আইসোটোপ বলে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অক্সিজেনের পরমাণুভার 16 এবং অক্সিজেন আইসোটোপের পরমাণুভার 18। এদের O^{16} (সাধারণ অক্সিজেন পরমাণু) এবং O^{18} (আইসোটোপ) এইরূপে লেখা হয়। মূল দ্বারা শোষিত জলে এই প্রকার O^{18} আইসোটোপ ব্যবহার করলে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় পত্ররন্ধ্র দিয়ে নির্গত বায়ুতে O^{18}-এর উপস্থিতি, জল থেকেই অক্সিজেন নির্গত হয় তা প্রমাণ করে।

(২) ATP—উৎপাদন

আলোক শক্তির দ্বারা ক্লোরোফিলের ও জল অণুর ইলেকট্রনগুলি তাড়িত হয়ে উচ্চ-শক্তিতে রূপান্তরিত হয়, কিন্তু অনির্দিষ্ট কালের জন্য এই অবস্থায় থাকতে পারে না। ইলেকট্রনগুলি ক্রমশ তাদের পূর্ববর্তী অবস্থায় ফিরে আসতে চায় এবং এই সময় তারা শক্তি ত্যাগ করে। এই শক্তি অ্যাডেনোসিন ডাই ফসফেট (ADP) ও অজৈব ফসফেট সংযোগে ATP উৎপন্ন করে। আলোক শক্তি এইভাবে কোষের মধ্যে ATP-তে বাঁধা পড়ে এবং পরবর্তী বিক্রিয়ায় শক্তির যোগান দিয়ে শর্করা উৎপাদন করে। আবার শর্করা জারণের ফলে অতিরিক্ত ATP উৎপন্ন হয়ে বিভিন্ন জৈবিক ক্রিয়ায় সাহায্য করে। কোষের প্রয়োজনে প্রাপ্তিসাধ্য শক্তি ATP তৎক্ষণাৎ যোগান দেয় বলে ATPকে কোষের "**এনার্জি কারেন্সি**" (Energy Currency) বলা হয়। ATP উৎপাদনের সমগ্র বিক্রিয়াকে ফটোফসফোরিলেসন্ বলে।

(৩) এই পর্যায়ে জল অণু বিভাজনের ফলে উৎপন্ন ইলেকট্রন ও হাইড্রোজেন NADP-র সাথে মিলিত হয়ে বিজারিত করার ফলে $NADPH_2$ উৎপন্ন হয়।

আলোক বিক্রিয়ায় উৎপন্ন ATP ও $NADPH_2$ অন্ধকার বিক্রিয়ার আলোক-বিহীন অবস্থাকেও পরিচালিত করে। **আলোক বিক্রিয়া ক্লোরোপ্লাস্টের গ্রানার মধ্যে এবং অন্ধকার বিক্রিয়া বর্ণহীন স্ট্রোমার মধ্যে সংঘটিত হয়।**

অন্ধকার বিক্রিয়া (Dark reaction) :

এই বিক্রিয়ায় কার্বন ডাই-অক্সাইড ATP ও $NADPH_2$ দ্বারা আবদ্ধ হয়ে শর্করা উৎপন্ন করে। ATP প্রয়োজনীয় শক্তি যোগায় এবং $NADPH_2$ কার্বন ডাই-অক্সাইডকে প্রয়োজনীয় বিজারণ করে। কার্বন ডাই-অক্সাইড বন্ধনের বিক্রিয়া একটি চক্রাকার শৃঙ্খলে আবর্তিত হয়। কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রথমে একটি পাঁচ-কার্বনযুক্ত **রিবিউলোজ ডাইফসফেট** (Ribulose diphosphate) নামক পাতার কোষে উৎপন্ন রাসায়নিক পদার্থের সাথে যুক্ত হয়ে অস্থায়ী ছয় কার্বনযুক্ত যৌগে পরিণত হয়। এই যৌগ তৎক্ষণাৎ দুইটি তিন-কার্বনযুক্ত পদার্থে বিভক্ত হয়। এই দুইটি পদার্থ হচ্ছে তিন-কার্বন **ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড** (3-Phosphoglyceric acid বা PGA)। এই পদার্থটি সালোকসংশ্লেষের প্রথম স্থায়ী পদার্থ বলে জানা গেছে।

তিন-কার্বন ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিডকে $NADPH_2$ তার হাইড্রোজেন ব্যবহার দ্বারা বিজারিত করে **ফসফোগ্লিসারলডিহাইড** (PGAL) উৎপন্ন করে। গ্লিসারলডিহাইড হচ্ছে তিন-কার্বন শর্করা এবং এরূপ দুটি শর্করা অণুর মিলনে

ফ্রাকটোজ উৎপন্ন হয়। এই প্রক্রিয়ায় পাঁচ কার্বন রিবিউলোজ ডাইফস্‌ফেট মুক্ত হয় এবং অন্য একটি কার্বন ডাই-অক্সাইড অণুর সাথে মিলিত হয়ে একই উপায়ে শর্করা উৎপন্ন করে। অন্ধকার বিক্রিয়ার চক্র বিশিষ্ট বিজ্ঞানী **মেলভিন কেলভিন** (Melvin Calvin) ও তাঁর সহকর্মীরা আবিষ্কার করেন। তাঁরা $C^{14}O_2$ আইসোটোপ শৈবালের সালোকসংশ্লেষে ব্যবহার করে C^{14} কিভাবে একটি অণু থেকে অন্য অণুতে সঞ্চারিত হয় তা লক্ষ্য করেন। এই কাজের জন্য কেলভিনকে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়।

সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয় শর্তগুলি ঃ বিভিন্ন পরীক্ষার দ্বারা সালোকসংশ্লেষে প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক বা বাহ্যিক ও উদ্ভিদের দেহের আভ্যন্তরিক কারণগুলি জানা গেছে।

(ক) **প্রাকৃতিক শর্ত ঃ** (১) **সূর্যালোক ঃ** সালোকসংশ্লেষের জন্য সূর্যালোক অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কারণ এই আলোর মধ্যে যে শক্তি নিহিত আছে তা ক্লোরোফিলকে তেজস্ক্রিয় করে **আলোক-রাসায়নিক শক্তিতে** (Photo-chemical energy) রূপান্তরিত হয়। এই শক্তি প্রতি গ্লুকোজ অণুতে বাঁধা পড়ে এবং গ্লুকোজ জারণে পুনর্বার মুক্তি পায়।

(২) **কার্বন ডাই-অক্সাইড** ব্যতীত সালোকসংশ্লেষ দ্বারা শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত হয় না। শ্বেতসার খাদ্যের প্রধান উপাদান হচ্ছে—কার্বন যা বায়ুর কার্বন ডাই-অক্সাইড থেকে সরবরাহ হয়।

(৩) **জল**—শ্বেতসার খাদ্যের অন্যতম উপাদান এবং জলের অভাবে সালোকসংশ্লেষ বন্ধ হয়ে যায়।

(৪) **তাপ**—৩৫°—৩৭° সেন্টিগ্রেড তাপ সালোকসংশ্লেষের পক্ষে উপযুক্ত। যদিও 0° সেন্টিগ্রেড তাপেও সালোকসংশ্লেষ হয় কিন্তু অধিক তাপে (৪৫° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার উপরে) সালোকসংশ্লেষ হয় না।

(খ) **আভ্যন্তরিক শর্ত ঃ** পাতার সবুজ **ক্লোরোফিল** সূর্যের আলো থেকে শক্তি শোষণ দ্বারা তেজস্ক্রিয় হয়ে **অনুঘটকের** (Catalysts) কাজ করে এবং সালোকসংশ্লেষ দ্বারা গ্লুকোজ উৎপন্ন করে। যে সকল উদ্ভিদে ক্লোরোফিল থাকে না তারা সালোকসংশ্লেষ ক্রিয়া করতে পারে না। যথা, আলোকলতা (স্বর্ণলতা) ও ছত্রাক।

দিন ও রাত্রে উদ্ভিদ ও বায়ুর মধ্যে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড বিনিময় ঃ একটি সাধারণ ধারণা আছে যে, উদ্ভিদ দিনের বেলা সালোকসংশ্লেষ

ও রাত্রি বেলা শ্বাসকার্য করে। প্রকৃতপক্ষে উদ্ভিদ দিন ও রাত্রি সকল সময়েই শ্বাসকার্য চালিয়ে কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিত্যাগ করে। তবে দিনের বেলায় কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হওয়া মাত্র তা সূর্যের আলোর উপস্থিতির জন্য সর্বদা সক্রিয় ক্লোরোফিলের সাহায্যে সালোকসংশ্লেষের ফলে শর্করা উৎপন্ন করে। রাত্রিবেলা সূর্যালোকের অভাবে ক্লোরোফিল সক্রিয় না থাকায় উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্সাইড পত্ররন্ধ্র দিয়ে বায়ুতে মিশে যায়।

সালোকসংশ্লেষের তাৎপর্য ঃ

(ক) **খাদ্য উৎপাদন ঃ** উদ্ভিদের পাতার সবুজ কণার ক্লোরোফিলের সাহায্যে বায়ুর কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং মাটির জল থেকে শর্করা জাতীয় খাদ্য উৎপাদন করে। এই খাদ্য খেয়ে প্রাণীরা জীবন ধারণ করে। **ক্লোরেলা** নামে একপ্রকার এককোষী শৈবাল আছে যাদের কৃত্রিম আলোক সরবরাহ করে সালোকসংশ্লেষ ঘটানো যায় এবং এর দ্বারা প্রচুর শর্করা, প্রোটিন ও অন্যান্য খাদ্য উৎপাদন করে মানুষের খাদ্যের অভাব পূরণ করা যেতে পারে।

(খ) **সৌরশক্তি সঞ্চয় ঃ** সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ সূর্যালোক থেকে সৌরশক্তি খাদ্যের মধ্যে সঞ্চিত করে। এক গ্রাম-অণু গ্লুকোজের সম্পূর্ণ জারণে ৬৭৩ কিলো ক্যালোরি তাপ উৎপন্ন হয় এবং প্রাণী বা উদ্ভিদের সকল জৈবিক ক্রিয়া এর দ্বারা সচল থাকে।

(গ) **বায়ুতে অক্সিজেনের পরিমাণ অপরিবর্তিত রাখায় সাহায্য ঃ** সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় যে পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড লাগে তার সমপরিমাণ অক্সিজেন বায়ুতে পত্ররন্ধ্র দিয়ে বেরিয়ে যায়। এই অক্সিজেন প্রাণী ও উদ্ভিদ শ্বাসক্রিয়ায় গ্রহণ করে আবার সমপরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড বায়ুতে পরিত্যাগ করে। যদি এই কার্বন ডাই-অক্সাইড উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষ গ্রহণ না করে তবে বায়ুতে এর পরিমাণ বেড়ে জীবের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর অবস্থার সৃষ্টি করবে। এজন্য ঘনবসতি অঞ্চল বা শিল্পাঞ্চলের যে স্থানে কল-কারখানার ধোঁয়া ও শ্বাস ত্যাগের ফলে বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেশী সে স্থানে অধিক সংখ্যায় গাছপালা থাকা বাঞ্ছনীয়, কারণ এরা বায়ু থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার মাধ্যমে জানা গেছে যে, **১৩০ বর্গমিটার পাতার পৃষ্ঠ থেকে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় যে পরিমাণ অক্সিজেন পরিত্যক্ত হয় তার দ্বারা একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের শ্বসন একবৎসর ভালভাবে চলে**। বায়ুর মধ্যে এই গ্যাসের পরিমাণ কমিয়ে মনুষ্য ও অন্যান্য জীবের প্রাণধারণের উপযোগী আবহাওয়ার সৃষ্টি করে।

শ্বসন (Respiration)

প্রাণী বা উদ্ভিদের জীবনের প্রধান লক্ষণ হচ্ছে শ্বাসকার্য বা শ্বসন এবং এই কার্য জীবজগতের পক্ষে অতি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। প্রতিটি জীবের বাঁচার জন্য সর্বদা কিছু পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন। এই শক্তি জীবের কোষের মধ্যে সঞ্চিত খাদ্যবস্তু শ্বসনের ফলে জারিত হয়ে উৎপন্ন হয়। জীব যতদিন বাঁচে ততদিন তাদের দেহে শ্বসন চলে এবং এই কার্য বন্ধ হলে জীবের মৃত্যু হয়।

শ্বসন ও শ্বাসকর্মের পার্থক্য ঃ

উদ্ভিদ ও প্রাণীর শ্বসন তাদের প্রতিটি জীবিত কোষের মধ্যে ঘটে। কিন্তু যে পদ্ধতিতে বায়ুর অক্সিজেন দেহের মধ্যে গৃহীত হয়ে কোষে বাহিত হয় এবং শ্বসনের ফলে কোষে উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্সাইড পুনর্বার বায়ুতে নির্গত হয় তাকে **শ্বাসকর্ম** (Breathing) বলে। বায়ু থেকে জীবের অক্সিজেন গ্রহণকে **প্রশ্বাস** (Inspiration) এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড বর্জনকে **নিশ্বাস** (Expiration) বলে। সাধারণতঃ **শ্বসন** ও **শ্বাসকর্মকে** ভুল করে একই প্রকারের কার্য মনে করা হয়। প্রকৃত-পক্ষে শ্বসনের আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়াকেই শ্বাসকর্ম বলে। শ্বাসকর্ম এক প্রকার যান্ত্রিক প্রণালী যার ফলে বিভিন্ন শ্বাসযন্ত্র, যথাক্রমে – চর্ম, ফুলকা ও ফুসফুস ইত্যাদির সাহায্যে রক্তের সাথে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের বিনিময় ঘটায়। **উদ্ভিদের কোন শ্বাসযন্ত্র না থাকায় শ্বাসকর্ম হয় না।**

শ্বসনের সঙ্গে মোটর গাড়ির ইঞ্জিনের তুলনা ঃ

শ্বাসকর্ম যদিও যান্ত্রিক পদ্ধতি কিন্তু অক্সিজেন সহযোগে কোষের মধ্যে খাদ্যবস্তুর **জারণের** (Oxidation) ফলে তাপশক্তির এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হওয়া রাসায়নিক পদ্ধতি। এই প্রক্রিয়ার সাথে মোটর গাড়ির ইঞ্জিনের সিলিণ্ডারের মধ্যে পেট্রোল বাষ্প ও বায়ুর মিশ্রণে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালিত করে বিস্ফোরণ ঘটানোর সঙ্গে তুলনা করা যায়। এই বিস্ফোরণের ফলে যে শক্তি উৎপন্ন হয় তারদ্বারা মোটর গাড়ির ইঞ্জিন কার্য শুরু করে এবং গাড়ি চলতে থাকে।

জীবের চলন ও অন্যান্য জৈবিক কার্যের জন্য প্রয়োজনীয় তাপশক্তি তাদের দেহের কোষের মধ্যে খাদ্যে সঞ্চিত স্থৈতিক শক্তি যা সৌরশক্তি থেকে উৎপন্ন হয়—তার জারণের ফলে গতি শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। মোটর ইঞ্জিনের পেট্রোলের ন্যায় জীবদেহের কোষে শর্করা অক্সিজেন সহযোগে জারিত হয়ে ধীরে ধীরে শক্তি উৎপন্ন করে। শ্বসনের ফলে উদ্ভূত তাপশক্তি দ্বারা জীব বিভিন্ন প্রকার জৈবিক কার্য চালায় এবং কার্যের ফলে

জীবদেহের খাদ্যবস্তু ভেঙে যায় বলে এই কার্যকে **অপচিতি (Catabolism)** বলে। অপচিতি একপ্রকার ধ্বংসমূলক বিপাক ক্রিয়া। প্রাণীদের চেয়ে উদ্ভিদের বিপাক কম হওয়ায় শ্বসনের পরিমাণও প্রাণী অপেক্ষা উদ্ভিদের কম।

শ্বসনের সংজ্ঞা :

জীবদেহে অক্সিজেন গ্রহণের ফলে কোষস্থ খাদ্যবস্তুতে সঞ্চিত স্থৈতিক শক্তিকে জারণের দ্বারা তাপশক্তিতে রূপান্তর এবং এই বিক্রিয়ায় যে কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয় তার বহিষ্করণ—সমগ্র পদ্ধতিকে শ্বসন (Respiration) বলে।

শ্বাসকার্যে অক্সিজেনের উৎস : সজীব বস্তুদের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককোষী ও বহুকোষী প্রাণী বা উদ্ভিদ তাদের পরিবেশের জল বা বায়ু থেকে সরাসরি কোষের সাহায্যে অক্সিজেন গ্রহণ এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিত্যাগ করে। এই সূত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, **অক্সিজেন বায়ুতে শতকরা প্রায় ২১ ভাগ এবং জলে ৩৭° সেণ্টিগ্রেড তাপমাত্রায় শতকরা ০৫ ভাগ থাকে।**

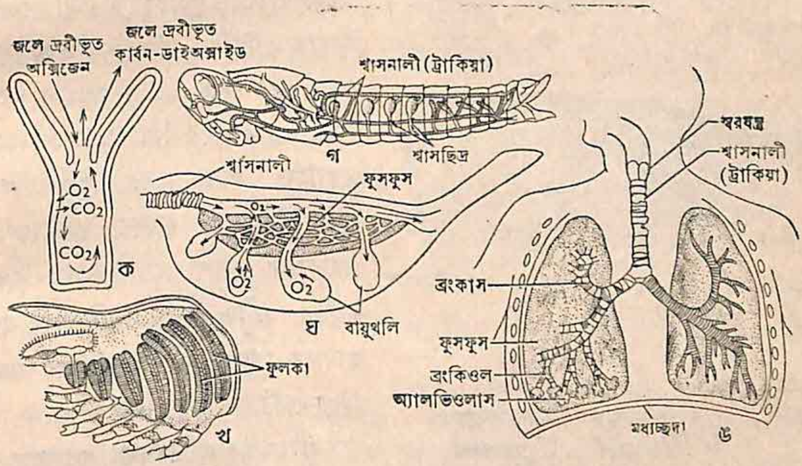
উচ্চশ্রেণীর প্রাণীদের মত উদ্ভিদের দেহে কোন শ্বাসতন্ত্র বা অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিবহনকারী কোন তরল পদার্থ (রক্ত) নেই। উদ্ভিদ দেহের বিভিন্ন অঞ্চলের কোষ স্থানীয় পরিবেশ থেকে বায়ুর বিনিময় ঘটায়। কিন্তু নিম্নশ্রেণীর প্রাণী থেকে উচ্চশ্রেণীর প্রাণীদের দেহে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিবহনকারী তরল পদার্থ (জল ও রক্ত) থাকায় নির্দিষ্ট শ্বাসযন্ত্রের মাধ্যমে বায়ুর বিনিময় ঘটে। বিশেষত উচ্চশ্রেণীর প্রাণীদের শ্বাসযন্ত্র অপেক্ষাকৃত জটিল হয়।

প্রাণীদের শ্বসন

প্রাণীদের শ্বাসযন্ত্র : প্রাণিজগতে প্রধানত চার প্রকারের শ্বাসযন্ত্রের দ্বারা শ্বাসকার্য চলে। যথা—(১) **চর্ম** বা **ত্বক** (Skin), (২) **শ্বাসনালী** (Trachea), (৩) **ফুলকা** (Gills) এবং (৪) **ফুসফুস** (Lungs) ইত্যাদি। এই যন্ত্রগুলি ব্যতীত আরও কয়েক প্রকার আনুষঙ্গিক শ্বাসযন্ত্রও বিভিন্ন প্রাণীতে দেখা যায়।

(১) **চর্ম বা ত্বক :** বিভিন্ন জলজ প্রাণী সরাসরি জলের মধ্যে দ্রবীভূত অক্সিজেন তাদের ত্বকের দ্বারা গ্রহণ করে পরবর্তী আভ্যন্তরিক কোষগুলির মধ্যে ব্যাপন ক্রিয়ায় পরিবাহিত করে। শ্বাসকার্যে যে কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয় তাও ত্বকের মাধ্যমে জলে পরিত্যক্ত হয়। বিভিন্ন আদ্য প্রাণী (অ্যামিবা, প্যারামেসিয়াম), স্পঞ্জ, এককনালী-

দেহী (হাইড্রা, ওবেলিয়া) ইত্যাদি প্রাণীর মধ্যে এই প্রকারে শ্বাসকার্য চলে। স্থলচর প্রাণীদের মধ্যে কেঁচো, জোঁক ও ব্যাঙ ইত্যাদি প্রাণীর ভিজা চর্মের অভ্যন্তরে প্রচুর রক্তনালীর জালক থাকায় সহজেই বায়ু হতে অক্সিজেন গ্রহণ করে শ্বাসকার্য চালায় এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিত্যাগ করে। বিশেষত ব্যাঙ **শীতঘুম** বা **শীতস্তম্ভের** (Hibernation) সময়ে **চর্মশ্বাস** দ্বারা জীবন ধারণ করে। ব্যাঙ মুখবিবরের অভ্যন্তরে ত্বকের দ্বারাও শ্বাসকার্য চালাতে পারে।

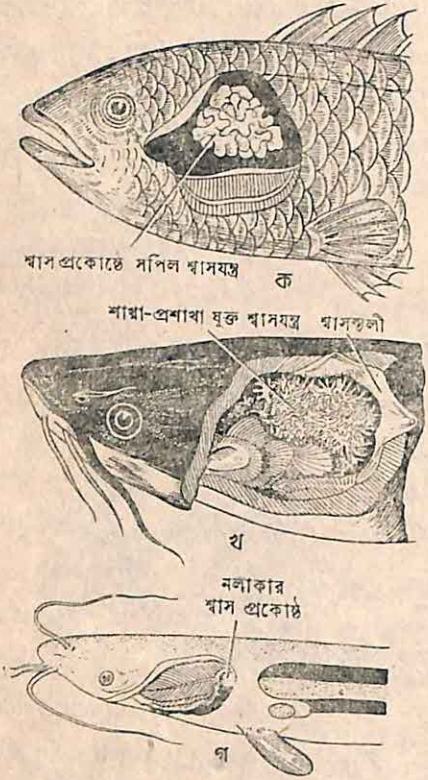


৫নং চিত্র॥ প্রাণীদের বিভিন্ন প্রকার শ্বাসযন্ত্র—(ক) হাইড্রা, (খ) চিংড়ি, (গ) পতঙ্গ, (ঘ) পাখী ও (ঙ) মানুষ।

(২) **শ্বাসনালী ঃ** স্থলচর পতঙ্গশ্রেণীর প্রাণীদের দেহের অভ্যন্তরে অনেক সরু সরু শ্বাসনালী বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে উপশ্বাসনালী বা ট্রাকিওলে (Trachecles) বিভক্ত হয় এবং এগুলি পরস্পর সংযুক্ত হয়ে জালের আকার ধারণ করে। শ্বাসনালীগুলি দেহের বাইরে শ্বাসছিদ্র দ্বারা উন্মুক্ত হয় এবং উপশ্বাসনালীগুলি কোষে শেষ হয়। দেহের বিভিন্ন অংশে পেশীর সংকোচন ও প্রসারণের ফলে শ্বাসছিদ্র (Spiracle) দ্বারা অক্সিজেন দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং শ্বাসনালী ও উপশ্বাসনালীর দ্বারা কোষের মধ্যে সরবরাহ হয়। কোষের মধ্যে উদ্ভূত কার্বন ডাই-অক্সাইড একইভাবে শ্বাসছিদ্রের মাধ্যমে বহিষ্কৃত হয়।

(৩) **ফুলকা ঃ** জলচর প্রাণী বিশেষত চিংড়ি, কাঁকড়া, ঝিনুক ও মাছ ইত্যাদির প্রধান শ্বাসযন্ত্রকে ফুলকা বলে। দেহগাত্রের বাইরের বা অভ্যন্তরের আস্তরণের বৃদ্ধি ও

ভাঁজের ফলে ফুলকা সৃষ্টি হয়। প্রতিটি ভাঁজকে ফুলকাসূত্রে (Gill-filament) বলে এবং এই সূত্রগুলিতে প্রচুর রক্তবাহিনালী থাকায় জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন রক্তে গৃহীত হয় এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড জলে পরিত্যক্ত হয়। ব্যাঙাচি এবং কয়েকপ্রকার সামুদ্রিক কীটের দেহের বাইরেও ফুলকাসূত্রগুলি থাকে। আবার চিংড়ি, ঝিনুক ইত্যাদির ফুলকাগুলি দেহে এরূপে অবস্থান করে যাতে জল একদিক দিয়ে তাদের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে অপর দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। মাছের ফুলকাগুলি গলবিলের পাশে থাকে এবং মুখগহ্বরে গৃহীত জল গলবিল ছিদ্রের মাধ্যমে ফুলকা ও ফুলকাছিদ্রের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে যায়।



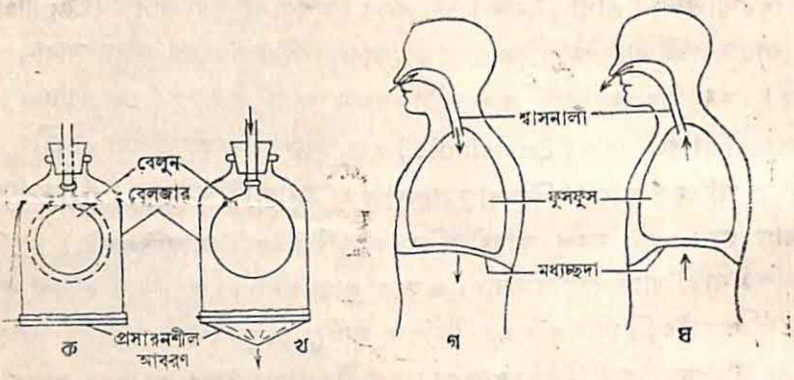
৬নং চিত্র॥ (ক) কই, (খ) মাগুর ও (গ) শিঙি মাছের অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র।

মাছের অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র : যদিও অধিকাংশ মাছ জলের মধ্যে দ্রবীভূত অক্সিজেন ফুলকার সাহায্যে শ্বাসকার্যে গ্রহণ করে এবং ফুলকাই প্রধান শ্বাসযন্ত্র তবুও কয়েকপ্রকার মাছ অন্যপ্রকার শ্বাসযন্ত্র দ্বারা বায়ু থেকে অক্সিজেন শ্বাসকার্যে গ্রহণ করে, এই প্রকার শ্বাসযন্ত্রকে **অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র** (Accessory respiratory organ) বলে। কয়েকটি অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্রযুক্ত মাছের মধ্যে শিঙি, মাগুর ও কই মাছ সকলেরই বিশেষ পরিচিত। (ক) **শিঙি** মাছের ফুলকা ব্যতীত পৃষ্ঠদেশের উভয় দিকে লম্বা নলাকার বায়ুস্থলী আছে। জলের মধ্য থেকে মাঝে মাঝে ভেসে ওঠে অথবা ডাঙায় উঠলে বায়ু থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে এই বায়ুনলের সাহায্যে শ্বাসক্রিয়া চালায়। (খ) **মাগুর** মাছেরও ফুলকা ব্যতীত ফুলকা প্রকোষ্ঠের উপরিভাগে নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র আছে। (গ) **কই** মাছেরা শুকনো ডাঙায় কানকুয়ার সাহায্যে চলার জন্য বিখ্যাত এবং এদেরও ফুলকার ওপরের দিকে বহু ভাঁজযুক্ত অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র থাকায় বায়ুর অক্সিজেনের সাহায্যে শ্বাসকার্য করে থাকে।

(৪) **ফুসফুস ঃ** সকল স্থলচর মেরুদণ্ডী প্রাণী এবং জলচর সরীসৃপ, পক্ষী ও স্তন্যপায়ীদের ব্যাঙের মত ফুসফুস আছে। প্রতিটি ফুসফুস থলি বা কক্ষের মত এবং কক্ষের মধ্যে অসংখ্য প্রকোষ্ঠ বা অ্যালিভিওলাই থাকে। এদের অভ্যন্তরে আর্দ্র **আবরণী কলা** (এপিথিলিয়াম) এবং প্রচুর কৈশিক নালী বা জালক (Capillaries) থাকায় সহজেই বায়ুর-অক্সিজেন ও রক্তের কার্বন ডাই-অক্সাইডের মধ্যে আদান-প্রদান হয়। ফুসফুসের অভ্যন্তরে শ্বাসনালীর প্রধান শাখা ব্রংকাস (Bronchus) বহু উপশাখা বা ব্রংকিওলে (Bronchiole) এবং অবশেষে ফুসফুসের মধ্যে প্রাচীর দ্বারা বিভক্ত অতিক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক **বায়ুপ্রকোষ্ঠ** বা **অ্যালভিওলাসে** (Alveolous) সমাপ্ত হয়। এই সকল আণুবীক্ষণিক প্রকোষ্ঠগুলির (অ্যালভিওলাই) চারদিকে কৈশিক নালী থাকে এবং শ্বাসনালী ও তার শাখা-প্রশাখার দ্বারা বায়ু প্রবেশ করলে অ্যালভিওলাইগুলি ফুলে ওঠে এবং কৈশিক নালীর রক্তের সঙ্গে অক্সিজেন গ্রহণ ও কার্বন ডাই-অক্সাইড বিনিময় সম্পন্ন হয়। পাখীর ফুসফুস ফাঁপা নয় বরং অপেক্ষাকৃত ঘনসংবদ্ধ এবং এদের ফুসফুসের সাথে অনেকগুলি **বায়ুথলি** (Air sacs) থাকায় অতিরিক্ত বায়ু সঞ্চিত থাকে এবং উড়বার সময় প্রচুর শক্তির প্রয়োজনে অতিরিক্ত অক্সিজেন রক্তে সরবরাহ করে।

মানুষের শ্বাসযন্ত্র ঃ (ক) **শ্বাসযন্ত্র ঃ** মানুষের শ্বাসযন্ত্রে ফুসফুসের সাথে নাসিকা ছিদ্র ও মুখগহ্বরে সংযুক্ত করার জন্য বিভিন্ন প্রকার বিশেষ আকৃতির অঙ্গসংস্থান থাকে। **গলবিল** বা **ফ্যারিংক্সের** তলার দিকে **গ্লটিস** নামে একটি ছিদ্র আছে এবং এই ছিদ্রটি আলজিহ্বার দ্বারা ঢাকা থাকে। গ্লটিস বাক্সের আকারের তরুণাস্থি দ্বারা গঠিত **স্বরযন্ত্র** বা **ল্যারিংক্সের** সঙ্গে যুক্ত থাকে। ল্যারিংক্সের পরবর্তী নমনীয় নলাকার অংশটিকে **স্বরনালী** বা **ট্রাকীয়া** বলে, ইহা বক্ষগহ্বর পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে দুই ভাগে বিভক্ত হয়। এই ভাগগুলির প্রত্যেকটিকে ব্রঙ্কাস বলে এবং প্রতিটি ব্রঙ্কাস শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে অ্যালভিওলাইয়ে সমাপ্ত হয়। স্বরনালী এবং ব্রঙ্কাস উভয়েই পরস্পর সংযুক্ত বলয়াকার তরুণাস্থি দ্বারা গঠিত হয়। ফুসফুস দুটি সচ্ছিদ্র স্পঞ্জের মত এবং ডান ফুসফুস বাম ফুসফুস অপেক্ষা কিঞ্চিৎ আকারে বড়। বক্ষগহ্বর ও উদর-গহ্বরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে এবং ফুসফুসের পশ্চাৎ অংশে মাংসল গম্বুজাকৃতি **মধ্যচ্ছদা** (Diaphragm) বক্ষগহ্বর ও উদর-গহ্বরকে দুটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত করে। এর ফলে বক্ষগহ্বর সম্পূর্ণভাবে বায়ুরোধী হয়। বক্ষগহ্বরের মধ্যে ফুসফুস ও হৃদযন্ত্র অবস্থিত, সাধারণ অবস্থায় ফুসফুস বক্ষগহ্বরের সকল অংশ জুড়ে অবস্থান করে। ফুসফুসের অ্যালভিওলাইয়ের মধ্যে বায়ুর চাপের ফলে ফুসফুস বক্ষগহ্বরের প্রাচীরের সাথে সম্পূর্ণভাবে লেগে থাকে।

(খ) **শ্বাসকার্য ঃ** বক্ষপঞ্জর-পেশীর সংকোচনের ফলে বক্ষগহ্বর সম্প্রসারিত এবং মধ্যচ্ছদার গম্বুজাকৃতি অংশ প্রসারিত হওয়ার ফলে বক্ষগহ্বরের অভ্যন্তরে শূন্য স্থানের সৃষ্টি হয়। ফুসফুস শূন্যস্থান পূর্ণ করার জন্য সাথে সাথে সম্প্রসারিত হওয়ায় বায়ু—নাসিকা, গ্লটিস, শ্বাসনালী ও ব্রঙ্কিওলাই হয়ে অবশেষে অ্যালভিওলাইয়ে প্রবেশ



৭নং চিত্র ॥ বেলজার ও বেলুন দ্বারা শ্বাসকার্য-প্রদর্শন ঃ (ক) বেলজারের নিচে পাতলা প্রসারণশীল আবরণ ও অভ্যন্তরে টিউব দ্বারা বায়ুর সাথে যুক্ত বেলুন, (খ) পর্দা নিচের দিকে টানলে বেলজারের অভ্যন্তরে আয়তনের বৃদ্ধি ঘটায় বায়ুর প্রবেশ এবং বেলুনের স্ফীতি,
(গ) মানুষের বক্ষপঞ্জরের প্রসার ও মধ্যচ্ছদা নিম্নাভিমুখী হওয়ায় নাসিকা, শ্বাসনালী দ্বারা বায়ুর প্রবেশ এবং ফুসফুসের স্ফীতি (প্রশ্বাস),
(ঘ) মানুষের বক্ষপঞ্জরের সংকোচন এবং মধ্যচ্ছদার পূর্বাবস্থায় প্রাপ্তিতে ফুসফুসের উপর চাপের সৃষ্টির ফলে বায়ু বহিষ্করণ (নিশ্বাস)।

করে—এই প্রক্রিয়াকে **প্রশ্বাস** বলে। এর পরেই পেশীর প্রসারণের ফলে বক্ষগহ্বর পূর্বাবস্থায় ফিরে যায় এবং সাথে সাথে মধ্যচ্ছদাও পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়, এর ফলে বক্ষগহ্বরের অভ্যন্তরে চাপ বৃদ্ধি করে এবং পূর্বে গৃহীত বায়ু অ্যালভিওলাই, ব্রঙ্কিওলাই, শ্বাসনালী ও নাসিকা ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে যায়। এই বায়ুর মধ্যে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ পূর্বে গৃহীত বায়ু অপেক্ষা বেশী হয়—এই প্রক্রিয়াকে **নিশ্বাস** বলে। প্রতিবার প্রশ্বাসে প্রায় ৫০০ মিঃ লিটার বায়ু ফুসফুসে প্রবেশ করে এবং সমপরিমাণ বায়ু নিশ্বাসে বহিষ্কৃত হয়, একে **প্রবাহী বায়ু** বা **টাইডাল বায়ু** (Tidal air) বলে।

(গ) **ফুসফুসের মাধ্যমে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড বিনিময় ঃ** পালমোনারি ধমনী দূষিত রক্ত বিভিন্ন শাখাধমনী ও ধমনিকার (Arteriole) সাহায্যে অবশেষে কৈশিক বা জালক উৎপন্ন দ্বারা ফুসফুসের অ্যালভিওলাইয়ের মধ্যে সরবরাহ করে। অ্যালভিওলাই ও জালকের প্রাচীর অত্যন্ত পাতলা একস্তর কোষযুক্ত (Endothelium) হয়। জালকের রক্তের কার্বন ডাই-অক্সাইড ও অ্যালভিওলাসের

মধ্যে বায়ুর অক্সিজেনের ঘনত্বের পরিমাণ বিভিন্ন হওয়ায় ব্যাপন (Diffusion) ক্রিয়ার মাধ্যমে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড বিনিময় ঘটে। প্রশ্বাসে গৃহীত বায়ুর মধ্যে অক্সিজেনের পরিমাণ প্রায় ২১% এবং কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ ·০৩%। কিন্তু নিশ্বাসের বায়ুর মধ্যে অক্সিজেনের পরিমাণ প্রায় ১৬·৪% এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রায় ৩·৯৭% ভাগ। এর দ্বারা প্রমাণ হচ্ছে যে, ৪% অক্সিজেন ব্যবহারের বিনিময়ে প্রায় ৪% কার্বন ডাই-অক্সাইড অতিরিক্ত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে অক্সিজেন রক্তের মধ্যে মিশে বিভিন্ন কোষের মধ্যে খাদ্যবস্তু জারণের ফলে প্রায় সমপরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন করে। তবে প্রশ্বাসে গৃহীত বায়ু অপেক্ষা নিশ্বাসে বহিষ্কৃত বায়ু কিঞ্চিৎ কম হওয়ায় কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ কম দেখায়।

(ঘ) **শ্বাসকার্য নিয়ন্ত্রণ ঃ** স্বাভাবিক অবস্থায় আমরা প্রতি মিনিটে প্রায় ১৫ বার শ্বাসকর্ম করি। তবে ব্যায়াম বা শ্রমসাধ্য কার্যে অধিক শক্তির প্রয়োজনে শ্বাসকর্মের হার অনেক বেড়ে যায়। ঘুমের সময় কম শক্তি প্রয়োজন হয়, এজন্য শ্বাসগ্রহণের পরিমাণ সর্বাপেক্ষা কম। মস্তিষ্কের মেডিলার মধ্যে **শ্বাসনিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র** (Respiratory centre) অবস্থিত। এই কেন্দ্র থেকে সংজ্ঞাবাহী নার্ভ উৎপন্ন হয়ে বক্ষপিঞ্জরের ও মধ্যচ্ছদার পেশীতে সরবরাহ হয় এবং শ্বাসক্রিয়ার হার নিয়ন্ত্রিত করে। রক্তের মধ্যে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে গেলে শ্বাস-নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র উদ্দীপ্ত হয়। এই উদ্দীপনা নার্ভ বাহিত হয়ে বক্ষপিঞ্জরে ও মধ্যচ্ছদার পেশীর সংকোচন-সম্প্রসারণ দ্বারা শ্বাসক্রিয়ার পরিমাণ বাড়িয়ে রক্তের মধ্যে অধিক কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ কমিয়ে দেয়। **ব্যায়ামের ফলে** কোষের মধ্যে অধিক খাদ্য জারিত হয় এবং কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ রক্তের মধ্যে বেড়ে যায়, সাথে সাথে শ্বাসক্রিয়ার পরিমাণও বাড়ে। স্বেচ্ছায় যে-কোনও ব্যক্তি মাত্র কয়েক মিনিট শ্বাসরোধ করে থাকতে পারে, এর ফলে দেহের মধ্যে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যায়। তার ফলে শ্বাস নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র উদ্দীপ্ত হয়ে শ্বাসগ্রহণে বাধ্য করে। শ্বাসক্রিয়ার হার বেড়ে যাওয়ায় দেহ থেকে অতিরিক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড বহির্গত হয়ে অবস্থা স্বাভাবিক করে, এজন্য স্বেচ্ছায় শ্বাসরোধ করে কেউই আত্মহত্যা করতে পারে না।

(ঙ) **অতি উচ্চতায় শ্বাসক্রিয়া ঃ** সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে যতই উচ্চতায় যাওয়া যায় ততই বায়ুর ঘনত্ব পাতলা এবং বায়ুর চাপ কম হয়। এই অবস্থায় নির্দিষ্ট পরিমাণ বায়ুতে অক্সিজেনের পরিমাণ স্বাভাবিক অপেক্ষা অনেক কম হয়। পর্বতের অতি-উচ্চতায় কোন ব্যক্তির ফুসফুসের স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা অনুযায়ী যে পরিমাণ বায়ু প্রশ্বাসে গ্রহণ করে তার মধ্যে দেহের প্রয়োজনের তুলনায় অক্সিজেনের পরিমাণ কম

থাকায় অক্সিজেনের অভাব হেতু শ্বাসকষ্ট হয়। সেইজন্য পর্বতের উঁচু চূড়ায় উঠতে হলে পর্বতারোহীরা অক্সিজেন সিলিণ্ডার থেকে শ্বাসকার্যের জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন গ্রহণ করে। পৃথিবী থেকে ১০,০০০ ফিট উচ্চতার উপর দিয়ে উড়বার সময় বিমানের অভ্যন্তরে **বায়ুর চাপ বাড়িয়ে** যাত্রীদের শ্বাসকার্যের সুবিধা করা হয়। পাখীরা অনেক উচ্চতায় অক্লেশে উড়তে পারে কারণ তাদের শ্বাসকার্যে প্রয়োজনীয় বায়ু তাদের ফুসফুসের সাথে যুক্ত বায়ুথলিতে জমা থাকে।

শ্বাসকার্যে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিবহন :

(ক) **অক্সিজেন বহন :** ফুসফুসের অ্যালভিওলাইয়ের ধমনিকার জালকের রক্তের মাধ্যমেই কোষের মধ্যে অক্সিজেনের সরবরাহ হয়। রক্তের মধ্যে তরল প্লাজমা শতকরা ২-৩ ভাগ অক্সিজেন বহন করে। বেশীর ভাগ অক্সিজেন (শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ) লোহিত কণিকার মধ্যে হিমোগ্লোবিন নামক একপ্রকার লোহিত রঞ্জক পদার্থ বহন করে। রাসায়নিক গঠন অনুযায়ী হিমোগ্লোবিনের দুইটি অংশ আছে। প্রথমটি লৌহযুক্ত **হিম** (Heme) নামক পদার্থ এবং দ্বিতীয়টি **গ্লোবিন** নামক বর্ণহীন প্রোটিনের দ্বারা গঠিত। হিম ও ক্লোরোফিলের গঠন এক প্রকারের, একমাত্র ব্যতিক্রম হিমে ম্যাগনেসিয়ামের পরিবর্তে লৌহ আছে। অক্সিজেনের সান্নিধ্যে হিমোগ্লোবিনের একটি অণু, অক্সিজেনের চারটি অণুর সাথে মিলিত হয়ে চার-অণু অক্সিহিমোগ্লোবিন উৎপন্ন করে। এই প্রক্রিয়ায় রাসায়নিক সমীকরণ—Hb_4 (হিমোগ্লোবিন) $+ 4O_2 = 4HbO_2$ (অক্সিহিমোগ্লোবিন)। বেশীর ভাগ সন্ধিপদ ও শামুক জাতীয় প্রাণীদের দেহের রক্তে **হিমোসায়ানিন** নামক নীলাভ রঞ্জক পদার্থ অক্সিজেন বহন করে এবং হিমোসায়ানিনে লৌহের পরিবর্তে তাম্র থাকে।

(খ) **রক্ত ও কোষের মধ্যে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড বিনিময় :** ফুসফুসের মধ্যে অক্সিজেন রক্তের হিমোগ্লোবিনের সাথে অক্সিহিমোগ্লোবিন নামক যৌগে পরিণত হওয়ার পর হৃদযন্ত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন ধমনী, ধমনিকা (Arteriole) ও জালকের দ্বারা দেহের সর্বত্র প্রবাহিত হয়। জালকের মাধ্যমে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত কোষের নিকটে উপস্থিত হলে কোষের মধ্যে অক্সিজেনের পরিমাণ কম ও জালকের রক্তের মধ্যে পরিমাণ বেশী হওয়ায় অক্সিহিমোগ্লোবিন থেকে অক্সিজেনে বিযুক্ত হয়ে ব্যাপন ক্রিয়ার দ্বারা কোষের মধ্যে প্রবেশ করে। একই প্রকারে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ কোষের মধ্যে বেশী এবং রক্তের মধ্যে কম হওয়ায় কার্বন ডাই-অক্সাইড কোষ থেকে জালকের রক্তের মধ্যে প্রবেশ করে।

(গ) **কার্বন ডাই-অক্সাইড বহিষ্করণ :** রক্তের মধ্যে প্রবেশের পরে কার্বন

ডাই-অক্সাইড অল্প পরিমাণে রক্তের ক্ষারতা ও অম্লতা একটি সুনির্দিষ্ট মাত্রায় রাখার জন্য প্রয়োজন হয়। বাকী কার্বন ডাই-অক্সাইডের মধ্যে প্রায় ⅓ ভাগ হিমোগ্লোবিনের সাথে এবং ⅔ ভাগ প্লাজমার মধ্যে সোডিয়াম বাইকার্বনেটরূপে শিরার দ্বারা ফুসফুসে প্রবাহিত হয়। বাইকার্বনেট থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড বিয়োজিত হয়ে ব্যাপন ক্রিয়ার দ্বারা রক্ত থেকে অ্যালভিওলাইয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং ফুসফুস থেকে নিশ্বাসের সাথে বেরিয়ে যায়।

শ্বসনের রাসায়নিক বিক্রিয়াঃ শ্বসনের সংজ্ঞাতেই বলা হয়েছে যে, অক্সিজেন দ্বারা কোষের সঞ্চিত খাদ্য জারণের ফলে যে শক্তি উৎপন্ন হয় তার দ্বারা জীবের বিভিন্ন জৈবিক ক্রিয়া সচল থাকে। কোষের মধ্যে বিভিন্ন খাদ্যবস্তু থাকলেও গ্লুকোজ প্রধান সঞ্চিত খাদ্য এবং অক্সিজেন দ্বারা জারণের ফলে কিভাবে এবং কি পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হয় তা নিম্নের সমীকরণের দ্বারা দেখান হয়েছে :

$$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O + 673 \text{ ক্যালোরি}$$

(গ্লুকোজ) (অক্সিজেন) (কার্বন ডাই-অক্সাইড) (জল) (তাপ)

সালোকসংশ্লেষের মত কোষের মধ্যে গ্লুকোজ জারণেরও বিভিন্ন পর্যায় আছে এবং প্রতি পর্যায়ে বিভিন্ন প্রকার উৎসেচকের প্রয়োজন হয়। গ্লুকোজ জারণে দুটি প্রধান পর্যায়ের মধ্যে প্রথম পর্যায়কে—(ক) **গ্লাইকোলাইসিস** (Glycolysis) এবং দ্বিতীয় পর্যায়কে (খ) **ক্রেবস্ সাইকেল** বা **ক্রেবস্ চক্র** (Kreb's cycle) বলে।

গ্লাইকোলাইসিস্ পর্যায়ঃ গ্লুকোজ হচ্ছে 6 কার্বন যৌগ। এই বস্তুটি জারণের ফলে কোষের মধ্যে ক্রমিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্যায়ে বিভক্ত হয়ে অবশেষে দুটি 3-কার্বন **পাইরুভিক অ্যাসিড** ($C_3H_4O_3$) অণুতে পরিণত হয়। গ্লুকোজ অণুতে ছয়টি কার্বন, ছয়টি অক্সিজেন ও বারটি হাইড্রোজেন পরমাণু আছে। দুটি পাইরুভিক অ্যাসিড অণু উৎপন্ন করতে আটটি হাইড্রোজেন পরমাণুর প্রয়োজন হয়। বাকী চারটি হাইড্রোজেন পরমাণু গ্লুকোজ থেকে বহিষ্কৃত করা হয়। এই প্রক্রিয়াকে **ডিহাইড্রোজিনেশন্** (Dehydrogenation) বলে। বহিষ্কৃত হাইড্রোজেন নিয়াসিন অ্যাডেনাইন ডাইনিউক্লিওটাইড (NAD) নামক গ্রাহককে বিজারণ করে $NADH_2$-তে পরিণত করে। এই বিক্রিয়ায় যে শক্তির উদ্ভব হয় তা অ্যাডেনোসিন ডাইফসফেটের সাথে মিলিত হয়ে অ্যাডেনোসিন ট্রাইফসফেট (ATP) উৎপন্ন করে। এই পর্যায়ের বিক্রিয়ায় গ্লুকোজকে **পাইরুভিক অ্যাসিডে** ভাঙতে অনেক প্রকার উৎসেচক কাজ করে এবং **এই পর্যায়ে অক্সিজেন প্রয়োজন হয় না।** এই বিক্রিয়ার ফলে অবশেষে দুটি ATP অণুতে শক্তি সঞ্চিত থাকে।

গ্লাইকোলাইসিস অবাত, সবাত বা কোহল সন্ধান (Alcoholic fermentation) সর্বত্রই ঘটে।

ক্রেবস্ চক্র (Kerb's Cycle) **পর্যায় ঃ** এই পর্যায়ের বিক্রিয়ায় প্রচুর অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়। এই পর্যায়ে পাইরুভিক অ্যাসিডের অণুগুলি পুনর্বার ভেঙ্গে যায়। হাইড্রোজেন বহিষ্কৃত হয়ে হাইড্রোজেন গ্রাহকের সাথে মিলিত হয় এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড মুক্ত হয়। পাইরুভিক অ্যাসিডের অণুতে তিনটি কার্বন অণু থাকে এবং তা ভেঙ্গে দুই কার্বন অ্যাসেটিক অ্যাসিড ও কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন করে। দুই কার্বন অ্যাসেটিক অ্যাসিডকে **অ্যাসিটেট** ও বলে এবং এই বস্তু বিশেষ একপ্রকার কো-এনজাইমের সাথে মিলিত হয়ে **অ্যাসিটিল কো-এনজাইম এ** (Acetyl co-enzyme A) উৎপন্ন করে। এই বস্তুটি একটি জটিল রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তাপ, শক্তি ও কার্বন ডাই-অক্সাইডে পরিণত হয়। এই বিক্রিয়ার বিভিন্ন ঘটনায় কার্বনের গতিপথ নির্ধারণ করার জন্য অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক **স্যার হ্যানস্ ক্রেবস্**-কে নোবেল পুরস্কার দান করা হয়। তাঁর নাম অনুযায়ী এই চক্রকে **ক্রেবের অম্ল চক্র** বলা হয়। এই চক্রের ক্রমিক পর্যায়ের বিক্রিয়াগুলি অত্যন্ত জটিল। তবে প্রতি অণু পাইরুভিক অ্যাসিড তিন অণু কার্বন ডাই-অক্সাইড ও তিন অণু জল উৎপন্ন করে। প্রতি গ্লুকোজ অণু দুটি পাইরুভিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে বলে কার্বন ডাই-অক্সাইড অণু ও জল অণুর পরিমাণ ছয়টি করে হয়। এই প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে ক্রমাগত শক্তি উৎপন্ন হয়ে ATP তে সঞ্চিত হয়। এই পর্যায়ে ৩৬টি ATP এবং গ্লাইকোলাইসিস পর্যায়ে ২টি ATP উৎপন্ন হওয়ায় সমগ্র শ্বসনে প্রতি অণুশর্করা জারণের ফলে সর্বমোট ৩৮ ATP উৎপন্ন হয়। ATPতে ব্যাটারীর মত রাসায়নিক শক্তি পুঞ্জীভূত হয় বলে একে **কোষের ব্যাটারী**ও বলা চলে।

মাইটোকনড্রিয়ন—শক্তি উৎপাদনের স্থান ঃ শ্বাসক্রিয়ায় সকল বিক্রিয়াই কোষের অভ্যন্তরে চলে। এই কার্যে বহুপ্রকার উৎসেচকের প্রয়োজন হয়। এই সকল উৎসেচক মাইটোকনড্রিয়নে উৎপন্ন হয়। এরা শ্বসনের বিক্রিয়ায় সকল কার্য করে এবং উৎপন্ন শক্তি ATP-তে সঞ্চয় করে রাখে।। প্রয়োজনে এই শক্তি সরবরাহ করে বলে একে **কোষের বিদ্যুৎ কেন্দ্র** (Power house) বলে।

দহন ও কোষের অভ্যন্তরে জারণের মধ্যে তফাত ঃ কোষের মধ্যে গ্লুকোজ যদি বিভিন্ন পর্যায়ে জারিত না হয়ে একেবারে জারিত হয় তাহলে কাঠ, কয়লা বা পেট্রোল ইত্যাদি দাহবস্তুর দহনের মত একেবারেই প্রচণ্ড তাপ উৎপন্ন হয়ে জীবদেহ পুড়িয়ে ফেলবে এবং অধিকাংশ তাপের অপচয় হবে। সেইজন্য প্রকৃতি শ্বসনক্রিয়াকে

অনেকগুলি পর্যায়ে বিভক্ত করায় ধীরে ধীরে তাপ উৎপন্ন হয়ে শক্তিরূপে সঞ্চিত থাকে এবং জৈবিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়।

উদ্ভিদের শ্বসন ঃ স্থলজ উদ্ভিদের শ্বসনে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড বিনিময় ঃ প্রাণীদের মত উদ্ভিদের কোনও নির্দিষ্ট শ্বাসযন্ত্র না থাকায় উদ্ভিদ-দেহের বিভিন্ন অঞ্চলে বায়ুর বিনিময় হয়। উদ্ভিদের মূল ও কাণ্ডের মাধ্যমে বায়ুর বিনিময় হলেও পাতায় বিনিময়ের পরিমাণ সর্বাধিক। স্থলজ উদ্ভিদের মূল মৃত্তিকা কণার মধ্যে অবস্থিত বায়ুস্থান থেকে মূলরোমের ব্যাপনক্রিয়ার মাধ্যমে অক্সিজেন গ্রহণ ও কার্বন ডাই-অক্সাইড-বর্জন করে। জলমগ্ন জমির মৃত্তিকায় অক্সিজেনের পরিমাণ অত্যন্ত কম হওয়ায় মূলের শ্বসন হয় না, ফলে মূল মারা যায়। গেঁয়ো, গরাণ ও হিন্তাল ইত্যাদি কর্দমাক্ত লোনামাটির উদ্ভিদের মাটি ভেদ করে **শ্বাসমূল** জন্মায় এবং তার মাধ্যমে বায়ুর বিনিময় করে। উদ্ভিদের কাণ্ডের গায়ে লম্বালম্বি অবস্থিত অতি ক্ষুদ্র ছিদ্র—লেন্টিসেল (Lenticel) এবং পাতায় অবস্থিত পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে বায়ুর বিনিময় হয়। লেন্টিসেল ও পত্ররন্ধ্রের অভ্যন্তরে কোষগুলি শিথিলভাবে সজ্জিত হওয়ায় অন্তঃকোষ স্থানের জলীয় বাষ্পের সাহায্যে ব্যাপন ক্রিয়ায় অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের বিনিময় হয়।

প্রাণীদের মত উদ্ভিদের শ্বসনে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় একই প্রকার উৎসেচক গ্লুকোজ অণুকে জারিত করে কার্বন ডাই-অক্সাইড, জল ও তাপ শক্তি উৎপন্ন করে। তবে প্রাণীদের ন্যায় উদ্ভিদের দেহের আভ্যন্তরিক গঠন অন্যপ্রকার হওয়ায় এদের হিমোগ্লোবিনের মত কোন অক্সিজেন পরিবহনকারী বস্তুর প্রয়োজন হয় না। সালোকসংশ্লেষের সময় উদ্ভিদের সবুজ অংশ প্রচুর অ্যাডেনোসিন ট্রাইফসফেট (ATP) প্রস্তুত করে প্রয়োজনীয় শক্তির প্রয়োজন মিটায় কিন্তু মূল, কাণ্ড বা ফল ইত্যাদি শ্বসনের মাধ্যমেই শক্তি উৎপন্ন করে। প্রাণীদের মত উদ্ভিদের শ্বসনেও অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় কিন্তু কখনও কখনও অক্সিজেন ব্যতিরেকেও শ্বসন ঘটে। অক্সিজেন সহযোগে যে শ্বসন ঘটে তাকে **সবাত শ্বসন** (Aerobic respiration) এবং অক্সিজেন ব্যতিরেকে শ্বসনকে **অবাত শ্বসন** (Anaerobic respiration) বলে।

সবাত শ্বসন ঃ অক্সিজেন সহযোগে উদ্ভিদের শ্বাসকার্য দিন-রাত্রি সকল সময়েই ঘটে। এই প্রক্রিয়ায় পত্ররন্ধ্র ও লেনটিসেল (কাণ্ডের গাত্রের ছিদ্র) দ্বারা গৃহীত অক্সিজেন উদ্ভিদের দেহের মধ্যে প্রবেশ করে আন্তঃকোষীয় অঞ্চল দিয়ে বিভিন্ন কোষের মধ্যে সরবরাহ হয়। বিভিন্ন কোষের মধ্যে সঞ্চিত খাদ্য অক্সিজেন দ্বারা জারিত হয়ে কার্বন ডাই-অক্সাইড, জল ও শক্তি উৎপন্ন করে এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড

দিনের বেলা সূর্যালোকের উপস্থিতিতে সালোকসংশ্লেষে নিয়োজিত হয় কিন্তু রাত্রিবেলা পত্ররন্ধ্র বা লেনটিসেল দিয়ে বেরিয়ে যায়।

বিভিন্ন জীবের অবাত শ্বাসকার্য ঃ (ক) **ইস্ট** একপ্রকার এককোষী ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদ, এই উদ্ভিদ অক্সিজেন ব্যতীত শ্বাসকার্য চালাতে পারে। অক্সিজেনের অভাবে অবাত শ্বাসকার্যের ফলে ইস্ট গ্লুকোজ দ্রবণে জাইমেজ উৎসেচক নিঃসরণ করে গ্লুকোজকে ভেঙে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও অ্যালকোহলে পরিণত করে। এই প্রক্রিয়াকে **কোহল সন্ধান বা ফারমেনটেশন্‌** (Fermentation) বলে। তবে প্রচুর অক্সিজেনের সরবরাহ হলে ইস্ট সবাত শ্বসনের দ্বারা শর্করা দ্রবণকে সম্পূর্ণভাবে জারিত করে। ইস্টের গ্লুকোজ দ্রবণে অবাত শ্বাসকার্যের রাসায়নিক বিক্রিয়া নিম্নরূপে হয়। যথা—

$$\underline{C_6H_{12}O_6 + \text{জাইমেজ} \rightarrow 2CO_2 + 2C_2H_5OH + 21 \text{ কিঃ ক্যালোরি তাপ।}}$$

(গ্লুকোজ) (ইস্টের উৎসচক) (কার্বন ডাই-অক্সাইড) (অ্যালকোহল)

(খ) ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে অনেকে অবাত শ্বসন করলেও কয়েকপ্রকার ব্যাকটিরিয়া একমাত্র অবাত শ্বসন ব্যতীত বাঁচতে পারে না। যথা, টিটেনাস, খাদ্যে বিষক্রিয়া (Botulism) সৃষ্টিকারী ক্লসট্রিডিয়াম এবং মাটির নাইট্রোজেন বিমুক্তকারী ব্যাকটিরিয়াম্‌ ডিনাইট্রিফিক্যান ইত্যাদি। দুধ থেকে দই প্রস্তুতও ল্যাকটো-ব্যাসিলাস নামক একপ্রকার ব্যাকটিরিয়ার অবাত শ্বসনের ফল। এই ব্যাকটিরিয়া দুগ্ধ শর্করাকে ল্যাকটিক অ্যাসিডে ভেঙে ফেলে, এবং দই প্রস্তুত হয়।

(গ) প্রাণীদেরও অবাত শ্বাসকার্য কখনও কখনও হয়। যেমন, ছুটাছুটি, লাফালাফি ইত্যাদি অনেকক্ষণ ধরে-করলে পেশীর মধ্যে অক্সিজেন সরবরাহ পর্যাপ্ত পরিমাণে না হওয়ায় ল্যাকটিক অ্যাসিড সঞ্চিত হয়।

(ঘ) উদ্ভিদ ও প্রাণীদের কিন্তু অধিকক্ষণ অবাত শ্বাসকার্য চলতে পারে না। কারণ অবাত শ্বাসকার্যের ফলে যে সকল বস্তু (ল্যাকটিক অ্যাসিড, অ্যালকোহল) উৎপন্ন হয় সেগুলি প্রাণী বা উদ্ভিদের কোষের পক্ষে ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

শ্বসনে বিভিন্ন শর্তের প্রভাব ঃ জীবের শ্বসন বিভিন্ন বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক শর্তের দ্বারা প্রভাবিত হয়। নিম্নে বিভিন্ন শর্ত এবং তাদের প্রভাব বর্ণনা করা হচ্ছে—

(ক) **বাহ্যিক শর্ত ঃ** (১) **তাপ**—উদ্ভিদের ফসল কেটে গোলাজাত করার সময় বা শাক-সব্জি ও ফল তুলে কয়েকদিন রাখলে তাদের বর্ণ, গন্ধ

ও রাসায়নিক সংগঠনের পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তন কোষের মধ্যে শ্বসনের বিভিন্ন উৎসেচক বিক্রিয়ার ফল। হিমঘরের বা রেফ্রিজারেটারের অত্যধিক ঠাণ্ডায় বা তাপমাত্রা কমিয়ে উদ্ভিদকোষ এবং পচনকারী ব্যাকটিরিয়া ও ছত্রাকের শ্বসনের মাত্রা ও শ্বসনের উৎসেচকগুলির বিক্রিয়া হ্রাস করে শাক-সব্জি ও ফলমূল টাটকা রাখা যায়। উষ্ণশোণিতবিশিষ্ট প্রাণী বিশেষতঃ মানুষের অত্যধিক ঠাণ্ডা বা গরমের সংস্পর্শে বা অত্যধিক জ্বরে শ্বসনের হার বৃদ্ধি পায়। গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্নে কুকুরের জিহ্বা বের করে হাঁপানোও অধিক তাপের ফলে ঘটে।

২। **বায়ুতে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ**—উদ্ভিদের বিটপ অংশে অক্সিজেনের পরিমাণ ২১% থেকে ৫% পরিবর্তিত না হলে শ্বসনের হারের কোন পরিবর্তন হয় না। তবে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ পরিবর্তনে বিভিন্ন উদ্ভিদের শ্বসনের হারের পরিবর্তন হয়। মানুষের শ্বাসকর্মে গৃহীত বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ অধিক হলে শ্বসনের হার বাড়ে। বদ্ধঘরে কাঠ, কয়লা বা কেরোসিন বাতি জ্বালালে যে **কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস** (CO) উৎপন্ন হয় তার হিমোগ্লোবিনের সাথে সংযুক্ত হওয়ার প্রবণতা অক্সিজেন অপেক্ষা বহুগুণ বেশী (প্রায় ২৩০ গুণ)। ফলে কার্বন মনোক্সাইডও দ্রুত হিমোগ্লোবিনের সাথে মিশে অক্সিজেন গ্রহণে বাধা সৃষ্টি করে। ফলে কোষের শ্বাসকার্যে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন অভাবে মানুষের মৃত্যু হয়।

৩। **শ্রমসাধ্য কার্য**—কঠোর শারীরিক পরিশ্রম, খেলাধূলা ইত্যাদির ফলে কোষের মধ্যে অধিক কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হওয়ায় মানুষের শ্বসনের হার স্বাভাবিক ১৬-১৮ থেকে ২০-২৫ বার বাড়িয়ে দেয়।

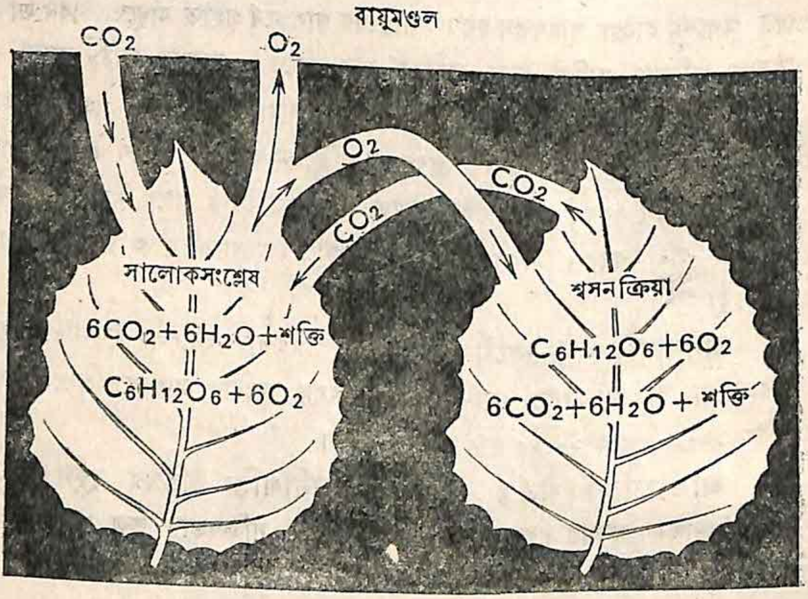
(খ) **আভ্যন্তরিক শর্ত: বয়স ও জীবনীশক্তি** উদ্ভিদের মুকুল ও মূলের অগ্রভাগের ভাজক কলার কোষের প্রোটোপ্লাজমের সক্রিয়তার জন্য শ্বসনের হার উদ্ভিদকাণ্ডের পুরানো কোষ অপেক্ষা অধিক হয়। পূর্ণবয়স্ক মানুষের স্বাভাবিক অবস্থায় শ্বসনের হার প্রতি মিনিটে ১৬-১৮ বার কিন্তু শিশু ও বৃদ্ধদের শ্বসনের হার কিছু পরিমাণে অধিক ও অল্প হয়।

(গ) **প্রোটোপ্লাজমের নিরুদমের** (শুষ্কতা) ফলে সক্রিয়তা হ্রাস পাওয়ায় শ্বসনের হার অত্যন্ত অল্প হয়। এজন্য শুষ্ক বীজের শ্বসনের হার কম কিন্তু জল গ্রহণ করে অঙ্কুরোদ্গম কালে বীজের শ্বসনের হার অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

(ঘ) **খাদ্য**—কোষের মধ্যে দ্রবীভূত খাদ্যের পরিমাণ অধিক হলে শ্বসনের হারও অধিক হয়।

সালোকসংশ্লেষ ও শ্বসনের মধ্যে পার্থক্য

সালোকসংশ্লেষ	শ্বসন
(১) উদ্ভিদের সবুজ অংশে এই প্রক্রিয়ায় কার্বন ডাই-অক্সাইড, জল ও সূর্যালোকে খাদ্য প্রস্তুত করে এবং খাদ্যের মধ্যে সৌরশক্তি পুঞ্জীভূত করে।	(১) শ্বসনের দ্বারা জীবদেহে সঞ্চিত খাদ্যদ্রব্য অক্সিজেন যোগে জারণের ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইড, জল ও তাপ-শক্তির উদ্ভব হয়।
(২) দেহের বৃদ্ধি ও ওজন বাড়ে সেইজন্য এই ক্রিয়াকে উপচিতিমূলক (Anabolism) বিপাক বলে।	(২) সঞ্চিত খাদ্য ভেঙে জীবের ওজন কমে যায় এজন্য এই ক্রিয়াকে অপচিতি-মূলক (Catabolism) বিপাক বলে।



৮নং চিত্র। সালোকসংশ্লেষ ও শ্বসনক্রিয়ার বিভিন্ন বিক্রিয়ার তুলনামূলক চিত্র

সালোকসংশ্লেষ	শ্বসন
(৩) কেবলমাত্র দিনের বেলা সূর্যালোকে এই ক্রিয়া ঘটে।	(৩) দিন ও রাত্রি সর্বদা এই ক্রিয়া ঘটে।
(৪) উদ্ভিদ কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জল এই প্রক্রিয়ায় গ্রহণ ও শোষণ করে।	(৪) এই প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ কেবলমাত্র অক্সিজেন গ্রহণ করে।
(৫) উদ্ভিদ এই প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন ও জল পরিত্যাগ এবং শর্করা প্রস্তুত করে।	(৫) উদ্ভিদ এই প্রক্রিয়ায় কেবলমাত্র কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জল পরিত্যাগ করে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পুষ্টি, বিপাক ও পরিপাক : খাদ্য, ভিটামিন, এন্‌জাইম, খনিজ লবণ ও জল
(Nutrition, Metabolism & Digestion : Food, vitamins, enzyme, minerals & water)

পুষ্টি (Nutrition)

উদ্ভিদ বা প্রাণী সকল সজীব বস্তুই তাদের জীবনধারণ, দেহের বৃদ্ধি, শ্বাসক্রিয়া ক্ষতিগ্রস্ত অঙ্গের পূরণ বা পুরানো অঙ্গের পরিবর্তে নূতন অঙ্গের উৎপাদন ইত্যাদি বিভিন্ন কার্যের জন্য খাদ্যের উপর নির্ভরশীল। প্রাণীরা কিন্তু খাদ্য তৈরী করতে পারে না। একমাত্র সবুজ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় মাটি থেকে জল ও বাতাসের কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে সূর্যালোক ও ক্লোরোফিলের সাহায্যে খাদ্য উৎপাদন করে। প্রাণীরা সেই খাদ্য উদ্ভিদ থেকে গ্রহণ করে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। এজন্য প্রাণীদের **পরভোজী** (Heterotrophic) এবং সবুজ উদ্ভিদদের **স্বভোজী** (Autotrophic) জীব বলে। **আমরা যে কোনও খাদ্য খাই না কেন সকল খাদ্যের উৎপত্তি কিন্তু উদ্ভিদ থেকে হয়।** আমরা ছাগলের মাংস খাদ্যরূপে গ্রহণ করি আবার ছাগল ঘাস ও বিভিন্ন উদ্ভিদের লতাপাতা ইত্যাদি খেয়ে জীবন ধারণ করে। সেইরূপ আমরা গোরুর দুধ খাই, গোরুও ঘাস খায়। আমরা মাছ খাই, মাছ ছোট ছোট পোকা খায়, পোকারা আবার জলজ উদ্ভিদ খায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, **উদ্ভিদ নিজেদের খাদ্য নিজেরা উৎপন্ন করে পুষ্টি সাধন করে,** অতিরিক্ত খাদ্য দেহের মধ্যে জমিয়ে রাখে এবং প্রাণীরা সেই খাদ্য খেয়ে জীবন ধারণ করে।

বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য পরভোজী জীবেরা দেহের মধ্যে গ্রহণ করে জটিল বস্তুকে সরল ও তরল পদার্থে পরিণত করে। জটিল খাদ্য বস্তুর সরল বস্তুতে পরিণত করাকে **পরিপাক** (Digestion) বলে। সরল খাদ্য বস্তুর মধ্যে সারাংশ জীবদেহে তরল অবস্থায় পরিবাহিত ও দেহের বিভিন্ন কোষের মধ্যে শোষিত হয়ে প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে গৃহীত হওয়াকে **আত্তীকরণ** (Assimilation) বলে। খাদ্যের সরল বস্তু আত্তীকরণ হওয়ার পূর্বে বা পরে শক্তি উৎপাদনে সাহায্য করতে পারে এবং এই শক্তি উৎপাদনে বিভিন্ন বর্জ্য বস্তু পরিত্যক্ত হয়। সমগ্র প্রক্রিয়াটিকে পুষ্টি (Nutrition) বলে।

পুষ্টির সংজ্ঞা ঃ যে প্রক্রিয়ায় পরভোজী জীবের দেহে জটিল খাদ্য গ্রহণের পরে পরিপাক দ্বারা সরল বস্তুতে পরিণত হয়ে কোষের মধ্যে আত্তীকরণ ও অপাচ্য বস্তু বর্জন হয় তাকে পুষ্টি বলে।

উদ্ভিদের পুষ্টিসাধন

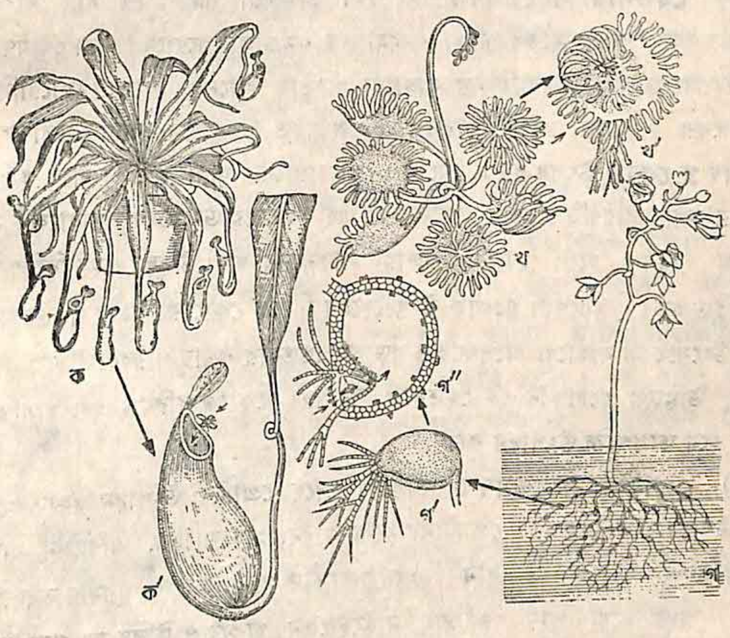
উদ্ভিদ জগৎকে তাদের খাদ্যের উৎস অনুযায়ী দুটি বৃহৎ শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। **প্রথম শ্রেণী**—সবুজ উদ্ভিদ যারা নিজেদের খাদ্য সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন করে তাদের **স্বভোজী** (Autotrophic) বলে। এই শ্রেণীতে বিভিন্ন প্রকার শৈবাল, মস ও ফার্ন জাতীয় উদ্ভিদ এবং সপুষ্পক উদ্ভিদ অন্তর্ভুক্ত। এই শ্রেণীর পুষ্টিসাধন সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় বর্ণনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় শ্রেণী—যে সব উদ্ভিদ নিজেরা খাদ্য উৎপাদন না করে অন্য কোনও উৎস থেকে অংশত বা সম্পূর্ণ খাদ্য গ্রহণ করে তাদের **পরভোজী** (Heterotrophic) বলে। এই জাতীয় উদ্ভিদের পাতায় ক্লোরোফিল থাকে না তবে আংশিক পরভোজীদের থাকে। বিভিন্ন ছত্রাক, ব্যাকটিরিয়া, কলসী বৃক্ষ ইত্যাদি প্রধানত এই জাতীয় উদ্ভিদ। পরভোজীদের আবার **মৃতজীবী** (Saprophyte) এবং **পরজীবী** (Parasite) এই দুটি ভাগে ভাগ করা যায়।

(১) **মৃতজীবীরা** মৃত, পচা-গলা উদ্ভিদ বা প্রাণীর দেহ থেকে তাদের উপযোগী খাদ্যবস্তু আহরণ করে। উদাহরণ—ইস্ট, পেনিসিলিয়াম, মিউকর, ব্যাঙের ছাতা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার ছত্রাক এবং ব্যাকটিরিয়া এই জাতীয় উদ্ভিদ। (২) **পরজীবীরা** কিন্তু সরাসরি জীবিত স্বভোজী উদ্ভিদ বা প্রাণী থেকে খাদ্য বস্তু আহরণ করে। এই সকল উদ্ভিদের জীবিত বস্তু থেকে খাদ্য শোষণের জন্য চোষক মূল থাকে। পরজীবীরা আবার আংশিক ও পূর্ণ পরজীবী হতে পারে। **আংশিক পরজীবীদের** দেহে ক্লোরোফিল থাকায় নিজেরা কিছু পরিমাণ খাদ্য উৎপাদন করে। উদাহরণ —চন্দন এবং লোরেন্থাস (আম গাছের পরজীবী)। **স্বর্ণলতা, বেনেবৌ** (বেগুন, আলু ইত্যাদির মূলের খাদ্য শোষণ করে) ইত্যাদি **পূর্ণপরজীবী** কারণ এদের দেহে ক্লোরোফিল একেবারে না থাকায় খাদ্য উৎপন্ন করতে পারে না।

বিভিন্ন প্রকার মৃতজীবী ও পরজীবী উদ্ভিদ ব্যতীত আরেক শ্রেণীর উদ্ভিদ আছে যাদের দেহে ক্লোরোফিল থাকায় সালোকসংশ্লেষ ক্রিয়া করতে পারে কিন্তু তাদের পরিবেশে নাইট্রোজেনের অভাব থাকায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গকে খাদ্যরূপে গ্রহণ ও জীর্ণ করে নাইট্রোজেনের অভাব মেটায়। এই জাতীয় উদ্ভিদগুলিকে **পতঙ্গভুক**

উদ্ভিদ (Insectivorous plants) বলে। কীট-পতঙ্গ ধরার জন্য এই জাতীয় উদ্ভিদের পাতা পরিবর্তিত হয়, পাতায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রোম, আঠাল রসনিঃসরণকারী গ্রন্থি ইত্যাদি থাকে। এই সকল বস্তুর সাহায্যে কীট-পতঙ্গ ধরা পড়লে পাতার গ্রন্থিকোষ থেকে আমিষ জীর্ণকারক উৎসেচক নিঃসরণ হয়ে খাদ্যকে অ্যামাইনো অ্যাসিডে পরিণত করে। অ্যামাইনো অ্যাসিড উদ্ভিদ দেহের মধ্যে শোষণ করে। এই জাতীয় উদ্ভিদের মধ্যে **সূর্যশিশির** (Drosera) পাতার উপর কর্ষিকার সাহায্যে, **ঝাঁঝি**



৯নং চিত্র। বিভিন্ন প্রকারের পতঙ্গভুক উদ্ভিদ : ক—কলসী বৃক্ষ, ক´—কলসীর মধ্যে পতঙ্গের প্রবেশ। খ—সূর্যশিশির, খ´—সূর্যশিশিরের কর্ষিকার দ্বারা পতঙ্গ শিকার। গ—ঝাঁঝি এবং গ´ ও গ´´—একটি ঝাঁঝির চোরা দুয়ার ঠেলে পতঙ্গের প্রবেশ।

পাতার দ্বারা তৈরী এক মুখ খোলা চোরা দুয়ারযুক্ত থলির সাহায্যে এবং **কলসী-বৃক্ষের পাতা** কলসীর আকারে রূপান্তরিত হয়ে কীট-পতঙ্গ শিকার করে।

আর এক প্রকার সংযুক্ত উদ্ভিদ আছে যেখানে দুটি ভিন্ন জাতের উদ্ভিদ পরস্পর সহাবস্থান ও উভয়ের মঙ্গল সাধন করে। **লাইকেন** নামক সংযুক্ত উদ্ভিদ এই জাতের উদাহরণ। লাইকেন হচ্ছে একপ্রকার শৈবাল ও ছত্রাকের সংযুক্ত অবস্থা। শৈবাল ক্লোরোফিলের সাহায্যে যে খাদ্য উৎপন্ন করে তা ছত্রাককে সরবরাহ করে এবং ছত্রাক-

শৈবালকে জল ও খনিজ বস্তু যোগায়। এই প্রকার সংযুক্ত উদ্ভিদ দুটিকে **মিথোজীবী** বলে।

উদ্ভিদের বিভিন্ন খাদ্য বস্তু সংশ্লেষণ

সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় সবুজ উদ্ভিদ শর্করা (গ্লুকোজ) উৎপাদন করে, পরে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ দেহে শর্করা হতে শ্বেতসার, প্রোটিন, স্নেহ ও অন্যান্য জটিল যৌগ বস্তু উৎপন্ন হয়। উদ্ভিদ এই সব বস্তুর দ্বারা দেহে নূতন কোষ সৃষ্টি ও শক্তি উৎপাদিত করে এবং পরভোজী উদ্ভিদ ও প্রাণীদের খাদ্য যোগায়।

(ক) **শ্বেতসার সংশ্লেষণ:** স্বভোজী উদ্ভিদেরা পুষ্টির জন্য মাটি থেকে জল এবং তার সাথে বিভিন্ন অজৈব পুষ্টিসাধক মৌলিক বস্তুগুলি মূলরোমের দ্বারা শোষণ করে মূল ও কাণ্ডের জাইলেমবাহিকার সাহায্যে পাতায় আনে। পাতার ক্লোরোফিল ও সূর্যালোকের সাহায্যে বায়ুর কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলের দ্বারা সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় **গ্লুকোজ** উৎপন্ন হয়। গ্লুকোজ ক্লোরোপ্লাস্টের দ্বারা সাময়িকভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্বেতসার কণায় পরিবর্তিত হয়। রাত্রিবেলা এই শ্বেতসার উৎসেচকের সাহায্যে পুনর্বার গ্লুকোজে পরিণত হয়ে ফ্লোয়েম কলার সীভনলের দ্বারা উদ্ভিদ দেহের বিভিন্ন স্থানে পরিবাহিত হয়। অবশেষে গ্লুকোজ উদ্ভিদদেহের বিভিন্ন কোষের সজীব লিউকোপ্লাস্ট কণার উৎসেচকের সাহায্যে অপেক্ষাকৃত বড় বড় শ্বেতসার কণায় পরিবর্তিত হয়ে সঞ্চিত থাকে। উদ্ভিদের প্রয়োজনে এই শ্বেতসার পুনর্বার গ্লুকোজে পরিণত এবং শ্বাসক্রিয়ায় জারিত হয়ে তাপশক্তি উৎপাদন করে।

(খ) **প্রোটিন সংশ্লেষণ:** উদ্ভিদের দেহে প্রোটিন উৎপাদন পদ্ধতি অত্যন্ত জটিল উপায়ে সংঘটিত হয়। প্রোটিনের মধ্যে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ব্যতীত নাইট্রোজেনও অত্যাবশ্যক উপাদান। এগুলি ব্যতীত গন্ধক ও কিছু পরিমাণ ফসফরাসও থাকে। বায়ুর মধ্যে প্রায় ৭৯ ভাগ নাইট্রোজেন থাকলেও উদ্ভিদ তা গ্রহণ করতে পারে না। তারা মাটির মধ্যের নাইট্রেট জলের সাথে শোষণ করে বিভিন্ন জটিল রাসায়নিক বিক্রিয়ায় উদ্ভিদ প্রোটিন সংশ্লেষণ করে। নাইট্রেট বিজারিত হয়ে **নাইট্রাইটে** ও পরে **অ্যামোনিয়ায়** পরিবর্তিত হয়, অ্যামোনিয়া উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রকার জৈব অ্যাসিডের সাথে যুক্ত হয়ে প্রোটিন উৎপাদনের মূলবস্তু **অ্যামাইনো অ্যাসিড** উৎপন্ন করে। বহু অ্যামাইনো অ্যাসিড অণু সংযুক্ত হয়ে প্রথমে পলিপেপটাইড, পরে পেপটোন এবং অবশেষে প্রোটিন উৎপন্ন করে। বিভিন্ন প্রকার জটিল প্রোটিনে গন্ধক এবং ফসফরাস থাকে এবং এই জাতীয় প্রোটিন সংশ্লেষণে মাটির মধ্যে সালফেটস্ এবং ফসফেটস্ জাতীয় পদার্থ শোষিত হয়।

অ্যামাইনো অ্যাসিড উৎপাদনের পরে উদ্ভিদ দেহের বিভিন্ন স্থানে বিশেষত ভাজককলা এবং সঞ্চয়ীকলায় সরবরাহ হয় এবং সেইস্থানের কোষের মধ্যে প্রোটিন সংশ্লেষ করে। **প্রোটিন কিন্তু উদ্ভিদের দেহের একস্থান হতে অন্যস্থানে বাহিত হয় না।**

(গ) **স্নেহ সংশ্লেষণ :** উদ্ভিদের দেহে স্নেহ জাতীয় পদার্থ ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারলের সংযুক্তির ফলে সংশ্লেষিত হয়। অবাত শ্বাসক্রিয়ায় উদ্ভিদের কোষের গ্লুকোজ, ফ্রাকটোজ ইত্যাদি শর্করা উৎসেচকের সাহায্যে জটিল রাসায়নিক বিক্রিয়ায় গ্লিসারল ও ফ্যাটি এ্যাসিড উৎপন্ন করে। উদ্ভিদের ফ্যাটি অ্যাসিডের মধ্যে স্টীয়ারিক, পালম্যাটিক, ওলেয়িক ইত্যাদি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারল কোষের মধ্যে সঞ্চিত থাকে না সঙ্গে সঙ্গে স্নেহে সংশ্লেষিত হয়। **কোষের মধ্যে স্নেহ উৎপাদন বাড়াতে সমপরিমাণ শ্বেতসার কমে যায়।**

উদ্ভিদের পুষ্টিবিধায়ক বিভিন্ন অত্যাবশ্যক মৌলিক পদার্থ :

উদ্ভিদের বৃদ্ধি, ফুল ও বীজ উৎপাদনে কয়েকটি অত্যাবশ্যক মৌলিক পদার্থ অপরিহার্য। এই সকল অত্যাবশ্যক মৌলিক পদার্থের মধ্যে কয়েকটি অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে উদ্ভিদের পুষ্টিবিধানে ব্যবহৃত হয় তাদের **ম্যাক্রোনিউট্রিয়েণ্টস্** (Macronutrients) বা **অধিক মৌল উপাদান বলে।** যে সকল উপাদান অতি অল্প পরিমাণে উদ্ভিদের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়ে পুষ্টিসাধনে অত্যাবশ্যক বিবেচিত হয় তাদের **মাইক্রোনিউট্রিয়েণ্টস্** (Micronutrients) বা **স্বল্প মৌল উপাদান বলে।**

ম্যাক্রোনিউট্রিয়েণ্টস্ বা অধিক মৌল উপাদান : এই প্রকার মৌল উপাদান প্রধানত দশটি। যথা—কার্বন (C), অক্সিজেন (O) হাইড্রোজেন (H) এই তিনটি উপাদান বায়ু ও মাটি থেকে গৃহীত জলের সাহায্যে উদ্ভিদ গ্রহণ করে।

বাকি সাতটি উপাদান যথাক্রমে—নাইট্রোজেন (N), ফসফরাস (P), পটাসিয়াম (K), গন্ধক (S), ক্যালসিয়াম (Ca), ম্যাগনেসিয়াম (Mg) ও লৌহ (Fe) ইত্যাদি উদ্ভিদ মাটি থেকে প্রচুর পরিমাণে গ্রহণ করে।

মাইক্রোনিউট্রিয়েণ্টস্ বা স্বল্প মৌল উপাদান : এই প্রকার উপাদান সাধারণতঃ ছয়টি। যথা বোরণ (B), তাম্র (Cu), ম্যাঙ্গানিজ (Mn), জিঙ্ক বা দস্তা (Zn), মলিবডিনাম্ (Mo) এবং ক্লোরিণ (Cl)। এই সকল উপাদানের কোনও একটির অভাব হলে উদ্ভিদের সুষম বৃদ্ধি হয় না, বিভিন্ন প্রকার রোগ দেখা দিতে পারে।

অত্যাবশ্যক মৌলিক পদার্থের উৎস ঃ বায়ু ব্যতীত মাটির মধ্যে জলে দ্রবণীয় অবস্থাই মৌলিক পদার্থের প্রধান উৎস। মাটির মধ্যে বিভিন্ন প্রকার অজৈব বস্তু অদ্রাব্যরূপে থাকে কিন্তু জৈব বস্তুর পচন বা অন্য কোনও উপায়ে অম্ল সৃষ্টির ফলে জলে দ্রবণীয় হয়। **মৃত জৈব বস্তু থেকে বিভিন্ন আবশ্যকীয় মৌলিক পদার্থের মুক্তি ব্যাকটিরিয়া ও ছত্রাক দ্বারা সংঘটিত হয়।** মাটি এইভাবে ধীরে ধীরে উদ্ভিদের পুষ্টিসাধনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটায়।

অত্যাবশ্যক পদার্থগুলি মাটিতে মৌলিক অবস্থায় জলের অথবা সারের মধ্যে থাকে না। এই পদার্থগুলি মাটিতে বিভিন্ন যৌগ অথবা আয়নরূপে উপস্থিত থাকে। উদাহরণ—পটাসিয়াম নাইট্রেট লবণ মাটির মধ্যে জলে দ্রবীভূত হয়ে দুটি আয়ন, যথাক্রমে পটাসিয়াম (K^+) ও নাইট্রেটে (NO_3) বিভক্ত হয় এবং এই আয়ন অবস্থায় উদ্ভিদের মধ্যে বাহিত হয়। অত্যাবশ্যক পদার্থগুলি মাটিতে অধিক পরিমাণে থাকলে এবং অধিক পরিমাণে উদ্ভিদ গ্রহণ করলে উদ্ভিদের পক্ষে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশী। এর ফলে উদ্ভিদের কলা ধ্বংস হয় এমনকি উদ্ভিদ মারা যেতেও পারে।

অত্যাবশ্যক মৌলিক পদার্থগুলির ভূমিকা ঃ

বালুকাকৃষ্টি (Sand culture) ও **জলকৃষ্টি** (Water culture) পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের অভাবে উদ্ভিদের **অভাবজনিত লক্ষণগুলি** (Deficiency symptoms) নির্ণয় করা যায়। এই পরীক্ষার দ্বারা উদ্ভিদের সুষম বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন উপাদানের পরিমাণ ও মৌল পদার্থগুলির উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা নির্দিষ্ট করা যায়।

অক্সিজেন, হাইড্রোজেন ও কার্বন উদ্ভিদের দেহে শর্করা, সেলুলোজ, প্রোটিন ও অন্যান্য যৌগ উৎপন্ন করে এবং এদের পরিমাণ প্রায় শুষ্ক ওজনে উদ্ভিদ দেহের শতকরা ৯৪ ভাগ। **নাইট্রোজেন** প্রোটিনের অ্যামাইনো অ্যাসিড ও নিউক্লিক অ্যাসিডের ক্ষারক উৎপন্ন করে।

ফসফরাস নিউক্লিক অ্যাসিডে থাকে এবং ব্যবহারোপযোগী শক্তি স্থানান্তরণে সাহায্য করে। ফসফরাস প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে লিপিড বস্তুর সাথে সংযুক্ত থাকায় প্রোটোপ্লাস্টের আকার এবং ভেদ্যতায় প্রয়োজনীয় কার্য করে।

গন্ধক দুই একটি অ্যামাইনো অ্যাসিডে থাকে এবং শ্বাসক্রিয়ায় ও উৎসেচক ক্রিয়ায় সাহায্য করে।

ক্যালসিয়াম কোষপ্রাচীরে এবং **ম্যাগনেসিয়াম** ক্লোরোফিলে থাকে। ম্যাগনেসিয়াম অভাবে ক্লোরোফিল উৎপন্ন হয় না, ফলে পাতা হলদে হয়ে যায়। এই

লক্ষণকে **'ক্লোরোসিস'** (chlorosis) বলে। **পটাশিয়াম** কিন্তু কোন উদ্ভিদ যৌগে থাকে না, তবে এই মৌল পদার্থের অভাবে পাতায় হলদে দাগ দেখা যায় এবং পরে পাতাটি শুকিয়ে যায়। পটাশিয়ামের কার্য এখনও নির্দিষ্টভাবে জানা নেই তবে প্রোটিন সংশ্লেষণে কিছু প্রভাব আছে বলে ধরা হয়।

লৌহের অভাবে ম্যাগনেসিয়ামের ন্যায় পাতার ক্লোরোফিল উৎপন্ন হয় না এবং পাতা হলদে হয়ে যায়। এর দ্বারা লৌহ যে ক্লোরোফিল উৎপাদনের উৎসেচক ক্রিয়ায় সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে তা প্রমাণিত হয়।

উপরে যে সব ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্টস-এর বর্ণনা করা হ'ল সেগুলি ব্যতীত **মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টসগুলি উদ্ভিদের বিভিন্ন উৎসেচক উৎপন্ন করে জৈবিক ক্রিয়া সচল রাখতে সাহায্য করে।** বিশেষতঃ ম্যাঙ্গানিজ অভাবে ক্লোরোফিল উৎপাদন ব্যাহত হয়ে পাতায় ক্লোরোসিস লক্ষণ দেখা।

NPK-এর প্রয়োজনীয়তা :

অত্যাবশ্যক মৌলিক পদার্থের অভাবে উদ্ভিদের অঙ্গজ বৃদ্ধি ফুল ও ফল উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটায়। মৌল বস্তুগুলির অভাবে ফসলের বিভিন্ন **ক্ষুধাজনিত লক্ষণ** (Hunger signs) দেখা দেয়। পরীক্ষার দ্বারা দেখা গেছে, উদ্ভিদের ম্যাক্রো-নিউট্রিয়েন্টস্‌ বা অধিক মৌল উপাদানের মধ্যে নাইট্রোজেন (*N*), ফসফরাস (*P*) এবং পটাসিয়াম (*K*) অধিক পরিমাণে প্রয়োজন হয়। এইজন্য *NPK*কে প্রাথমিক অত্যাবশ্যক উপাদান বলে।

জমির উর্বরতা বৃদ্ধি ও অধিক ফসল উৎপাদনে সারের ভূমিকা :

সবুজ উদ্ভিদ মাটি ও বায়ুর বিভিন্ন অজৈব বস্তু গ্রহণ করে খাদ্যবস্তু উৎপন্ন করে। কিন্তু মাটি বা বায়ুতে অজৈব বস্তুগুলির অভাব হলে উদ্ভিদ খাদ্য উৎপাদন করতে পারে না। একই জমিতে ক্রমাগত চাষ-আবাদের ফলে মাটিতে অত্যাবশ্যক মৌল পদার্থের অভাব হয় এবং ফসল উৎপাদন ব্যাহত হয়। এইজন্য চাষের জমিতে মৌল পদার্থগুলির অভাব পূরণের জন্য সার প্রয়োগ করা উচিত। **সার হচ্ছে কৃত্রিম পুষ্টিসাধক বস্তু যার মধ্যে উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় মৌল পদার্থগুলি উপযুক্ত পরিমাণে উপস্থিত থাকে এবং প্রয়োগে অধিক ফসল উৎপন্ন হয়।** বিভিন্ন প্রকার ফসলের জন্য সারের মধ্যে প্রয়োজনীয় মৌল উপাদানের প্রয়োজন। বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ভূমিকম্প এবং অত্যধিক বর্ষা জমির সারকে ধুয়ে নিয়ে যায়।

সার প্রধানত দু প্রকার :—(১) **জৈব** (Organic) এবং (২) **অজৈব** (Inorganic)।

(১) **জৈব সার**: মৃতপ্রাণীর দেহাবশেষ, পচা পাতা, গরুর গোবর ও অন্যান্য প্রাণীর ও মানুষের মল-মূত্রাদি, কচুরিপানা, পুকুরের পাঁক, সরষে, তিসি, রেড়ী প্রভৃতির খইল ইত্যাদি জৈব সাররূপে ব্যবহৃত হয়। এই সকল সার উদ্ভিদের পক্ষে সহজেই গ্রহণযোগ্য এবং মাটির ভৌত গুণের কোনও প্রকার পরিবর্তন করে না। জৈব সারকে উদ্ভিদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য করার মূলে **জীবাণু ও ছত্রাকের** অবদান যথেষ্ট, কারণ এরা বিভিন্ন প্রকার পচনক্রিয়ার দ্বারা উদ্ভিদের পক্ষে জৈব সারকে গ্রহণযোগ্য করে। জমির উর্বরতা বাড়াতে ছোলা, মটর, ধনচে ইত্যাদির চাষ করতে হয়, কারণ এই সকল শিম্বজাতীয় উদ্ভিদের মূলে **রাইজোবিয়াম জাতের ব্যাকটিরিয়া অবুর্দ সৃষ্টি করে নাইট্রোজেন সংযুক্ত করে**। এই নাইট্রোজেন মাটির উর্বরতা বাড়ায়। এজন্য একই জমিতে একবার শিম্ব জাতীয় উদ্ভিদের চাষ করে পরে ধান, গম বা অন্য প্রকার চাষ করলে ফলন বাড়ে।

(২) **অজৈব সার**: বিভিন্ন প্রকার অজৈব লবণ যাদের মধ্যে নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম ও ক্যালসিয়াম ইত্যাদি বর্তমান এবং উদ্ভিদের পক্ষে সহজ গ্রহণযোগ্য তাদের অজৈব সার বলে। অজৈব সার জৈব সারের মত জমির স্থায়ী উর্বরতা বাড়ায় না তবে বিশেষ বিশেষ উচ্চফলনশীল ধান বা গমের চাষে এদের সুষ্ঠু প্রয়োগে প্রচুর ফলন বাড়ে। অজৈব সারে একসঙ্গে সকল প্রকার পুষ্টির উপাদান থাকে না সেজন্য মাটির রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে যে পদার্থের অভাব দেখা যায় কেবলমাত্র সেই উপাদানের সার প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়। বিভিন্ন প্রকার অজৈব সারের মধ্যে **অ্যামোনিয়াম সালফেট, অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট এবং ইউরিয়া** অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এরা উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় প্রোটিন সংশ্লেষে অংশগ্রহণ করে। অন্যান্য সারের মধ্যে **মিউরেট অব পটাশ, সুপার ফসফেট** ইত্যাদি উদ্ভিদের পক্ষে প্রয়োজনীয় পুষ্টি যোগায় এবং বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

প্রাণীদের পুষ্টিসাধন

খাদ্যাভ্যাস অনুযায়ী প্রাণীর শ্রেণীবিভাগ: উদ্ভিদের মত প্রাণীদেরও জীবনধারণ ও সকল প্রকার শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়ার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন। **প্রাণীরা পরভোজী** কারণ নিজেদের খাদ্য নিজেরা উৎপন্ন করতে পারে না, তারা উদ্ভিদের

নিকট হতে খাদ্য গ্রহণ করে। খাদ্যাভ্যাস অনুযায়ী প্রাণীদের মধ্যে যারা কেবলমাত্র উদ্ভিদ খাদ্য গ্রহণ করে তাদের **শাকাশী** (Hervivorous) বলে। যারা মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি আমিষ খাদ্য গ্রহণ করে তাদের **মাংসাশী** (Carnivorous) বলে। আবার অনেক প্রাণী আছে যারা উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ উভয় প্রকার খাদ্য গ্রহণ করে পুষ্টিসাধন করে তাদের **সর্বভুক** বা সর্বাশী (Omnivorous) বলে। খরগোস, ছাগল, গরু, হরিণ ইত্যাদি শাকাশী প্রাণী। বাঘ, সিংহ ইত্যাদি মাংসাশী এবং মানুষ, ইঁদুর, ভালুক ইত্যাদি সর্বাশী প্রাণীর উদাহরণ। আবার অনেক প্রাণী আছে যারা নিজেরা খাদ্য সংগ্রহ বা পরিপাক করে না অন্য প্রাণীর কাছ থেকে তৈরী খাদ্য গ্রহণ করে, তাদের **পরজীবী** (Parasite) বলে। যকৃৎ, কৃমি, চ্যাপ্টাকৃমি, রক্ত আমাশয় সৃষ্টিকারী এণ্টামিবা হিস্টোলাইটিকা ও ম্যালেরিয়া সৃষ্টিকারী প্লাসমোডিয়াম ভাইভাক্স ইত্যাদি বিশিষ্ট উদাহরণ।

খাদ্য শক্তি যোগায় : প্রাণীরা যে প্রকারের খাদ্যই আহার করুক না কেন সেগুলি উৎসেচকের সাহায্যে দেহের মধ্যে সরল বস্তুতে পরিণত ও শোষিত হয়ে জীবদেহের বৃদ্ধি, ক্ষতিপূরণ ও অন্যান্য জৈবিক কার্যে সাহায্য করে। খাদ্যের সারাংশ কোষের মধ্যে স্থৈতিক শক্তিরূপে সঞ্চিত থাকে এবং জৈবিক প্রয়োজনে তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে শারীরবৃত্তীয় কার্যাদি চালায়। সুতরাং সকল প্রাণী ও আমরা যে খাদ্য আহার করি সেগুলি মুখরোচক বলে নয়, দেহের পুষ্টিসাধন ও শক্তির প্রয়োজনে লাগে বলে আহার করি। প্রাণীদের আকার, আয়তন ও শারীরিক কর্ম অনুযায়ী খাদ্যের পরিমাণ নির্ভরশীল। একই বয়সের মানুষের দেহের আয়তন ও শারীরিক পরিশ্রম অনুযায়ী খাদ্যের পরিমাণ ও গুণাগুণ বিভিন্ন প্রকারের হয়। কম পরিশ্রমী মানুষ অপেক্ষা কঠোর শারীরিক পরিশ্রমী মানুষের অধিক শক্তির প্রয়োজনে খাদ্যের প্রয়োজনও অধিক হয়।

বিপাক (Metabolism)

জীবদেহে বিশেষতঃ মানুষের খাদ্যের পরিপাক ও দেহের বিভিন্ন কোষের মধ্যে শোষিত হওয়ার পর খাদ্যের সারাংশ প্রধানতঃ তিনটি কাজ করে, যথা—(১) কোষের মধ্যে নূতন প্রোটোপ্লাজম উৎপন্ন করে দেহের বৃদ্ধি ঘটায়। এই প্রক্রিয়াকে **উপচিতি** বা **অ্যানাবোলিজম্** (Anabolism) বলে। (২) দেহের জৈবিক কাজের জন্য শক্তির প্রয়োজনে খাদ্যাংশগুলি রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ভেঙে যায়। এই প্রক্রিয়াকে

অপচিতি বা **ক্যাটাবোলিজম্ (Catabolism)** বলে। (৩) শ্বেতসার পরিপাকে উৎপন্ন গ্লুকোজ গ্লাইকোজেন (প্রাণীজ শ্বেতসার) ও স্নেহ হিসাবে ভবিষ্যতের প্রয়োজনে দেহের মধ্যে যকৃৎ, পেশী ও বিভিন্ন অংশে সঞ্চিত থাকে। পুষ্টি, শ্বসন ও সংশ্লেষণ ইত্যাদি জৈবিক প্রক্রিয়াগুলির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন কার্য এবং এই তিনটি প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য প্রক্রিয়াগুলিকে একত্রে বিপাক বলে। সুতরাং **দেহের মধ্যে সকল প্রকার রাসায়নিক পরিবর্তনকেই বিপাক** বলে।

পুষ্টিক্রিয়ায় জীবের প্রাণধারণের উপযোগী প্রয়োজনীয় কাঁচামাল (কার্বোহাইড্রেট, বা শ্বেতসার, প্রোটিন, স্নেহ এবং ভিটামিন ইত্যাদি) সরবরাহ হয়ে শ্বসন দ্বারা শক্তি উৎপন্ন করে। এই শক্তির কিছু অংশের দ্বারা জীবদেহের গঠন উপযোগী উপাদান সংশ্লেষণ এবং বাকী অংশ ও বিভিন্ন দেহযন্ত্রের দ্বারা বংশধর সৃষ্টি করে।

জৈব বিপাকের সাথে জড় মেশিনের তুলনাঃ জীবদেহের পুষ্টির সঙ্গে মেশিন চালাবার জন্য বিভিন্ন প্রকার জালানির তুলনা করা যায়। জালানির দ্বারা মেশিন চালিয়ে বিভিন্ন কাঁচামালের সাহায্যে নাট, বল্টু, বুশ এবং আরও বহুপ্রকার মেশিনের যন্ত্রাংশ উৎপন্ন করে অনুরূপ আরেকটি মেশিন তৈরী করতে পারা যায়। কিন্তু কোনও কারণে জালানির ও কাঁচামালের অভাব বা জালানির দহন না হওয়ায় মেশিন বন্ধ হয়ে যেতে পারে। ফলে কোনও যন্ত্রাংশ উৎপন্ন হয় না কিন্তু মেশিনটি অটুট থাকে। জীবদেহে মেশিনের মত পুষ্টি, শ্বসন ও সংশ্লেষণ না হলে জীবদেহের বিভিন্ন জৈবিক ক্রিয়া বন্ধ হয়ে জীবের মৃত্যু হয়। সুতরাং বিপাক জীবন নামক মেশিনকে সক্রিয় রাখে বলা যায়।

খাদ্যের বিভিন্ন উপাদানের বিপাক

(ক) **শ্বেতসার বিপাকঃ** (১) **শোষণঃ** হেপাটিক পোর্টাল শিরাতন্ত্রের মাধ্যমে শ্বেতসার সরল শর্করারূপে ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে রক্তের দ্বারা শোষিত হয়। (২) **গ্লাইকোজেনে রূপান্তরঃ** শ্বেতসার পাচনে এক-শর্করা গ্লাইকোজেনের শোষিত হওয়ার পর দেহের বিভিন্ন কলার মধ্যে তৎক্ষণাৎ প্রয়োজন না হলে যকৃৎ এবং পেশীর মধ্যে গ্লাইকোজেনে পরিবর্তিত হয়ে সঞ্চিত থাকে। গ্লাইকোজেন অণু বহু গ্লুকোজ অণুর সমন্বয়ে গঠিত বলে গ্লাইকোজেনকে **প্রাণীজ শ্বেতসার** (Animal starch) বলে। (৩) **শক্তির**

উৎপাদন : এক গ্রাম গ্লুকোজ জারণের ফলে ৪'৩ ক্যালোরি তাপ শক্তি উৎপন্ন করে। দেহের প্রয়োজনে গ্লুকোজ দ্রুত জারিত হয়ে শক্তি যোগায়। (৪) **রক্তের শর্করার মাত্রা নির্দিষ্ট রাখা :** রক্তের মধ্যে সাধারণত ০'০৮—০'১২ ভাগ গ্লুকোজ থাকে এবং অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে কোষের মধ্যে গ্লুকোজের অভাব হয় এবং রক্ত তা সরবরাহ করে। রক্তের গ্লুকোজের পরিমাণ কমে গেলে যকৃতের গ্লাইক্লোজেন রক্তের গ্লুকোজে পরিণত হয়ে অভাব মিটায়। কিন্তু অধিক গ্লুকোজ রক্তে বাহিত হলে তা আবার যকৃতের মধ্যে গ্লাইকোজেনে পরিণত হয়ে সঞ্চিত থাকে। রক্তের মধ্যে গ্লুকোজের পরিমাণ নির্দিষ্ট মাত্রায় ধরে রাখতে **ইনসুলিন** (Insulin) নামে হরমোন (অগ্ন্যাশয়ের আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহান থেকে উৎপন্ন হয়) কাজ করে। (৫) **স্নেহ উৎপাদন :** অত্যধিক পরিমাণ শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করলে বিপাক ক্রিয়ায় দেহের মধ্যে স্নেহজাতীয় পদার্থ উৎপন্ন হয়। (৬) **প্রেটিন উৎপাদন :** শ্বেতসার থেকে উৎপন্ন ল্যাকটিক অ্যাসিডের সাথে অ্যামোনিয়া মিলিত হয়ে প্রোটিন উৎপাদন করে।

(খ) **প্রোটিন বিপাক :** (১) **শোষণ :** পরিপাকের ফলে প্রোটিন খাদ্য অ্যামাইনো অ্যাসিডরূপে পোর্টাল শিরাতন্ত্রের মাধ্যমে যকৃতে উপস্থিত হয়। যকৃৎ তার প্রয়োজনীয় অ্যামাইনো অ্যাসিড গ্রহণ করে বাকি অংশকে রক্তের মধ্যে পরিত্যাগ করে। বিভিন্ন কোষ রক্তের মধ্য হতে তাদের প্রয়োজনীয় অ্যামাইনো অ্যাসিড গ্রহণ করে। (২) **কোষের প্রোটোপ্লাজম গঠন** অ্যামাইনো অ্যাসিড দ্বারা পরিচালিত হয়। (৩) **ক্ষয়পূরণ :** বিপাক ক্রিয়ার ফলে বিভিন্ন কলার প্রোটিন ভেঙে যায় এবং অ্যামাইনো অ্যাসিড তা মেরামত করে। (৪) **প্লাজমা প্রোটিন উৎপাদন :** রক্তের প্লাজমা প্রোটিন যথা—প্রোথ্রম্বিন, ফাইব্রিনোজেন ইত্যাদি যকৃতের মধ্যে অ্যামাইনো অ্যাসিড দ্বারা উৎপন্ন হয়। (৫) **বিভিন্ন বস্তু উৎপাদন :** বিভিন্ন উৎসেচক, হরমোন, দুগ্ধ প্রোটিন, অ্যান্টিবডি ইত্যাদি অ্যামাইনো অ্যাসিড উৎপন্ন করে। (৬) **অ্যামোনিয়া ও ইউরিয়া উৎপাদন :** অতিরিক্ত অ্যামাইনো অ্যাসিড ভে ইউরিয়া উৎপন্ন হয়ে বর্জ্য পদার্থরূপে নিষ্কাশিত হয়। (৭) **শক্তি উৎপাদন :** অ্যামাইনো অ্যাসিড ভেঙে শক্তি উৎপন্ন হয়। প্রতি গ্রাম প্রোটিন প্রায় ৪'৩ ক্যালোরি তাপ উৎপন্ন করে।

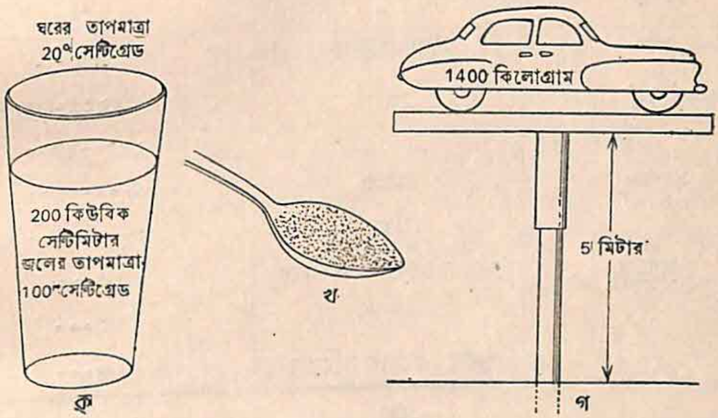
(গ) **স্নেহ বিপাক :** (১) **শোষণ :** স্নেহ পরিপাকের পর ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারলে বিভক্ত হয় এবং লসিকায়নীর (Lymphatics) মাধ্যমে শোষিত হয়। (২)

দেহের মধ্যে স্নেহ পদার্থ কোষের অতি প্রয়োজনীয় বস্তু ফসফোলিপিড ও কোলেসস্টেরল উৎপাদন করে। (৩) **শক্তি উৎপাদন :** স্নেহ পদার্থ সমপরিমাণ শ্বেতসার জাতীয় বা প্রোটিন জাতীয় পদার্থ অপেক্ষা দেহে প্রায় দ্বিগুণ শক্তি যোগায়। প্রতি গ্রাম স্নেহ প্রায় ৯·৩ ক্যালোরি তাপ উৎপন্ন করে। (৪) স্নেহ কোষের মধ্যে অ্যামাইনো অ্যাসিড ও শর্করা জাতীয় পদার্থও উৎপন্ন করে।

মৌল বা পৈঠ বিপাক (Basal metabolism) : বয়স ও কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী মানুষের দৈনিক তাপশক্তি যা ক্যালোরির পরিমাপের দ্বারা নির্দিষ্ট করা যায় তা বিভিন্ন হয়। যদি কোন ব্যক্তি ঘুমিয়ে থাকে তার বিপাকীয় কাজের জন্য যে পরিমাণ তাপশক্তি বা ক্যালোরির প্রয়োজন হয় সে ব্যক্তি জেগে থেকে যদি কোনও সামান্য পরিশ্রমের কাজও করে তদপেক্ষা অনেক কম। এমনকি যদি কোন ব্যক্তি সম্পূর্ণ বিশ্রাম অবস্থায় থাকে তার মানে চলন, খাদ্যগ্রহণ বা জননপ্রক্রিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন জৈবিক ক্রিয়া নাও করে তথাপি শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্যও কিছু পরিমাণ তাপশক্তির প্রয়োজন। এই সময় শ্বাসকার্য বা হৃদযন্ত্রের সংকোচন ও প্রসারণ ইত্যাদি ক্রিয়া যদি সামান্য মাত্রায়ও হয় তার জন্যও কিছু পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন হয়। **সুতরাং সম্পূর্ণ শারীরিক ও মানসিক বিশ্রাম এবং আরামপ্রদ পরিবেশে যে পরিমাণ শক্তি প্রাণীর প্রয়োজনে ব্যয়িত হয় তাকেই মৌল বিপাক বা বেসাল মেটাবোলিজম্ (Basal metabolism) বলে।** যে পরিমাণ শক্তি ব্যয়িত হয় তার পরিমাণকে মৌল বিপাকের পরিমাণ বা বেসাল মেটাবোলিক রেট (Basal Metabolic Rate or B. M. R.) বলে। মানুষের ক্ষেত্রে মৌল বিপাকের পরিমাণ পূর্ণবয়স্ক পুরুষের প্রতি ঘণ্টায় প্রতি বর্গমিটার দেহের আয়তন অনুযায়ী প্রায় ৪০ ক্যালোরি এবং মহিলাদের প্রায় ৩৭ ক্যালোরি।

মৌল বিপাকের পরিমাণ নির্ণয় : কোন প্রাণীর বা মানুষের মৌল বিপাকের হার নির্ণয় করতে হলে পরোক্ষ উপায় অবলম্বন করতে হয়। প্রথমে কোনও নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্লুকোজ জারিত করতে কি পরিমাণ অক্সিজেন প্রয়োজন এবং কত ক্যালোরি তাপ উৎপন্ন হয় তা নির্ণয় করতে হবে। পরে কোনও প্রাণীর কি পরিমাণ অক্সিজেন শ্বসনে প্রয়োজন হয় জানলে, সেই প্রাণীর মৌল বিপাকের পরিমাণ পূর্বের হার অনুযায়ী হিসাব করে মৌল বিপাকে ক্যালোরি তাপমাত্রা ব্যয়ের পরিমাণ নির্দিষ্ট করা যায়। এই হার স্বাভাবিক অবস্থায় বয়স ও স্ত্রী-পুরুষ ভেদে পরিবর্তিত হয়।

ক্যালোরি ('alorie) ও কিলো ক্যালোরি (Kilo Calorie) কাকে বলে :
কাঠ, কয়লা কেরোসিন ও পেট্রোল ইত্যাদি পুড়িয়ে যেমন তাপ সৃষ্টি হয় সেইরূপ বিপাক ক্রিয়ায় কোষের মধ্যে সঞ্চিত খাদ্যবস্তু জারণের ফলেও তাপশক্তির সৃষ্টি হয়। তাপশক্তি পরিমাপের একককে **ক্যালোরি** (Calorie) বলে। এক গ্রাম জলকে



১০নং চিত্র। (খ) এক চামচ চিনি সম্পূর্ণ জারিত হলে ১৬ কিঃ ক্যালোরি শক্তি উৎপন্ন করতে পারে। (ক) এই পরিমাণ শক্তি ঘরের ২০° সেঃ তাপমাত্রায় একগ্লাস জলকে (২০০ কিঃ সেন্টিমিটার) ১০০° সেঃ তাপমাত্রায় পরিবর্তিত করতে এবং (গ) একটি ১৪০০ কিঃ গ্রাম মোটর গাড়িকে ৫ মিটার উপরে তুলতে পারে।

এক সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় তুলতে যে পরিমাণ উত্তাপ প্রয়োজন তাকে **ক্যালোরি** বা **ছোট ক্যালোরি** বলে। কিলো ক্যালোরি হচ্ছে ১০০০ গ্রাম জলকে ১৪.৫ থেকে ১৫.৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় তুলতে যে পরিমাণ উত্তাপ প্রয়োজন তাকেই বুঝায়। **কিলো ক্যালোরিকে** (Kilo Calorie) **বড় ক্যালোরিও** (Big Calorie) বলে। কিলো ক্যালোরি হচ্ছে ছোট ক্যালোরির এক হাজার গুণ। এক গ্রামমোল গ্লুকোজের মধ্যে (প্রায় ১৮০ গ্রাম) ৬৭৩ কিলো ক্যালোরি সৌরশক্তি সঞ্চিত থাকে এবং জারণের ফলে একই পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হয়।

পুরুষ ও স্ত্রী ভেদে, বয়স ও কার্য অনুযায়ী মানুষের প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয় শক্তির পরিমাণ

বয়স (বৎসর)	পুরুষ ও স্ত্রী	প্রাত্যহিক ক্যালোরির প্রয়োজন
১-৩	শিশু	১০০০-১২৫০
৩-৬	"	১৫৫০
৬-৮	বালক/বালিকা	১৮৫০
৮-১০	" "	২১৫০
১০-১৪	" "	২৫৫০-২৯০০
১৪-১৮	বালক	৩০০০-৩৪০০
	বালিকা	২৮০০-৩০০০
পূর্ণবয়স্ক	পুরুষ (হালকা কাজ করে)	৩০০০
"	গৃহিণী	২০০০
"	পুরুষ (কঠোর পরিশ্রমী)	৪০০০

জীবের খাদ্য

খাদ্য কি এবং তার প্রয়োজনীয়তা ঃ জীবজগতে যে-কোনও প্রাণী বা উদ্ভিদ সকলেরই পুষ্টি, বৃদ্ধি, ক্ষয় পূরণ ও অন্যান্য জৈবিক কার্যের জন্য খাদ্যের প্রয়োজন। জীব দেহের কোষে যে প্রোটোপ্লাজম থাকে তাকে জীবনের ভৌত ভিত্তি বলে। প্রোটোপ্লাজম অত্যন্ত চঞ্চল ও ক্রিয়াশীল থাকার জন্য প্রচুর শক্তির প্রয়োজন। শক্তির অভাবে প্রোটোপ্লাজম নিষ্ক্রিয় হয় এবং জীবের মৃত্যু ঘটে। উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য কোষের মধ্যে দহনের ফলে প্রোটোপ্লাজম তাদের প্রয়োজনীয় শক্তি সংগ্রহ করে সচল থাকে। এই সাথে কোষের বৃদ্ধি, পুষ্টি ইত্যাদির জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলিও খাদ্য যোগায়। সুতরাং **উদ্ভিদ বা প্রাণী জীবনধারণ, পুষ্টি, বৃদ্ধি এবং ক্ষয়পূরণের জন্য যে সব বস্তু দেহের মধ্যে গ্রহণ করে তাকে খাদ্য (Food) বলে।**

খাদ্যের উৎস ও শ্রেণীবিভাগ ঃ আমরা প্রত্যহ যে সকল বস্তু খাদ্যরূপে আহার করি সেগুলি সাধারণতঃ ভাত, রুটি, ডাল, শাকসব্জী, ফল, দুগ্ধ বা দুগ্ধজাত বস্তু, মাছ, মাংস ও ডিম ইত্যাদি। এই সকল খাদ্যবস্তুকে গুণ ও কার্য অনুযায়ী তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা—যে খাদ্যবস্তু (১) দেহ সক্রিয় রাখার জন্য শক্তি

যোগায়—তাদের **কর্ম-শক্তিদায়ক** (Energy giving); (২) দেহের ক্ষয় রোধ করে দেহের বৃদ্ধি ঘটায় তাদের **দেহ গঠনকারী** (Body building) এবং (৩) দেহে রোগ প্রতিরোধক শক্তি বৃদ্ধি করে তাদের **প্রতিরোধক খাদ্য** (Protective) বলে।

খাদ্যের শ্রেণীবিভাগের তলিকা

গুণানুযায়ী খাদ্যের বিভাগ	কর্ম-শক্তিদায়ক	দেহ গঠনকারী	রোগ প্রতিরোধক
কার্য	দেহে উত্তাপ ও শক্তি সৃষ্টি করে	দেহের ক্ষয়-পূরণ ও নূতন কোষসৃষ্টি করে বৃদ্ধি ঘটায়	বিভিন্ন রোগের আক্রমণের বিরুদ্ধে দেহে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলে।
উৎস	বিভিন্ন শস্য, শ্বেতসার প্রধান ফল ও শাকসব্জি, ডাল, মিছরি, শর্করা (চিনি), ঘি, তেল ইত্যাদি।	ডালজাতীয়, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য, মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি।	দুগ্ধ, শাকসব্জি ও ফল ইত্যাদি।

খাদ্যের মুখ্য উপাদান : প্রাণী বা উদ্ভিদ উভয়েরই খাদ্যের মুখ্য উপাদানগুলি প্রধানতঃ (১) কার্বোহাইড্রেট বা শ্বেতসার, (২) প্রোটিন বা আমিষ, (৩) ফ্যাট বা স্নেহ, (৪) খনিজ ও লবণ, (৫) জল এবং (৬) ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ। অধিকাংশ উচ্চশ্রেণীর প্রাণী যেমন, স্তন্যপায়ীর ক্ষেত্রে ভিটামিন অতি প্রয়োজনীয় বস্তু। তবে কিছু সংখ্যক উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও ভিটামিন বি কমপ্লেক্স-এর প্রয়োজনীয়তা জানা গেছে। উদ্ভিদ ও প্রাণীর খাদ্যের মুখ্য উপাদানগুলি একই প্রকারের হলেও বিভিন্ন প্রাণী বা উদ্ভিদের খাদ্যে এই সকল উপাদানের উপস্থিতির অনুপাতের হেরফের হয়।

খাদ্যের বিভিন্ন উপাদানের বর্ণনা : উদ্ভিদ বিভিন্ন প্রকার মৌলিক উপাদান বাতাস ও মাটি থেকে সংগ্রহ করে যে খাদ্য উৎপাদন করে তা প্রাণীরা খায় এবং নিজেদের দেহে সেই সকল খাদ্যের বিভিন্ন সারবস্তুর দ্বারা দেহের গঠন, পরিপোষণ

ও বৃদ্ধি ঘটায়। উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ খাদ্যের **মৌলিক উপাদান** শ্বেতসার, প্রোটিন, স্নেহ, বিভিন্ন প্রকার খনিজ লবণ, ভিটামিন ও জল ইত্যাদির বর্ণনা—

(ক) **শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য** (Carbohydrate) : উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করে এবং দেহের বিভিন্ন কোষে সঞ্চিত রাখে। প্রাণীরা সেই খাদ্য গ্রহণ করে নিজেদের প্রয়োজন মেটায়। আমরা যে খাদ্য খাই তার মধ্যে শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যই প্রধান, শুধু তাই নয় এই খাদ্যই আমাদের সর্বাধিক শক্তি যোগায়।

শ্বেতসার খাদ্যের খাদ্যমূল্য

খাদ্যের নাম	১০০ গ্রাম খাদ্যে উপস্থিতির পরিমাণ	তাপশক্তি উৎপাদনের পরিমাণ
ভাত	৭৮·২	৩৪৮ ক্যালোরি
রুটি	৭০	৩৪৬ ”
চিনি	৯৯·৪	৩৯৮ ”
ডাল	৬৯·৪	৩৬১ ”
কলা	২৪·৭	১০৪ ”
আলু	২২·৭	৯৭ ”
পাকা আম	১১·৮	৫০ ”
দুগ্ধ (গরু)	৪·৪	৫৭ ”

উৎস : ভাত, রুটি, আলু, চিনি, গুড় এবং বিভিন্ন ফল ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে এবং মেটে, মাংস ও দুগ্ধ ইত্যাদিতে অল্প পরিমাণে শ্বেতসার থাকে।

রাসায়নিক গঠন : গঠন অনুযায়ী আলু, ভাত, রুটি, বার্লি ইত্যাদিকে **বহুশর্করা** বা **পলিস্যাকারাইড** (Polysaccharide), আখের চিনি, তাল মিছরি, দুগ্ধ শর্করা ইত্যাদিকে **দ্বিশর্করা** বা **ডাইস্যাকারাইড** (Disaccharide) এবং গ্লুকোজ (দ্রাক্ষাশর্করা), ফ্রাকটোজ (ফলশর্করা), গ্যালাকটোজ (দুগ্ধশর্করা) ইত্যাদিকে **একশর্করা** বা **মনোস্যাকারাইড** (Monosaccharide) বলে। এর মানে অনেকগুলি মনোস্যাকারাইড অণুর মিলনে



১১ নং চিত্র ॥ শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য।

পলিস্যাকারাইড এবং দুটি মনোস্যাকারাইড অণুর মিলনে ডাইস্যাকারাইড উৎপন্ন হয়। মনোস্যাকারাইড বা একশর্করা অক্সিজেন, হাইড্রোজেন ও কার্বনের সংমিশ্রণে গঠিত হয় এবং সর্বদা হাইড্রোজেনের পরিমাণ অক্সিজেনের চেয়ে দুগুণ বেশী থাকে। শ্বেতসার আর্দ্রবিশ্লেষে একশর্করায় পরিণত হয়।

কার্য : (১) দেহে সর্বদা শক্তি যোগানো, তাপ সংরক্ষণ এবং দৈহিক পরিশ্রমে শক্তি যোগানোর জন্য অতি প্রয়োজনীয়। (২) এক গ্রাম শর্করা প্রায় ৪.৩ ক্যালোরি তাপ উৎপন্ন করে। (৩) মিষ্টি স্বাদ খাদ্যকে রুচিকর করে। (৪) দেহে শর্করা পরিবর্তিত হয়ে যে মেদ উৎপন্ন হয় তা দেহকে রক্ষা করে। (৫) স্নেহজাতীয় পদার্থ দহনে শর্করা অতি প্রয়োজনীয় অংশরূপে কাজ করে।

(খ) **প্রোটিন বা আমিষ জাতীয় খাদ্য** (Protein) : প্রাণীদের এবং আমাদের দেহের প্রধান অংশই হচ্ছে প্রোটিন—কোষের প্রোটোপ্লাজম থেকে রক্ত, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, মাংস, ত্বক, চুল, নখ এবং দেহের সর্ব অংশই প্রোটিন দ্বারা গঠিত। **ডাঃ মূলডার** নামে বিশিষ্ট **ডাচ্ বিজ্ঞানী** ১৮৩৮ খ্রীঃ ঘোষণা করেন যে, সকল প্রাণী এবং উদ্ভিদের ক্রিয়াকলাপ এবং জীবিত থাকার জন্য খাদ্যের একটি বিশেষ পদার্থ দায়ী। তিনি এই পদার্থটির নাম দেন প্রোটিন, এটি একটি গ্রীক শব্দ, এর মানে প্রথম স্থান। পরবর্তী কালে তাঁর নামকরণ যে সার্থক হয়েছিল তা প্রমাণিত হয়েছে কারণ সকল জীবের দেহ গঠনের প্রধান উপাদান হচ্ছে প্রোটিন।

বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যে প্রোটিনের পরিমাণ

খাদ্যের নাম	প্রোটিনের শতকরা পরিমাণ
শস্যে	৬-১৩
ডালে	২১
নারকেলে	৬.৮
তৈল বীজে	১৬.৩২
মাছে	১৫-২৬
মাংসে	১৮-২৬
ডিমে	১৩
দুগ্ধে	৩.২-৪.৩
সয়াবীনে	৪৩.২
বাদামে	২৬.৭
ফলে	১.২

উৎস ঃ উদ্ভিজ্জ প্রোটিন—আটা, ডাল, সয়াবীন, ব্যাঙের ছাতা ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। প্রাণীজ প্রোটিন—দুগ্ধ, ছানা, ডিম, মাছ, মাংস, রসগোল্লা ও সন্দেশ ইত্যাদি।



১২.নং চিত্র। প্রোটিন জাতীয় খাদ্য।

রাসায়নিক গঠন ঃ রাসায়নিক গঠনে প্রোটিন অত্যন্ত জটিল জৈব যৌগ এবং এর মধ্যে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ব্যতীত **নাইট্রোজেন অত্যাবশ্যক উপাদান**। এজন্য প্রোটিন জাতীয় খাদ্যকে **নাইট্রোজেনযুক্ত খাদ্য** বলে। অনেক প্রোটিনে লৌহ, ফসফরাস, গন্ধক ও আয়োডিন ইত্যাদিও থাকে। সকল প্রকার প্রোটিনের একক হচ্ছে **অ্যামাইনো অ্যাসিড**। প্রোটিন আর্দ্রবিশ্লেষে অ্যামাইনো অ্যাসিডে পরিণত হয়। ২২ প্রকার বিভিন্ন গঠনের অ্যামাইনো অ্যাসিড বিভিন্ন রূপে সজ্জিত হয়ে নানা প্রকার প্রোটিন উৎপন্ন করে। এই সকল অ্যামাইনো অ্যাসিডের মধ্যে অনেকগুলি খাদ্যের উপাদান থেকে দেহে তৈরী হয়। আবার অনেকগুলি দেহে তৈরী হয় না অথচ দেহ গঠনে অপরিহার্য, সেগুলি সরাসরি খাদ্য থেকে গ্রহণ করে, তাদের **অপরিহার্য অ্যামাইনো অ্যাসিড** (Essential amino acids) বলে। দেহগঠনে যে সকল অ্যামাইনো অ্যাসিড অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, কোনও প্রোটিনে সেগুলি থাকলে তাদের **উচ্চশ্রেণীর প্রোটিন** এবং কম পরিমাণে বা না থাকলে **নিম্নশ্রেণীর প্রোটিন** বলে। যে সকল খাদ্যে উপযুক্ত পরিমাণে প্রায় সকল প্রকার অ্যামাইনো অ্যাসিড থাকে তাদের **সম্পূর্ণ প্রোটিন খাদ্য** বলে। দুগ্ধ ও ডিম এই জাতীয় খাদ্য, সুতরাং আমাদের খাদ্যতালিকায় দুধ ও ডিম অত্যাবশ্যক।

কার্য ঃ (১) দেহের বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ, রক্তরস ও রক্তকণিকা গঠন ইত্যাদি।

(২) বাল্যকালে শিশুদের দেহের বৃদ্ধির জন্য প্রোটিনের অধিক প্রয়োজন, খাদ্যে প্রোটিন অংশ প্রয়োজন মত না থাকলে অপুষ্টিজনিত রোগ দেখা দেয়।

(৩) কোষের প্রোটোপ্লাজম গঠন এবং হরমোন (উত্তেজক রস), উৎসেচক ও দেহে রোগের আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিষেধক এ্যান্টিবডি ইত্যাদি প্রস্তুত করে।

(৪) দহনের ফলে দেহে তাপ উৎপন্ন করে, প্রতি গ্রাম প্রোটিন প্রায় ৪·৩ ক্যালোরি তাপ যোগায়।

(গ) **স্নেহ জাতীয় খাদ্য** (Fat) ঃ দেহের লাবণ্য, মেদ ও বিভিন্ন দেহযন্ত্রের

মধ্যে আস্তরণ প্রস্তুত করার জন্য খাদ্যের প্রধান উপাদান স্নেহ বা ফ্যাট অবশ্য প্রয়োজনীয়।

উৎস ঃ উদ্ভিজ্জ-স্নেহ—বাদাম, নারকেল, সরিষা ও সূর্যমুখী বীজের তেল এবং বনস্পতি ইত্যাদি।

প্রাণীজ-স্নেহ—ঘি, মাখন, মাছের তেল (কড্ লিভার অয়েল, শার্ক লিভার অয়েল), প্রাণীর চর্বি ইত্যাদি।



১৩ নং চিত্র॥ স্নেহজাতীয় খাদ্য।

রাসায়নিক গঠন ঃ শ্বেতসারের ন্যায় স্নেহের বা ফ্যাটের প্রধান উপাদান হচ্ছে কার্বন, অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন তবে অক্সিজেনের পরিমাণ কার্বন ও হাইড্রোজেন অপেক্ষা অনেক কম। এইসকল উপাদান একত্রে ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারল নামক পদার্থ প্রস্তুত করে এবং ঐ দুটি পদার্থের অণুর মিলনের ফলে স্নেহ প্রস্তুত হয়। স্নেহ আর্দ্রবিশ্লেষে ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারলে পরিণত হয়। **তেল ও ঘি-এর মধ্যে প্রধান পার্থক্য হচ্ছে ঘি অল্প তাপে জমে যায় কিন্তু তেল জমে না।** স্নেহ জাতীয় পদার্থ জলে মেশে না কিন্তু অ্যালকোহলে মিশে যায়।

বিভিন্ন খাদ্যে স্নেহ পদার্থের পরিমাণ

খাদ্যের নাম	স্নেহের শতকরা পরিমাণ	শতকরা তাপশক্তি উৎপাদন
ঘি	৯৯.৫	৮৯৫ ক্যালোরি
মাখন	৮১.০	৭২৯ ক্যালোরি
বনস্পতি ও উদ্ভিজ্জ তৈল	১০০	৯০০ ক্যালোরি
তৈল বীজ ও বাদাম ইত্যাদি	৩৭-৬৪.৫	৫৩৭-৬৪৭ ক্যালোরি
ডিম	১৩.৩	১৭৩ ক্যালোরি
পাঁঠার মাংস	১৩.৩	১৯৪ ক্যালোরি
দুগ্ধ (গরু)	৪.১	৬৭ ক্যালোরি

কার্য ঃ (১) স্নেহ দহনের দ্বারা শ্বেতসার বা প্রোটিন অপেক্ষা দ্বিগুণ বেশী শক্তি দেয়। এক গ্রাম স্নেহ দহনের ফলে প্রায় ৯.৩ ক্যালোরি তাপ উৎপন্ন হয়।

(২) মেদ সৃষ্টি করে দেহের লাবণ্য আনে এবং স্নায়ুতন্ত্র গঠনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে।

(৩) শরীরের ক্ষয় নিবারণ ও প্রোটিন জাতীয় পদার্থকে রক্ষা করে।

(৪) অনেক ভিটামিন স্নেহে দ্রবীভূত হয়ে দ্রুত দেহের মধ্যে শোষিত হয় এবং কয়েক প্রকার ভিটামিন স্নেহ জাতীয় খাদ্যে অধিক পরিমাণে থাকে।

বিভিন্ন প্রকার খনিজ ও লবণ (Minerals & Salts) ঃ

উদ্ভিদের মত মানুষের ও অন্যান্য প্রাণীর বিভিন্ন প্রকার অজৈব পদার্থ ও লবণ প্রয়োজন। আমাদের দেহের শতকরা চার ভাগ খনিজ দ্বারা গঠিত এই সকল পদার্থের অভাব বিপাকীয় ক্রিয়ায় অনুভূত হয় এবং বিভিন্ন প্রকার রোগ দেখা দেয়। এজন্য সুষম খাদ্যে বিভিন্ন খনিজ ও লবণ অত্যাবশ্যকীয়। বিভিন্ন প্রকার খনিজ ও অজৈব লবণের মধ্যে খাবার লবণ বা সোডিয়াম ক্লোরাইড এবং লৌহ, ক্যালসিয়াম, আয়োডিন, ফসফরাস, ম্যাগনেসিয়াম, পটাসিয়াম, ক্লোরিণ, ব্রোমিন ইত্যাদি অতি প্রয়োজনীয়।

(১) **খাবার লবণ বা সোডিয়াম ক্লোরাইড ঃ** দৈনন্দিন খাদ্যের প্রধান উপাদান লবণ পেশী ও রক্তের মধ্যে থেকে দেহকে সক্রিয় রাখে। খাদ্যে লবণের অভাব হলে খররৌদ্রের অত্যধিক গরমে এবং স্যাঁতসেতে আবহাওয়ায় প্রচুর ঘাম বেরিয়ে দেহের লবণের পরিমাণ কমে গেলে মানুষ ক্লান্ত, সর্দিগর্মিতে আক্রান্ত এমন কি অচেতন পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে।

(২) **লৌহ ঃ** লোহিত রক্তকণিকার মধ্যে হিমোগ্লোবিন তৈরী করে। প্রাণীজ খাদ্য —মাংস, যকৃৎ ও ডিমের মধ্যে এবং উদ্ভিজ্জ খাদ্য— কাঁচকলা, মটরশুঁটি, ফল ইত্যাদিতে পাওয়া যায়। লৌহের অভাবে **রক্তাল্পতা** বা অ্যানীমিয়া (Anaemia) রোগ দেখা দেয়।

(৩) **ক্যালসিয়াম ঃ** খরজল (Hard water), ডিম, দুধ ইত্যাদিতে থাকে। দেহের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় বস্তু, কারণ অস্থি ও দাঁত গঠনে, রক্ত জমাট বাঁধতে ও আরও বিভিন্ন প্রকার জৈবিক কাজের পক্ষে অপরিহার্য। ক্যালসিয়াম অভাবে **রিকেট, টিটেনাস** (ধনুষ্টঙ্কার) ইত্যাদি রোগ দেখা দেয়।

(৪) **ফসফরাস ঃ** দুধ, মাংস ও প্রাণীর মস্তিষ্ক, ডিম ও বিভিন্ন প্রকার শাক-সব্জীতে পাওয়া যায়। কোষ, অস্থি ও দাঁত গঠনে, পেশীসংকোচনে, রক্ত জমাট বাঁধানো এবং আরও বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কাজে দরকার। ফসফরাসের অভাবে **রিকেট** নামক রোগ হয়।

(৫) **পটাসিয়াম ঃ** প্রাণীজ ও উদ্ভিজ্জ বিভিন্ন খাদ্যে বর্তমান। শ্বাসক্রিয়ার রক্তের মধ্যে কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিবহণে, স্নায়ুতন্ত্রের বিভিন্ন ক্রিয়ায় দরকারী বস্তু।

(৬) **ম্যাগনেসিয়াম** : টাটকা শাক-সব্জী, মাংস, রুটি ইত্যাদিতে থাকে। অস্থি ও দাঁত গঠনে, বিভিন্ন উৎসেচককে সক্রিয় করা এবং আরও বিভিন্ন কাজে প্রয়োজনীয় বস্তু। ম্যাগনেসিয়ামের অভাবে রক্তচলাচলে বিশৃঙ্খলা, মানুষের **অতি-উত্তেজিত প্রবণতার প্রকাশ** ও অবশেষে খিঁচুনি দেখা দেয় এবং মৃত্যু ঘটে।

(৭) **আয়োডিন** : পানীয় জলে আয়োডাইডরূপে, খাবার লবণ ও সামুদ্রিক শৈবাল ইত্যাদিতে পাওয়া যায়। আয়োডিন থাইরক্সিন (Thyroxin) নামক হরমোন প্রস্তুত করে দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে সাহায্য করে, অভাবে **গলগণ্ড** রোগ দেখা দেয়।

আরও বিভিন্ন প্রকার খনিজ অত্যন্ত কম পরিমাণে খাদ্যে থাকা বাঞ্ছনীয় এবং বেশীর ভাগ খনিজই উদ্ভিজ্জ খাদ্য থেকে প্রাণীরা সংগ্রহ করে।

খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন (Vitamins) :

খাদ্যে শ্বেতসার, প্রোটিন ও স্নেহজাতীয় বস্তু থাকলেও দেহের পোষণ, বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ হয় না যদি এর সঙ্গে খাদ্যপ্রাণ না থাকে। পেট্রোল, কাঠ, কয়লা সবগুলি থাকলেও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দ্বারা না জ্বালালে যেমন তাপ উৎপন্ন হয় না, এও অনেকটা সেই প্রকার।

ভিটামিন আবিষ্কারের ইতিহাস :

খাদ্যের মধ্যে বিশেষ কোনও একটি বস্তুর অভাব হলে বিভিন্ন শারীরিক উপসর্গ ও রোগ দেখা দেয় এই ধারণা পূর্বে করা হত। বহুদিনের সমুদ্রযাত্রায় টাটকা শাক-সব্জীর অভাবে নাবিকদের স্কার্ভি রোগ দেখা দিত। ১৭৭১ খ্রীস্টাব্দে **ক্যাপটেন কুক** (1771, Captain Cook) অস্ট্রেলিয়া অভিযান কালে সমুদ্রযাত্রায় নাবিকদের খাদ্যের সাথে লেবুর রস খাওয়ানোর দ্বারা স্কার্ভি রোগের প্রাদুর্ভাব রোধ করেন। ১৮৪১ খ্রীস্টাব্দে বিজ্ঞানী **বুড** ধারণা করেন যে লেবুর রসের মধ্যে এমন একটি দ্রব্য আছে যা স্কার্ভি রোগের প্রতিষেধক।

ফুন্‌ক্‌ নামে অপর একজন বিজ্ঞানী ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে চালের কুঁড়ো, লেবুর রস এবং গরুর মস্তিষ্ক থেকে পিরামিডিন নামক বেরিবেরি রোগ প্রতিষেধক রাসায়নিক বস্তু আবিষ্কার করেন। তিনিই খাদ্যের বিভিন্ন প্রকার অত্যাবশ্যক সহকারী উপাদানের **ভিটামিন** নামকরণ করেন।

১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকান পুষ্টি-বিশেষজ্ঞ **ই. ভি. ম্যাকক্‌লাম** (E. V. Mccollum), **এম. জে. ডেভিস** (M. J. Davis) গবেষণাগারে ব্যবহৃত ইঁদুরদের বৃদ্ধিতে স্নেহে দ্রব ও জলে দ্রব দুটি বস্তুর প্রয়োজনীয়তা আবিষ্কার করেন। পরবর্তী কালে স্নেহে দ্রব বস্তুটি ভিটামিন A এবং জলে দ্রব বস্তুটি ভিটামিন B বলে জানা গেছে।

ভিটামিনের সংজ্ঞা ঃ ভিটামিন এক প্রকার জৈব অনুঘটক যা দেহের বাইরে উৎপন্ন এবং অতি অল্প পরিমাণে গৃহীত হয়ে স্বাভাবিক স্বাস্থ্য রক্ষা করে।

উৎস ঃ উদ্ভিদ নিজেরা অধিকাংশ ভিটামিন তৈরী করে, কোনও কোনও ভিটামিন প্রাণীদেহেও উৎপন্ন হয় এবং প্রাণীরা ভিটামিন সঞ্চিত করতে পারে।

দৈনিক প্রয়োজন ঃ ভিটামিন জৈব অনুঘটকের অংশরূপে (কোএনজাইম)



১৪নং চিত্র। বিভিন্ন খাদ্যবস্তুর মধ্যে বিভিন্ন প্রকার ভিটামিন।

অনুঘটককে সক্রিয় করে সুতরাং অতি অল্প অপরিমাণ থাকলেও কাজ চলে যায়। প্রাণীর বিপাকীয় ক্রিয়ায়, পরিশ্রমে, গর্ভাবস্থায় এবং শিশুদের বৃদ্ধিতে বিভিন্ন মাত্রায় প্রয়োজন হয়।

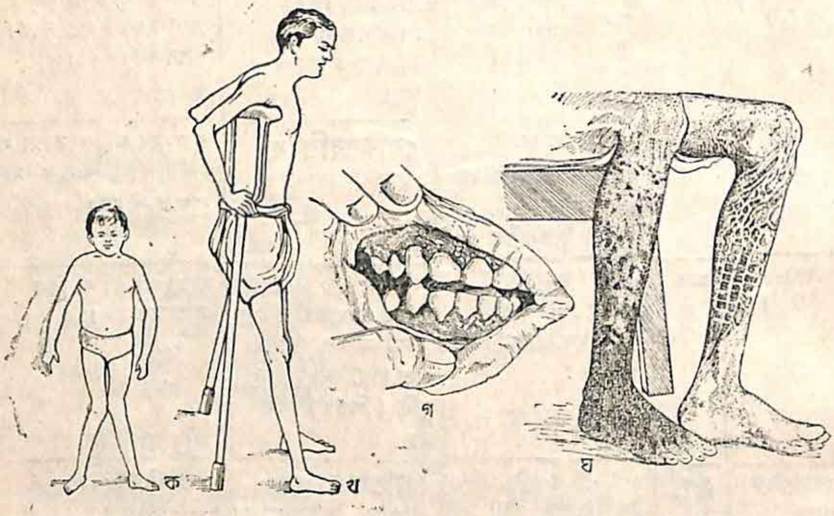
ভিটামিনের প্রকার ঃ জল ও স্নেহজাতীয় বস্তুতে দ্রবণীয়তা অনুযায়ী ভিটামিন দুই প্রকার : (ক) **জলে দ্রবণীয় ভিটামিন :** উদাহরণ : ভিটামিন B সমষ্টি, C ইত্যাদি। জলে দ্রবণীয় ভিটামিন B-র মধ্যে অনেকগুলি বিশিষ্ট অংশ আছে। যথা, B_1, B_2, B_3 (প্যাণ্টোথেনিক অ্যাসিড), নিয়াসিন. B_6 (পাইরিডোক্সিন), ফোলিক অ্যাসিড এবং B_{12} ইত্যাদি। এগুলিকে একত্রে B-সমষ্টি বলে।

(খ) **স্নেহে দ্রবণীয় ভিটামিন ঃ** উদাহরণ : ভিটামিন A, D, K ও E ইত্যাদি।

কয়েকটি প্রধান ভিটামিনের উৎস ও কার্যাবলীর তালিকা :

ভিটামিন	দ্রবণীয়	উৎস	অভাবজনিত রোগ	অন্যান্য তথ্য
ক্যারোটিন (A)	স্নেহ	দুগ্ধ, মাখন, মাছের তেল, গাজর, টম্যাটো, স্কোয়াশ ইত্যাদি।	রাত-কাণা জেরোপথালমিয়া, চর্মরোগ ও দেহের ক্ষয় হয়।	চোখের রেটিনায় রডোপসিন উৎপন্ন করে। তাপে নষ্ট হয় না।
B-সমষ্টি : (B_1 থায়ামিন	জল	ঢেঁকিছাঁটা চাল, ইষ্ট, মাংস, ডিমের কুসুম, মটর শুঁটি, ফুলকপি ইত্যাদি।	বেরিবেরি ও স্নায়বিক রোগ হয়	অল্প সময় অধিক তাপে নষ্ট হয় না কিন্তু অধিক সময় রাখলে নষ্ট হয়।
রিবোফ্লেবিন (B_2)	জল	মেটে (যকৃৎ), ডিমের শ্বেত অংশ, ডাল, দুগ্ধ, সোয়াবীন ইত্যাদি।	মুখে, জিহ্বায় ও ঠোঁটের কোণে ঘা হয়। চামড়া ফেটে মাছের আঁশের মত দাগ, চুল ওঠা ও বৃদ্ধি (শিশুর) বন্ধ হয়।	তাপে নষ্ট হয় না কিন্তু আলোতে হয়।
নিকোটিনিক অ্যাসিড (নিয়াসিন)	জল	মাছ, মাংস, ডিম, দুগ্ধ, টম্যাটো, ডাল ইত্যাদি	প্যালেগ্রা (চর্ম ও অন্ত্রের অভ্যন্তরস্থ ঝিল্লির ক্ষতি হয়)।	তাপে নষ্ট হয় না।
সায়ানোকোবালমিন (B_{12})	জল	ডিম, যকৃৎ, বৃক্ক	অত্যন্ত ক্ষতিকর রক্তাল্পতা রোগ হয়।	রক্তের লোহিত কণিকা উৎপন্ন এবং বৃদ্ধি করে।
অ্যাসকরবিক অ্যাসিড (C)	জল	কমলালেবু, পাতিলেবু, আমলকি, পেয়ারা, টম্যাটো ইত্যাদি।	স্কার্ভি (অন্ত্র, বৃক্ক ও চর্মের নিচের রক্ত-জালিকা ভঙ্গুর হয়ে রক্তপাত ঘটে)।	তাপে নষ্ট হয় না।
ক্যালসিফেরল (D)	স্নেহ	দুগ্ধ, মাখন, কডলিভার তেল ইত্যাদি।	শিশুদের রিকেট রোগ (অস্থি কোমল থাকায় বেঁকে যায়) ও দাঁতের গঠন ত্রুটি-পূর্ণ হয়।	মানুষের ত্বকে সূর্যের আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মির প্রভাবে উৎপন্ন হয়। তাপে নষ্ট হয় না।
টকোফেরল (E)	স্নেহ	ডিমের কুসুম, উদ্ভিজ্জ তেল, (গম ভ্রূণের তেলে সর্বাধিক থাকে)	বন্ধ্যাত্ব দেখা দেয় ও মাতৃগর্ভে ভ্রূণের বৃদ্ধি হয় না।	তাপে নষ্ট হয় না।
প্রোথ্রম্বিন ফ্যাক্টর (K)	স্নেহ	বাঁধাকপি, পালং শাক, টম্যাটো ও আন্ত্রিক ব্যাকটিরিয়া উৎপন্ন করে।	ক্ষতস্থানে রক্তের তঞ্চন বা জমাট বাঁধে না।	রক্তের মধ্যে প্রোথ্রম্বিন উৎপন্ন করে। তাপে নষ্ট হয় না।

অধিক ভিটামিন গ্রহণের অপকারিতা ঃ বর্তমানে বহু প্রকার ভিটামিন কৃত্রিম উপায়ে বিভিন্ন ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের রসায়নাগারে উৎপন্ন হয়ে বিভিন্ন



১৫ নং চিত্র ॥ বিভিন্ন প্রকার ভিটামিন অভাবজনিত রোগ—
(ক) রিকেট ; (খ) বেরিবেরি ; (গ) স্কার্ভি এবং (ঘ) প্যালেগ্রা।

নামে বাজারে বিক্রি হচ্ছে। খাদ্যে ভিটামিনের অভাব হলে এইসব ভিটামিন খেয়ে দেহের অভাব পূরণ করা যায়। কিন্তু প্রয়োজনের পরিমাণ না জেনে অধিক পরিমাণ ভিটামিন গ্রহণ করলে ক্ষতির সম্ভাবনাই অধিক। অধিক পরিমাণ ভিটামিন D খেলে অস্থি থেকে ক্যালসিয়াম বেরিয়ে অস্থিকে স্পঞ্জের মত সচ্ছিদ্র করে। অধিক পরিমাণ ভিটামিন A গ্রহণ করলে বিষক্রিয়ার ফলে মাথা ধরা, বমি এবং উদরাময় রোগ দেখা দেয়।

সুষম খাদ্য (Balanced Diet)

কোনও একটি খাদ্যবস্তুর মধ্যে দেহের বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ ও শক্তি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি উপযুক্ত পরিমাণে নাও থাকতে পারে। এইজন্য বিভিন্ন খাদ্যবস্তু নির্দিষ্ট পরিমাণে আহার করা উচিত। এই প্রকার খাদ্যকে **মিশ্র খাদ্য** বলে। বয়স, গঠন, আবহাওয়া, স্ত্রী-পুরুষ ভেদে ও কর্মতৎপরতা অনুযায়ী মৌল বিপাকের মাত্রা

বিভিন্ন প্রকার হওয়ায় তাপশক্তির প্রয়োজনও বিভিন্ন। এইজন্য বিভিন্ন ব্যক্তির সুষম খাদ্যের পরিমাণও বিভিন্ন হয়। শীত বা গ্রীষ্ম-প্রধান আবহাওয়ায় শ্রমজীবী বা বুদ্ধিজীবীর খাদ্য এক নয়।

সুষম খাদ্যের সংজ্ঞা : দেহের বৃদ্ধি, পুষ্টি ও সংশ্লেষণ ইত্যাদি বিপাকীয় ক্রিয়ার প্রয়োজনে যে খাদ্যের মধ্যে মুখ্য উপাদানগুলি সুনির্দিষ্ট অনুপাতে বর্তমান তাকেই সুষম খাদ্য বলে।

খাদ্যের মানোন্নয়নের উদ্দেশ্য ও উপায় : আমাদের দেশের বিভিন্ন অংশের মানুষের বিভিন্ন প্রকার খাদ্যাভ্যাসের কারণ এক রকমের খাদ্যবস্তুর অভাব এবং আর্থিক অসঙ্গতি। এইজন্য খাদ্যের পুষ্টিমূল্য নির্ধারণ করে সুষম খাদ্য গ্রহণ করলে অপুষ্টি দূর করা যাবে।

(১) অঙ্কুরোদ্গম ও গাঁজানোর দ্বারা বহু খাদ্যদ্রব্যের পুষ্টিমূল্য বৃদ্ধি হয়। ছোলা ও গমের অঙ্কুরোদ্গম হলে তার মধ্যে প্রোটিনের পরিমাণ বাড়ে ও C ভিটামিন উৎপন্ন হয়। বিউলির ডাল ও চাল একত্রে চূর্ণ করে কয়েকদিন গাঁজালে ভিটামিন B উৎপন্ন হয় এবং এর দ্বারা মাদ্রাজীরা ইডলি ও দোসা নামক খাদ্য প্রস্তুত করে।

(২) কোন ব্যক্তির খাদ্যতালিকায় প্রয়োজনীয় ক্যালোরির শতকরা ৬০-৭০ ভাগ শ্বেতসার, ২০-৩০ ভাগ স্নেহ এবং বাকি ১০-১৫ ভাগ প্রোটিন দ্বারা পূরণ করা উচিত।

(৪) উদ্ভিজ্জ প্রোটিন অপেক্ষা প্রাণীজ প্রোটিন সহজপাচ্য, এজন্য খাদ্যতালিকায় প্রাণীজ প্রোটিন রাখা উচিত। দৈনিক ৭০-১০০ গ্রাম প্রোটিনের মধ্যে তিন ভাগের এক ভাগ প্রাণীজ হলে ভাল হয়।

(৫) উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ স্নেহের মধ্যে প্রাণীজ স্নেহে A, D, E ও K যথেষ্ট পরিমাণে থাকে বলে খাদ্যে কিছু পরিমাণ ঘি ও মাখন রাখতে হবে।

(৬) খাদ্যে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস-ঘটিত লবণ এক গ্রাম ও লৌহ ২০-৪০ মিলি-গ্রাম থাকা উচিত।

(৭) সর্বপ্রকার খাদ্যের মধ্যে ডিম ও দুধের মধ্যে কর্মশক্তিদায়ক ও দেহগঠনকারী উপাদান কিছু পরিমাণ থাকায় আদর্শ শ্রেণীর খাদ্য, এইজন্য খাদ্যে ডিম ও দুধ প্রয়োজন হয়।

সুষম খাদ্যতালিকা ঃ একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি, যার দৈনিক ২৫০০ ক্যালোরি তাপশক্তির প্রয়োজন, নিম্নলিখিত তালিকা অনুযায়ী খাদ্য গ্রহণ করলে তার দেহের শক্তির প্রভাব পূরণ হবে।

খাদ্যদ্রব্য	পরিমাণ	খাদ্যে বিভিন্ন উপাদান ও পুষ্টি মূল্য	পরিমাণ	ক্যালোরি
চাল, আটা (গম বা ভুট্টা)	৪৩০ গ্রাম	শ্বেতসার	৪৪০ গ্রাম	২৫০০
ডাল	৮৫ "	প্রোটিন	৭৫ "	
শাক (পালং, লেটুস ও বাঁধাকপি ইত্যাদি),	১১০ "	স্নেহ	৫০ "	
সবজী (আলু, পটল, কাঁচাকলা ইত্যাদি)	১২৫ "	ক্যালসিয়াম	০.৮ "	
ফল (কলা, আম ইত্যাদি)	৩০ "	ফসফরাস	১.৪ "	
দুগ্ধ	১৭৫ "	লৌহ	৪০ মি. গ্রা.	
মিষ্টি (চিনি, মিছরি ইত্যাদি)	৫৫ "	ভিটামিন A	১৩০০ আন্তর্জাতিক একক	
উদ্ভিজ্জ তেল	৩০ "	ভিটামিন B_1	১.৮ মি.গ্রা	
মাছ বা মাংস	৫০ "	ভিটামিন C	২০০ মি.গ্রা	
ডিম	একটি			

অপুষ্টিজনিত রোগ ঃ খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণে খাদ্যের উপাদান না থাকলে অপুষ্টিজনিত বিভিন্ন উপসর্গ দেখা দেয়।

(ক) **প্রোটিন ও শক্তিদায়ক খাদ্যের অভাবজনিত রোগ ঃ** শিশুর বয়স ১—৩ বৎসরের মধ্যে খাদ্যে প্রোটিন বা শ্বেতসার উপাদানের অভাব হলে বা অধিক শ্বেতসার গ্রহণ করলে শিশুর অপুষ্টি রোগ হয়। (১) অধিক শ্বেতসার খাদ্য গ্রহণের ফলে শিশুর দেহের সুষম বৃদ্ধি হয় না, পেটের রোগে ভোগে, স্বল্পবুদ্ধি এবং খিটখিটে হয়। এই রোগকে **কোয়াশিয়োরকর** (Kwashiorkor) বলে। (২) খাদ্যে শ্বেতসার ও প্রোটিন উপযুক্ত পরিমাণ না থাকলে, বিশেষতঃ যে সকল শিশু মাতৃস্তন্য পায় না তাদের দেহের পেশী ক্ষয় হয় এবং চামড়া কুঁচকিয়ে যায়। এই প্রকার রোগকে **ম্যারাসমাস** (Marasmus) বলে।

(খ) বিভিন্ন ভিটামিন ও খনিজ লবণের অভাবহেতু **রাতকানা** (ভিটামিন A অভাবে), **পেলেগ্রা** ও **রক্তাল্পতা** (ভিটামিন B-সমষ্টি ও লৌহ অভাবে), **স্কার্ভি** (ভিটামিন C অভাবে), **রিকেট** (ভিটামিন D ও ক্যালসিয়াম অভাবে) এবং আয়োডিন অভাবে **গলগণ্ড** হয়।

(গ) গর্ভাবস্থায় মাতার এবং বাল্যকালে শিশুর সুষম খাদ্যের অভাবে ভবিষ্যতে শিশুদের **মস্তিষ্কের বুদ্ধি-বৃত্তির** কেন্দ্র **পরিণত** হয় না। এই সকল শিশু ভবিষ্যতে **জড়বুদ্ধি** এবং **শ্রমবিমুখ** হয়।

জল

উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়েরই জীবনধারণের জন্য জল অত্যাবশ্যক। কারণ খাদ্যাভাবে জীব কয়েকদিন বাঁচলেও জলাভাবে অতি অল্পদিনের মধ্যে মারা যায়। বায়ুর অক্সিজেনের পরই সবচেয়ে আবশ্যকীয় দ্রব্য হচ্ছে জল। প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির দেহের ওজনের শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ এবং ভ্রূণ ও জেলিফিসের শতকরা প্রায় ৯৫ ভাগ জল।

জীবদেহে জলের কার্য : (১) জলের দ্বারা উদ্ভিদের খাদ্যবস্তু ও বিভিন্ন খনিজ পদার্থ দ্রবীভূত হয়ে শোষিত হয়। প্রাণী ও মানুষের খাদ্যবস্তুগুলিও জলের সাহায্যে তরল হয়ে অন্ত্রের বিভিন্ন উৎসেচকের দ্বারা পরিপাকের পর শোষিত হয়। (২) প্রাণী ও উদ্ভিদকোষের প্রধান অংশ জল এবং জলের অভাবে প্রোটোপ্লাজমের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। (৩) দেহের পুষ্টিসাধনের পর বিপাকীয় ক্রিয়ায় কোষে খাদ্যবস্তুগুলি বিভিন্ন বর্জ্য বস্তু উৎপন্ন করে, এর মধ্যে বেশ কয়েকটি জলের মধ্যে দ্রবীভূত হয়ে দেহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়—যথা দেহের ঘর্ম, মূত্র ইত্যাদি। (৪) প্রাণীদেহের বিশেষত মানুষের দেহ ঘর্ম উৎপন্ন দ্বারা এবং ঐ ঘর্ম হাওয়ায় বাষ্পীভূত হয়ে দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। (৫) জল দেহের মধ্যে শ্বাসক্রিয়ায় উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্সাইড দেহের বিভিন্ন কোষ থেকে রক্তে এবং পরে রক্ত থেকে ফুসফুসের মাধ্যমে বহিষ্করণে সাহায্য করে। সুতরাং বাঁচবার জন্য যে কোনও প্রাণী ও উদ্ভিদের নিয়মিত জলের প্রয়োজন। এইজন্য **জলকে জীবের জীবন বলা হয়।**

জলসাম্য নিয়ন্ত্রণ (Water balance) **:** দেহে ক্রমাগত জল সরবরাহ যেমন হচ্ছে সেইরূপ জল ক্ষয়ও হচ্ছে। কিন্তু এই জল সরবরাহ এবং জল ক্ষয়ের ভারসাম্য নির্দিষ্ট মাত্রায় দেহ রক্ষা করছে। এর দ্বারা দেহের মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট যান্ত্রিক ব্যবস্থা আছে তাই প্রমাণ করে।

সাধারণ অবস্থায় প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির প্রাত্যহিক জলের প্রয়োজন প্রায় ২৫০০-৩০০০ সি সি. (২½ – ৩ লিটার), এর মধ্যে ১৫০০ সি.সি. জল পানীয়রূপে গ্রহণ করা উচিত।

প্রাত্যহিক জলসাম্যের হিসাব-নিকাশ

জল সরবরাহ		জল ক্ষয়	
পানীয়রূপে গ্রহণ	১৪৫০ সি সি.	বৃক্কের মাধ্যমে ক্ষয়	১৫০০ সি সি.
খাদ্যের সাথে গ্রহণ	৮০০ সি সি	ত্বকের মাধ্যমে ঘর্মরূপে ক্ষয়	৬০০ সি.সি
জারণ ক্রিয়ায় প্রাপ্ত	৩৫০ সি.সি.	ফুসফুসের দ্বারা ক্ষয়	৪০০ সি.সি.
		মলের দ্বারা ক্ষয়	১০০ সি সি.
	মোট ২৬০০ সি সি.		মোট ২৬০০ সি সি.

উৎসেচক (Enzymes)

একখণ্ড ম্যাগনেসিয়াম তারকে আগুনের সাহায্যে প্রজ্জলিত করলে তাপ উৎপন্ন হয়। গ্লুকোজকে ঘরের স্বাভাবিক তাপমাত্রায় রেখে-দিলে ধীরে ধীরে জারিত হয়ে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জল উৎপন্ন হয় তবে এই প্রক্রিয়ায় অনেক সময় লাগে। কিন্তু গ্লুকোজকে আগুন দ্বারা জালালে দ্রুত জারিত হয়ে প্রচুর তাপ উৎপন্ন করে। জীবিত কোষের মধ্যে এই প্রক্রিয়ায় গ্লুকোজ জালানো যায় না কারণ এতে কোষের মৃত্যু ঘটবে। কোষের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম তাপে জারণ প্রক্রিয়ায় ধীরে ধীরে গ্লুকোজ কার্বন ডাই-অক্সাইড, জল ও তাপ উৎপন্ন করে। কিভাবে এই বিক্রিয়া ঘটে? এই বিক্রিয়া জৈব অনুঘটকের সাহায্যে করা যায় তা জানা গেছে। **জীবকোষের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার জৈবিক ক্রিয়া এই সকল অনুঘটকের উপস্থিতি এবং বিক্রিয়ায় ঘটে। এই সকল অনুঘটককে উৎসেচক** বা **এনজাইম** (Enzyme) বলে।

আমরা যে সকল খাদ্য গ্রহণ করি তার মধ্যে শ্বেতসার, প্রোটিন ও স্নেহ উপাদান থাকে। এই বস্তুগুলি জটিল রাসায়নিক যৌগরূপে থাকে এবং খাদ্যরূপে গ্রহণের পর দেহের পৌষ্টিকনালীর মধ্যে প্রবেশ করে। পৌষ্টিকনালী থেকে এই সকল জটিল যৌগ-গুলির অণু অপেক্ষাকৃত বৃহৎ হওয়ায় দেহে গ্রহণের পক্ষে অনুপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়। বিভিন্ন আন্ত্রিক উৎসেচক এই সকল খাদ্য উপাদানগুলিকে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুতে ভেঙে সরল ও তরল করায় দেহের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হয়। এই প্রকার রাসায়নিক

বিজারণ দ্বারা জটিল যৌগ খাদ্যবস্তুকে সরল অণুতে পরিবর্তন করাকে **পরিপাক** (Digestion) বলে।

উৎসেচকের গঠন :

(১) **সকল উৎসেচক প্রোটিন দ্বারা গঠিত** এজন্য এদের **জৈব-অনুঘটক** বলে।

(২) অনেক উৎসেচকের অণুতে কোন ধাতুর আয়ন বা ভিটামিনের অণু সংযুক্ত থাকতে পারে। এই ধাতুগুলি তাম্র (Cu^{++}), জিঙ্ক (Zn^{++}), কোবাল্ট (Co^{++}) এবং ভিটামিন ইত্যাদি। এই সকল ভিটামিনের অভাবে কয়েক প্রকার উৎসেচক নিষ্ক্রিয় হয়ে নানা প্রকার রোগ সৃষ্টি করে। কিন্তু পরে ভিটামিন গ্রহণ করলে উৎসেচকগুলি সক্রিয় হয়ে রোগ দূর হয়।

(৩) পেপসিন নামক উৎসেচক পাকস্থলীর কোষের মধ্যে পেপসিনোজেনরূপে থাকে এবং নিঃসরণের পর হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের প্রভাবে পেপসিনে পরিণত হয়।

(৪) অগ্ন্যাশয়ের নিষ্ক্রিয় ট্রিপসিনোজেন অন্ত্রের রস এণ্টেরোকাইনেজ (Enterc-kinase) দ্বারা সক্রিয় ট্রিপসিনে পরিণত হয়।

উৎসেচকের কার্য : (১) খাদ্যবস্তুর জটিল অণুকে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র সরল অণুতে পরিবর্তন করতে উৎসেচক **অনুঘটকের** (Catalyst) কাজ করে।

(২) অল্প পরিমাণ উৎসেচক বৃহৎ খাদ্যবস্তুকে পরিবর্তিত করে কিন্তু নিজে অপরিবর্তিত থাকে। এইভাবে একই উৎসেচক **বারবার অনুঘটকের কাজ** চালিয়ে যায়।

(৩) বিভিন্ন উৎসেচকের কাজ ভিন্ন ভিন্নরূপে নির্দিষ্ট। শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য জীর্ণকারী উৎসেচক প্রোটিন খাদ্যবস্তুকে জীর্ণ করে না বা প্রোটিন জীর্ণকারী উৎসেচক স্নেহ বা শ্বেতসার জীর্ণ করে না।

(৪) নির্দিষ্ট উৎসেচক একটি নির্দিষ্ট বস্তুর রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটায়। এই কাজকে একটি বিশেষ তালার জন্য নির্দিষ্ট চাবির সাথে তুলনীয়। এই প্রক্রিয়ায় নির্দিষ্ট বস্তুর অণুর আণবিক গঠনের সঙ্গে পরিপূরক গঠনের উৎসেচক অণুর সংযুক্তি ঘটে এবং ঐ বস্তুর অণুর বাঁধন ভেঙে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুতে বিভক্ত হয়। এই তত্ত্বকে **তালা-চাবি তত্ত্ব** (Lock & Key Theory) বলে।

(৫) উৎসেচক দেহের একটি **নির্দিষ্ট তাপমাত্রায়** (২৫—৪০ সেন্টিগ্রেড) **কাজ করে**। অত্যধিক তাপে নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু কম তাপে ক্ষতি হয় না।

(৬) **পরিবেশের অম্লত্ব বা ক্ষারত্বের উপর এক এক প্রকার উৎসেচক কার্য করে।** পাকস্থলীর অম্লতায় যে উৎসেচকগুলি কাজ করে ক্ষুদ্রান্ত্রের ক্ষারত্বে তারা কার্য করে না।

পরিপাক-সংক্রান্ত উৎসেচক আবিষ্কারের ইতিহাস :

(১) **রেণে রিউমার** (Rene Reaumer, 1683-1757) তাঁর পোষা বাজপাখীকে একটুকরা স্পঞ্জ সুতোয় বেঁধে খেতে দিয়ে পরে সুতো টেনে স্পঞ্জ খণ্ডটিকে বের করে আনতেন পরে স্পঞ্জের মধ্যে শোষিত আন্ত্রিক রস এক টুকরা মাংসের সাথে মিশিয়ে তিনি মাংসটি ক্রমশঃ কোমল ও দ্রবীভূত হয়ে যেতে দেখেছিলেন।

(২) ১৭৭৬ খ্রীস্টাব্দে ইটালিয়ান বিজ্ঞানী **স্প্যালানজনি** (Spallanzani) রেণে রিউমারের কার্য অনুসরণ করে নিজে একটি ছোট খাঁচার মধ্যে স্পঞ্জ রেখে খাঁচাটি গিলে ফেলতেন। পরে খাঁচাটি বের করে স্পঞ্জে শোষিত আন্ত্রিক রস মাংসে মিশ্রিত করলে মাংসকে দ্রবীভূত ও তরল করে লক্ষ্য করেন। তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে, আন্ত্রিক রসই মাংসকে জীর্ণ করে।

(৩) খাদ্যের পরিপাকে আন্ত্রিক রসের কার্য বিষয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে আমেরিকান চিকিৎসা-বিজ্ঞানী **উইলিয়াম বিউমণ্ট** (William Beaumont)-এর অবদান সর্বজনস্বীকৃত। ১৮২২ খ্রীস্টাব্দে **আলেকসিস্ সেণ্ট মার্টিন** (Alexis St. Martin) নামে পাখী শিকারীর পেটে বন্দুকের গুলি লেগে ক্ষত সৃষ্টি হয়। বিউমণ্টের চিকিৎসায় মার্টিন সুস্থ হলেও তার পেটে পাকস্থলী পর্যন্ত একটি চিরস্থায়ী ছিদ্র থেকে যায়। কোনও কিছু খাওয়ার সময় এই ছিদ্র দিয়ে যে রস নির্গত হত তা পরীক্ষা করে **বিউমণ্ট খাদ্য জীর্ণ করায় আন্ত্রিক রসের কার্যকারিতা নির্ধারণ করেন।**

(৪) বিজ্ঞানী কুণে (Kuhne) ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে বিভিন্ন প্রকার জৈব অনুঘটকের **এনজাইমা** (Enzyme) নামকরণ করেন।

(৫) ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে বিখ্যাত রুশ বিজ্ঞানী **আইভান পাভলভ** (Ivan Pavlov) কুকুরের উপর পরীক্ষা দ্বারা কিভাবে আন্ত্রিক রসনিঃসরণ হয় তা আবিষ্কার করেন।

পরিপাকতন্ত্রের বিভিন্ন উৎসেচকের শ্রেণীবিভাগ : উন্নত প্রাণীদের পরিপাকতন্ত্রের মুখগহ্বর থেকে ক্ষুদ্রান্ত্র পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে বহু প্রকার উৎসেচক নিঃসৃত হয় এবং তাদের কার্য অনুযায়ী তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। যথা :

(১) **অ্যামাইলোলাইটিক** (Amylolytic) শ্রেণীর উৎসেচক কেবল মাত্র শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যের উপর ক্রিয়াশীল। উদাহরণ : মুখগহ্বরের মধ্যে লালাগ্রন্থি দ্বারা নিঃসৃত টায়ালিন (Ptyalin), ক্ষুদ্রান্ত্রের মধ্যে ল্যাকটেজ, সুক্রেজ, মল্টেজ ইত্যাদি।

(২) **প্রোটিওলাইটিক** (Proteolytic) শ্রেণীর উৎসেচক আমিষ খাদ্যকে অ্যামাইনো অ্যাসিডে পরিবর্তিত করে। উদাহরণ : পাকস্থলীর পেপসিন ও রেনিন এবং ক্ষুদ্রান্ত্রের ইরেপসিন ও অগ্ন্যাশয়ের ট্রিপসিন ইত্যাদি।

(৩) **লিপোলাইটিক** (Lipolytic) শ্রেণীর উৎসেচক স্নেহ পদার্থ ভেঙে গ্লিসারল ও ফ্যাটি অ্যাসিডে পরিণত করে। উদাহরণ : পাকস্থলীর লাইপেজ ও ক্ষুদ্রান্ত্রের লাইপেজ।

উৎসেচকগুলির উৎপন্ন স্থান এবং বিক্রিয়াজাত বস্তু

উৎপন্নের স্থান	উৎসেচক	খাদ্যবস্তু	পরিবর্তিত বস্তু
মুখগহ্বরের লালা	টায়ালিন	স্টার্চ	মলটোজ
পাকস্থলী	পেপসিন, রেনিন, লাইপেজ	প্রোটিন, দুগ্ধের প্রোটিন, স্নেহ	পলিপেপটাইড, ছানা, গ্লিসারল ও ফ্যাটি অ্যাসিড
অগ্ন্যাশয়	অ্যামাইলেজ, লাইপেজ, ট্রিপসিন	স্টার্চ, স্নেহ, প্রোটিন ও পেপটাইড	মলটোজ, গ্লিসারল ও ফ্যাটি অ্যাসিড পেপটাইড ও অ্যামাইনো অ্যাসিড
ক্ষুদ্রান্ত্র	সুক্রেজ, মলটেজ, লাইপেজ, ইরেপসিন	শর্করা, মলটোজ, স্নেহ পেপটাইড	এক শর্করা (গ্লুকোজ, ফ্রাকটোজ ইত্যাদি), গ্লিসারল ও ফ্যাটি অ্যাসিড, অ্যামাইনো অ্যাসিড

বিভিন্ন প্রাণীর খাদ্যগ্রহণ ও পরিপাক ঃ

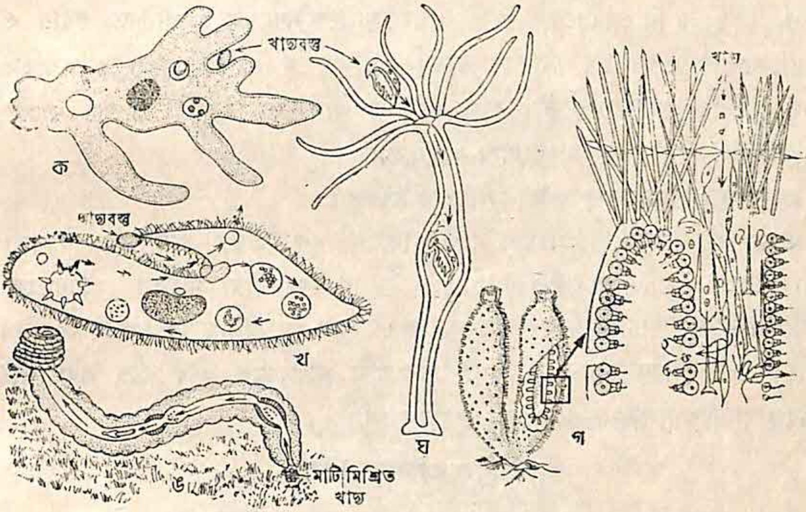
(১) **অ্যামিবা, প্যারামেসিয়াম, ভর্টিসেলা** ইত্যাদি এককোষী প্রাণীদের পৌষ্টিকতন্ত্র না থাকায় তাদের খাদ্যগ্রহণ ভিন্ন প্রকার। অ্যামিবা কোনও খাদ্যবস্তুর চলনে আকৃষ্ট হয়ে, দেহ থেকে দুটি **ক্ষণপদ** বিস্তার করে কিছু জলসহ খাদ্যবস্তুটিকে ঘিরে ফেলে। পরে উভয়দিকের ক্ষণপদ সংযুক্ত হয়ে একটি **খাদ্যগহ্বরের** সৃষ্টি করে। খাদ্যগহ্বরের মধ্যে প্রথমে অ্যাসিড নিঃসরণ করে জীবিত খাদ্যবস্তুটিকে মেরে ফেলে এবং পরে বিভিন্ন উৎসেচকের সাহায্যে খাদ্যের জীর্ণ সারবস্তুটি দেহের পুষ্টিসাধনে গ্রহণ করে। এই প্রকার পরিপাক কোষের অভ্যন্তরে হয় বলে একে **অন্তঃকোষীয় পরিপাক** (Intra-cellular digestion) বলে।

প্যারামেসিয়াম, ভর্টিসেলা ইত্যাদি এককোষী প্রাণীদের সর্বাঙ্গ আণবীক্ষণিক রোম দ্বারা আবৃত। এইসকল রোমের সম্মিলিত সঞ্চালনে জলস্রোতের সঙ্গে বাহিত খাদ্যবস্তুগুলি এদের দেহের বিশেষ একটি চাপা অঞ্চলের মধ্যে প্রবেশ করে খাদ্যগহ্বরের সৃষ্টি করে। পরে অ্যামিবার মত প্রক্রিয়ায় খাদ্যবস্তু জীর্ণ হয়ে দেহের পুষ্টি সাধিত হয়।

(২) **হাইড্রা** (Hydra) নামক একনালীদেহী প্রাণীরা কর্ষিকার সাহায্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলজ প্রাণী ও পোকামাকড় কর্ষিকার সাহায্যে ধরে দেহগহ্বর বা সিলেনটেরনের মধ্যে প্রবেশ করায়। এই দেহগহ্বর পৌষ্টিক নালীর কার্য করে এবং খাদ্যবস্তু দেহগহ্বরে প্রবেশ করার পর কোষ হতে নিঃসৃত উৎসেচকের সাহায্যে জীর্ণ ও দেহে শোষিত হয়ে পুষ্টিসাধন করে। এইপ্রকার পরিপাককে **বহিঃকোষীয় পরিপাক** (Extra-cellular digestion) বলে। হাইড্রার দেহের অভ্যন্তরস্থ সিউডোপোডিয়াল কোষের ক্ষণপদের দ্বারাও খাদ্যগহ্বর উৎপন্ন হয়। খাদ্যগহ্বরের মধ্যে বিভিন্ন উৎসেচকের সাহায্যে খাদ্যবস্তুটি জীর্ণ হয়ে হাইড্রার পুষ্টি সাধন করে। এটি অন্তঃকোষীয় পরিপাক তবে অন্যান্য উন্নত শ্রেণীর প্রাণীদের বহিঃকোষীয় পরিপাক হয়।

(৩) **অঙ্গুরীমাল** (**Annelida**) **পর্বের প্রাণী—কেঁচো** পৌষ্টিকতন্ত্রের মাংসল গলবিল মুখছিদ্র দিয়ে বের করে নরম ভিজা মাটি এবং তার সাথে বিভিন্ন প্রাণী বা লতাপাতার গলিত দেহাবশেষ যা মাটির সাথে মিশেছে, সেই সকল জৈববস্তু খাদ্যরূপে গ্রহণ করে। গলবিলের লালার মধ্যে যে প্রোটিওলাইটিক উৎসেচক থাকে তা খাদ্যের সাথে মেশে এবং খাদ্যবস্তুগুলি গিজার্ডের পেশীর চাপে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণায়

পরিণত হয়। অন্ত্রের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার উৎসেচক খাদ্যের বিভিন্ন উপাদানগুলি জীর্ণ করে এবং অন্ত্রের মাধ্যমে জীর্ণ খাদ্যবস্তুগুলি শোষিত হয়।



১৬নং চিত্র ॥ প্রাণীদের খাদ্য গ্রহণ—(ক) অ্যামিবা, (খ) প্যারামেসিয়াম, (গ) স্পঞ্জ, (ঘ) হাইড্রা এবং কেঁচো।

(৪) **সন্ধিপদযুক্ত প্রাণী**, যথা—**আরশোলা, চিংড়ি** ইত্যাদির মুখ-উপাঙ্গ (Mouth parts) খাদ্যবস্তুকে ধরে ছোট ছোট করে কেটে পেষণ করে এবং মুখ-গহ্বরের মধ্যে প্রবেশ করায়। **মশা, মাছির মুখ-উপাঙ্গগুলি মিলিতভাবে চোষক নলের** আকারে পরিবর্তিত হয়ে খাদ্য গ্রহণ করে।

(৫) বিভিন্ন প্রকার **মেরুদণ্ডী প্রাণীদের** খাদ্যগ্রহণ চোয়ালের ও জিহ্বার সাহায্যে হয়। উন্নততর জীবের খাদ্যগ্রহণ ও পরিপাক পদ্ধতি উন্নত ধরনের এবং জটিল। অনেক পাখীর গ্রাসনালীর একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল থলির আকারে পরিবর্তিত হয় তাকে **ক্রপ** (Crop) বলে এবং এই থলির মধ্যে খাদ্য সঞ্চিত রাখে। খাদ্যবস্তুগুলির সুষম পরিপাকের জন্য পাকস্থলীর পরিবর্তে **প্রোভেনট্রিকিউলাস** (উৎসেচক নিঃসরণ করে) এবং মাংসল পেষণযন্ত্র—**গিজার্ড** (খাদ্যবস্তুর পেষণ করে) থাকে। জীর্ণ খাদ্যবস্তুগুলি দীর্ঘ অন্ত্রের মাধ্যমে দ্রুত শোষিত হয়ে পাখীর উড়বার জন্য যে প্রচুর শক্তির প্রয়োজন হয় তা যোগায়।

স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে গরু, ভেড়া, হরিণ ইত্যাদির পাকস্থলী চারটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত এবং খাদ্যবস্তুগুলি সাময়িকভাবে সেস্থানে সঞ্চিত থাকে। বিশ্রামের সময় গরু, ভেড়া ইত্যাদি সেই খাদ্যবস্তুগুলি পুনরায় মুখের মধ্যে এনে **রোমন্থন** করে। এইসব প্রাণীর পাকস্থলীর বিভিন্ন প্রকোষ্ঠ থেকে খাদ্যবস্তুগুলিকে নরম মণ্ডে পরিণত করার ও পরিপাকের জন্য তরল রস নিঃসরণ করে। এই সকল প্রাণীদের বৃহদন্ত্রে অবস্থিত বিভিন্ন **সেলুলোজ ভঙ্গকারী ব্যাকটিরিয়া** ঘাস ও বিচালী জাতীয় খাদ্যের সেলুলোজকে সরলীকৃত ও গ্রহণযোগ্য করে তোলে।

মানুষের পাচনতন্ত্র ও পরিপাকের বর্ণনা ঃ

উন্নত শ্রেণীর স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে আমরা সর্বভুক, এজন্য আমাদের পাচনতন্ত্র অত্যন্ত উন্নত। পাচনতন্ত্র পৌষ্টিকনালী এবং পরিপাকযন্ত্র দ্বারা গঠিত। পাচনতন্ত্রের পৌষ্টিকনালী মুখগহ্বর থেকে শুরু হয়ে পায়ুতে শেষ হয় এবং ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৩ ফুট। পৌষ্টিকনালীর বিভিন্ন স্থানে উৎপন্ন উৎসেচকগুলি খাদ্যবস্তুকে জীর্ণ করে এবং জীর্ণ খাদ্যবস্তু পৌষ্টিকনালীর মাধ্যমে দেহে শোষিত হয়।

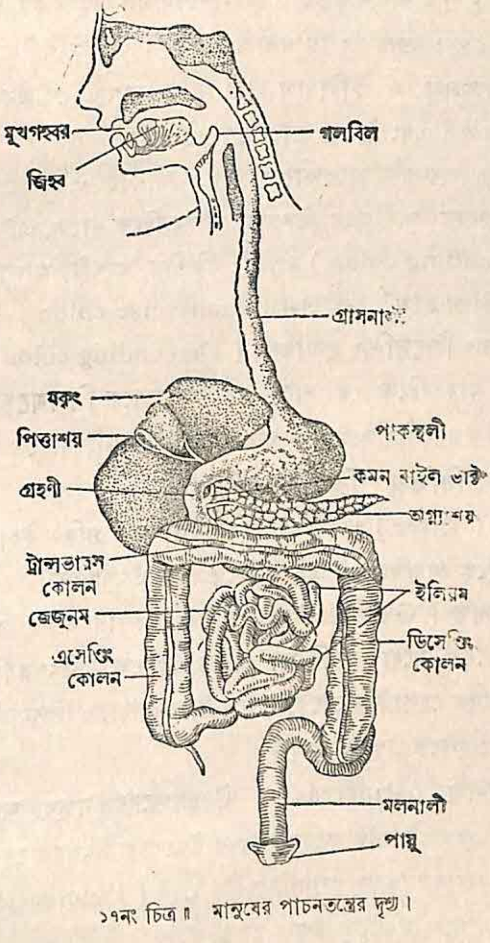
পৌষ্টিকনালীর বর্ণনা

(ক) **মুখগহ্বর ঃ** মুখছিদ্রের অভ্যন্তরে মুখগহ্বরের উপরে এবং নিচে চোয়াল আছে এবং উপরের চোয়াল করোটির সাথে সংযুক্ত থাকায় স্থির তবে নিচের চোয়াল নড়াচড়া করতে পারে। উভয় চোয়ালে মোট বত্রিশটি দাঁত আছে, প্রতিটি দাঁত মাড়ির মধ্যে বসানো এবং প্রতি চোয়ালের উভয় দিকে ষোলটি করে দাঁত থাকে। দাঁতগুলি কার্য, আকার ও গঠন অনুযায়ী চার প্রকারের হয়। উভয় চোয়ালের সামনের এক অর্ধে দু'টি করে **কৃন্তক** (Incisor), পরে একটি করে **ছেদক** (Canine), তার পরে দুটি করে **পুরঃপেষক** (Premolar) এবং সর্বশেষে তিনটি করে **পেষক** (Molar) দাঁত থাকে। চোয়ালের অপর অর্ধেও একই প্রকারে দাঁতগুলি অবস্থিত। মুখগহ্বরের মধ্যে তিন জোড়া লালাগ্রন্থি থেকে লালা নিঃসরণ হয়। মুখগহ্বরের তলদেশে মাংসপেশীবহুল জিহ্বা এবং জিহ্বার দ্বারা খাদ্যের স্বাদ বুঝবার জন্য কতকগুলি **স্বাদকোরক** বা **টেস্টবাড** (Taste bud) আছে। মুখগহ্বরের পশ্চাৎ অংশে গলবিল এবং গ্রাসনালী থাকে।

(খ) **গলবিল ঃ** মুখগহ্বরের পশ্চাৎ দিকের ক্রমশঃ সরু অংশকে গলবিল বলে এবং এই অংশের উপরের দিকে অন্তর্নাসিকা ছিদ্র থাকে। নিচে শ্বাসনালীর ছিদ্র গ্লটিস এবং দুই পাশে দুটি টনসিল থাকে।

(গ) **গ্রাসনালী ঃ** গলবিলের পশ্চাৎ অংশ থেকে দীর্ঘ নলাকার গ্রাসনালী

পাকস্থলীতে উন্মুক্ত হয়। গ্রাসনালী ও পাকস্থলীর সংযুক্ত অঞ্চলে অবস্থিত কপাটিকায় খাদ্য প্রবেশ করলে পাকস্থলী থেকে বেরোতে দেয় না।



১৭নং চিত্র। মানুষের পাচনতন্ত্রের দৃশ্য।

(ঘ) **পাকস্থলী :** পৌষ্টিকনালীর এই অংশটি বেশ প্রশস্ত এবং তিনটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশটি গ্রাসনালী যে স্থানে পাকস্থলীর সাথে মেশে তাকে ফাণ্ডাস (Fundus), মধ্য অংশকে হার্দ (Cardiac) অঞ্চল এবং পশ্চাৎভাগ বা গ্রহণীতে উন্মুক্ত, সেই অংশকে পাইলোরিক (Pyloric) অংশ বলে। পাইলোরিক অংশ ও গ্রহণীর মধ্যে পাইলোরিক কপাটিকা থাকায় অংশতঃ জীর্ণ খাদ্যের গমন নিয়ন্ত্রিত হয়।

(ঙ) **ক্ষুদ্রান্ত্র :** এই অঞ্চলটি পৌষ্টিকনালীর সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ অংশ। ক্ষুদ্রান্ত্র

পাকস্থলীর পশ্চাৎ অংশ থেকে নির্গত হয়ে বৃহদন্ত্রে উন্মুক্ত হয়। ক্ষুদ্রান্ত্র তিনটি অংশে বিভক্ত। যথা—(১) গ্রহণী, (২) জেজুনম এবং (৩) ইলিয়ম।

(১) **গ্রহণী** ঃ এই অংশে যকৃৎ ও অগ্ন্যাশয়ের নল উন্মুক্ত হয় এবং এদের মধ্য দিয়ে পিত্ত ও অগ্ন্যাশয়ের পাচকরস গ্রহণীর অভ্যন্তরে পড়ে। এই অংশটি প্রায় বার ইঞ্চি দীর্ঘ।

(২, ৩) **জেজুনম্ ও ইলিয়ম** দ্বারা গঠিত অংশটি পৌষ্টিকনালীতে সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ কুণ্ডলাকার অঞ্চল এবং দৈর্ঘ্যে প্রায় বিশ ফুট হয়।

(চ) **বৃহদন্ত্র** অঞ্চলটি অপেক্ষাকৃত স্থূল, নলাকার এব‚ কয়েকটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশটি দেহের অভ্যন্তরে উদরের দক্ষিণ দিকে থাকে, এই অংশকে **এসেণ্ডিং কোলন** (Ascending colon) বলে। দ্বিতীয় অংশটি আড়াআড়িভাবে উদরের সম্মুখে বিস্তৃত—**ট্রান্সভার্স কোলন** (Transverse colon) এবং তৃতীয় অংশটি উদরের বামে বিস্তৃত **ডিসেণ্ডিং কোলন** (Descending colon) বলে। ডিসেণ্ডিং কোলন উদরের বাম দিকে যে স্থানে যুক্ত হয় তাকে **সিগময়েড ফ্লেক্সার** বলে। সিগময়েড ফ্লেক্সার মলনালীর সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং মলনালী পায়ুতে সমাপ্ত হয়।

পাচনতন্ত্রের বিভিন্ন পরিপাক গ্রন্থি ঃ

(ক) **যকৃৎ** (Liver) ঃ দেহের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ গ্রন্থি - ইহা উদরগহ্বরের সম্মুখ অঞ্চলের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। এই গ্রন্থিতে পিত্ত উৎপন্ন হয়।

(খ) **পিত্তাশয়** (Gall bladder) ঃ গোলাকার থলির আকারের পিত্তাশয় যকৃতের উভয় খণ্ডের মধ্যে অবস্থিত। পিত্তাশয় থেকে উৎপন্ন পিত্তাশয়ের নালী বা সিসটিক ডাক্ট যকৃতের হেপাটিক ডাক্টের সাথে মিলে সাধারণ পিত্তনালী বা কমন বাইল ডাক্ট তৈরী করে গ্রহণীতে উন্মুক্ত হয়।

(গ) **অগ্ন্যাশয়** (Pancreas) ঃ উদরগহ্বরের সম্মুখ অঞ্চলের বাম দিকে অগ্ন্যাশয় অবস্থিত এবং এই গ্রন্থি কয়েক প্রকার উৎসেচক উৎপন্ন করে খাদ্যদ্রব্য পরিপাকে সাহায্য করে। অগ্ন্যাশয় থেকে প্যানক্রিয়েটিক ডাক্ট (Pancreatic ·duct) বিভিন্ন উৎসেচক নিয়ে অবশেষে গ্রহণীতে উন্মুক্ত হয়।

খাদ্যের পরিপাক ঃ খাদ্যের উপাদানগুলি পৌষ্টিকনালীর বিভিন্ন অংশে কিভাবে পরিপাক হয় তার বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হল ঃ

(ক) **মুখগহ্বর** ঃ খাদ্যদ্রব্য মুখের মধ্যে প্রবেশ করার পর দাঁতের সাহায্যে ছোট ছোট অংশে বিভক্ত হয়ে পেষক দাঁতের সাহায্যে চর্বণ ও পেষণের ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকায় বিভক্ত হয়। পেষণের ফলে খাদ্যদ্রব্য কণিকায় পরিণত হওয়ায় সহজেই গলাধঃকরণের উপযোগী হয়ে ওঠে এবং বিভিন্ন প্রকার উৎসেচকের দ্বারা রাসায়নিক

বিক্রিয়ায় খাদ্য আরও সরল হয়। খাদ্যদ্রব্য মুখগহ্বরে পৌছানর পর বিভিন্ন লালাগ্রন্থির লালা নিঃসরণে খাদ্য ভিজে যায় এবং চর্বণের পক্ষে সুবিধা হয়। লালাগ্রন্থির লালায় **টায়ালিন** (Ptyalin) নামক একপ্রকার অ্যামাইলোলাইটিক উৎসেচক আছে—ইহা খাদ্যের শ্বেতসার জাতীয় অংশকে **মল্টোজে** পরিণত করে। এজন্য ভাত, রুটি কিছুক্ষণ চিবালে মিষ্টি লাগে।

(খ) **পাকস্থলী :** পাকস্থলীর আভ্যন্তরিক কোষপ্রাচীরের মধ্যে অনেক গ্রন্থি আছে, এই গ্রন্থিগুলি থেকে **হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড** এবং বিভিন্ন উৎসেচক যথা—**পেপসিন, রেনিন ও লাইপেজ** ইত্যাদি নিঃসৃত হয়। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড চর্বিত খাদ্যবস্তুকে অম্লাক্ত করলে বিভিন্ন প্রকার পাকস্থলীর উৎসেচক রাসায়নিক বিক্রিয়া করতে পারে। খাদ্যের মধ্যে দুধ থাকলে রেনিন তাকে ছানায় পরিণত করে এবং পেপসিন খাদ্যের প্রোটিন ও ছানাকে পেপটাইড ও পেপটোনে পরিণত করে। বয়স্ক অপেক্ষা শিশুদের পাকস্থলীতে রেনিন বেশী থাকায় শিশুরা দুধ খেলে দুধ জমে সহজে পরিপাক হয়। শিশুদের পাকস্থলীতে রেনিন উৎপাদনের পরিমাণ বেশী এজন্য শিশুরা দুধ খাবার পর বমি করলে দুধ জমে গেছে দেখা যায়। পেপসিন খাদ্যের প্রোটিন অংশকে অংশতঃ জীর্ণ পেপটাইডে পরিণত করে। লাইপেজ খাদ্যের মধ্যে স্নেহ জাতীয় পদার্থকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে **অবদ্রব** বা **ইমালসনে** (Emulsion) পরিণত করে। পাকস্থলীর উৎসেচকের নিঃসরণ নার্ভের উদ্দীপনায় ২৫% এবং পাকস্থলীর **গ্যাস্ট্রীন** (Gastrin) নামক হরমোন দ্বারা ৭৫% হয়।

(গ) **গ্রহণী :** অর্ধজীর্ণ খাদ্যবস্তু থেকে পাইলোরিক কপাটিকা মাঝে মাঝে উন্মুক্ত হয়ে কিছু পরিমাণ খাদ্য গ্রহণীতে প্রবেশ করায়। খাদ্য গ্রহণীতে প্রবেশ করার পূর্বে পিত্ত ও **অগ্ন্যাশয়ের রস** নিঃসরণ শুরু হলেও খাদ্য প্রবেশ করা মাত্র নিঃসরণের পরিমাণ বেড়ে যায়। অগ্ন্যাশয়ের রসে **ট্রিপসিন, অ্যামাইলেজ ও লাইপেজ** নামক তিনটি উৎসেচক আছে। পিত্ত অত্যন্ত ক্ষারীয় গুণসম্পন্ন হওয়ায় পাকস্থলীর অম্লাক্ত খাদ্যকে ক্ষারীয় অবস্থায় পরিবর্তিত এবং স্নেহ জাতীয় খাদ্যকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় বিভক্ত করে। এই অবস্থায় লাইপেজ নামক উৎসেচক স্নেহ জাতীয় খাদ্যকে সহজে রাসায়নিক বিক্রিয়া দ্বারা **গ্লিসারল** ও **ফ্যাটি অ্যাসিডে** পরিণত করে। ট্রিপসিন প্রোটিন ও পেপটাইডকে **অ্যামাইনো অ্যাসিডে** এবং অ্যামাইলেজ শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যকে **মল্টোজে** পরিণত করে। অংশতঃ জীর্ণ খাদ্য গ্রহণীতে প্রবেশ করলে গ্রহণীর আভ্যন্তরিক আস্তরণের বিভিন্ন কোষ **সিক্রেটিন** (Secretin), **প্যানক্রিয়োজাইমিন** (Pancreozymin) এবং **কোলেসিস্টোকাইনিন** (Cholecysto-

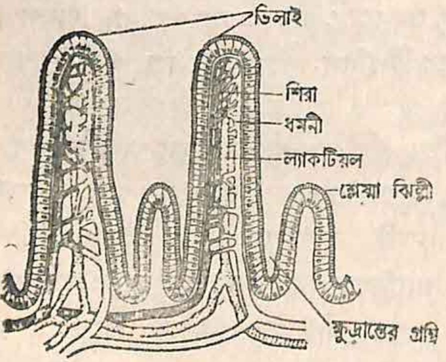
kinin) নামক হরমোন উৎপন্ন করে। এই হরমোনগুলি রক্তবাহিত হয়ে প্রথম দুটি হরমোন অগ্ন্যাশয়ের উত্তেজনা দ্বারা পাচকরস এবং তৃতীয়টি পিত্ত থলির সংকোচন ঘটিয়ে পিত্ত নিঃসরণ করে।

(ঘ) **ক্ষুদ্রান্ত্র :** অন্ননালীর এই অংশের অভ্যন্তরের প্রাচীরে গ্রন্থি থেকে প্রচুর **আন্ত্রিক রস** (Succus entericus) নিঃসরণ হওয়ায় অবশিষ্ট অজীর্ণ খাদ্যের পরিপাক সম্পূর্ণ হয়। **ইরেপসিন** নামক উৎসেচক অবশিষ্ট প্রোটিন ও পেপটাইডকে **অ্যামাইনো অ্যাসিডে** এবং লাইপেজ স্নেহকে **ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারলে** বিভক্ত করে। বিভিন্ন প্রকার অ্যামাইলোলাইটিক উৎসেচক, যথা—**ইনভারটেজ, মলটেজ, সুক্রেজ ও ল্যাকটেজ** ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যকে **গ্লুকোজ, গ্যালাক্টোজ** ইত্যাদি সরল শর্করায় পরিণত করে।

(ঙ) **বৃহদন্ত্র :** এই অংশে জীর্ণ খাদ্যের মধ্য থেকে জল ও কিছু পরিমাণ লবণ শোষিত হয়। কোন কারণে বৃহদন্ত্র উত্তেজিত হয়ে জল শোষণ না করলে, জল তরল অবস্থায় পায়ু থেকে নির্গত হয়। এই অবস্থাকে **উদরাময়** বলে।

(চ) **মলনালী :** জলশোষণের পর মল মলনালীতে সাময়িক জমা থাকার পর পায়ু থেকে নির্গত হয়।

জীর্ণ খাদ্যাংশগুলির শোষণ : খাদ্যের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে পাকস্থলীতে কোন একটিও সম্পূর্ণরূপে জীর্ণ হয় না বলে শ্বেতসার, প্রোটিন বা স্নেহজাতীয় খাদ্য এখানে শোষিত হয় না। কিন্তু খাদ্যের যে উপাদানগুলি পরিপাকের প্রয়োজন হয় না, যথা—জল, গ্লুকোজ ও ভিটামিন প্রভৃতি কিছু পরিমাণে পাকস্থলীতে শোষিত হয়। শ্বেতসার, প্রোটিন ও স্নেহজাতীয় খাদ্য পাকস্থলী ও ক্ষুদ্রান্ত্রে জীর্ণ হয়ে যথাক্রমে **সরল শর্করা, অ্যামাইনো অ্যাসিড, ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারলে** পরিণত হয়। এই সকল জীর্ণ খাদ্যাংশগুলি রক্তের মধ্যে শোষণের প্রধান স্থান হচ্ছে ক্ষুদ্রান্ত্র। ক্ষুদ্রান্ত্রের অভ্যন্তরের প্রাচীর থেকে বহু আঙুলের মত অতি ক্ষুদ্র **ভিলাই** (Villi) এবং প্রতি ভিলাইয়ের অভ্যন্তরে প্রচুর কৈশিক নালী এবং একটি লসিকানালী বা ল্যাকটিয়েল (Lacteal vessel) থাকে। ভিলাইগুলির এককোষী



১৮নং চিত্র। ক্ষুদ্রান্ত্রের অভ্যন্তরে ভিলাইয়ের দৃশ্য

আস্তরণের মধ্য দিয়ে অ্যামাইনো অ্যাসিড ও সরল শর্করা, যথা—গ্লুকোজ, ফ্রাকটোজ ইত্যাদি কৈশিক নালীর অভ্যন্তরে রক্তের মাধ্যমে এবং স্নেহপদার্থের জীর্ণ অংশ ল্যাকটিয়েলের মধ্যে লসিকা দ্বারা শোষিত হয়। ল্যাকটিয়েলগুলি লসিকায়ণীতন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে স্নেহ পদার্থগুলি লসিকায়ণীতন্ত্রের মাধ্যমে দেহে বাহিত হয়।

পাকস্থলী এবং ক্ষুদ্রান্ত্র জারকরসে পাচিত হয় না :

স্টার্চ, প্রোটিন এবং স্নেহ ইত্যাদি খাদ্যবস্তু পাকস্থলী বা ক্ষুদ্রান্ত্রের জারক রসে পাচিত হলেও পৌষ্টিকনালীর কোনও অংশই জীর্ণ হয় না, কারণ খাদ্যবস্তু অন্ত্রের মধ্যে উপস্থিত হওয়ার পর জারক রসের নিঃসরণ হয়। অন্য একটি বিশেষ কারণ হচ্ছে—পাকস্থলী বা ক্ষুদ্রান্ত্রের অভ্যন্তরে শ্লেষ্মঝিল্লী নিঃসৃত শ্লেষ্মা (mucus) জারক রস ও কোষের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে। ফলে জারকরস পাকস্থলী বা ক্ষুদ্রান্ত্রকে জীর্ণ করতে পারে না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ | সংবহন ও রক্ত (Circulation and blood)

সংবহন (Circulation)

প্রতিটি সজীব কোষের বৃদ্ধি বা জীবিত থাকার জন্য সদাসর্বদা শক্তি ক্ষয় হয়। এই শক্তি পূরণ করার জন্য প্রতি কোষে প্রয়োজনীয় খাদ্য এবং অক্সিজেনের সরবরাহ দরকার। কোষের মধ্যে বিপাক ক্রিয়ায় যে সব বর্জ্য পদার্থ উৎপন্ন হয় সেগুলিও কোষ থেকে পরিবাহিত হওয়ার ব্যবস্থা না থাকলে ঐ সকল বর্জ্য পদার্থের বিষক্রিয়ায় কোষের ক্ষতি এবং জীবের মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

বিভিন্ন প্রকার নিম্নশ্রেণীর **ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককোষী বা বহুকোষী জীবের** কোষগুলি পরিবেশের মধ্যে অনাবৃত অবস্থায় থাকায় সহজেই **ব্যাপন ক্রিয়া** (Diffusion) দ্বারা পুষ্টিসাধন এবং অক্সিজেন সহযোগে খাদ্য জারণের ফলে শক্তি উৎপাদন করতে পারে। একইভাবে কোষগুলির মধ্যে উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্সাইড, অ্যামোনিয়া এবং অন্যান্য বর্জ্য পদার্থগুলি পরিবেশের মধ্যে সহজেই পরিত্যক্ত হয়।

উচ্চতর জীব - যাদের দেহের গঠন অত্যন্ত জটিল এবং দেহের অতি সামান্য সংখ্যক কোষ পরিবেশের মধ্যে অনাবৃত থাকে তাদের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র জীবের মতো ব্যাপন ক্রিয়ার দ্বারা খাদ্য ও অক্সিজেন গ্রহণ বা রেচন ক্রিয়ায় উৎপন্ন বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন সম্ভব হয় না। কারণ দেহের অভ্যন্তরে বিভিন্ন কলায় দ্রুত জীবনরক্ষক পদার্থ সংবহন বা দূষিত পদার্থ বর্জন সম্ভব নয়।

উন্নত জীবের জটিল জৈবিক ক্রিয়ার জন্য, বিভিন্ন অত্যাবশ্যকীয় জীবনরক্ষক বস্তুগুলি সরবরাহের সুষ্ঠু ব্যবস্থার প্রয়োজনে ব্যাপক **সংবহনতন্ত্র** গঠিত হয়। উন্নত শ্রেণীর প্রাণীদের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থায় দেহস্থ প্রাণরক্ষক তরল বস্তু বা রক্ত সংবহনের জন্য পাম্প-করার যন্ত্র (হৃদয়) ও বহু আবদ্ধ নল (ধমনী ও শিরা) এবং বহুভাগে বিভক্ত নালিকার উদ্ভব হয়। নালিকাগুলি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত হয়ে দেহের প্রতিটি কোষে উপস্থিত হয়। উন্নত শ্রেণীর উদ্ভিদের ক্ষেত্রে সংবহন প্রাণীদের মত নলের (জাইলেম ও ফ্লোয়েম) সাহায্যে জল ও জলে দ্রব তরল খাদ্যবস্তু উদ্ভিদের দেহের বিভিন্ন স্থানে পৌছায়।

সুতরাং জীবদেহের অভ্যন্তরে বিভিন্ন খাদ্যবস্তু, অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড ও বিপাকীয় ক্রিয়ায় উৎপন্ন বস্তুর পরিবহনকে **সংবহন** (Circulation) বলে।

নিম্নশ্রেণীর এককোষী বা বহুকোষী জীবের সংবহনঃ বিভিন্ন প্রকার এককোষী উদ্ভিদ, যথা—ক্ল্যামাইডোমোনাস, ভলভক্স, স্পাইরোগিরা এবং প্রাণী, যথা—**অ্যামিবা, ইউগ্লিনা** ও **প্যারামেসিয়াম** ইত্যাদি জলের মধ্যে দ্রবীভূত অক্সিজেন, খনিজ পদার্থ ও বিভিন্ন প্রকার জৈব বস্তু **ব্যাপনক্রিয়ার** (Diffusion) মাধ্যমে গ্রহণ করে। বিপাকীয় ক্রিয়ায় দেহের মধ্যে উদ্ভূত রেচন পদার্থ একই উপায়ে জলে পরিত্যক্ত হয়।

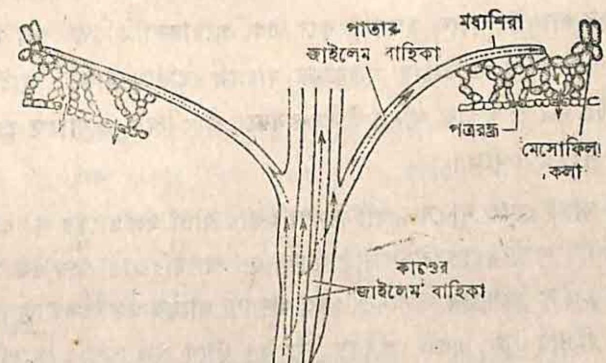
উদ্ভিদ দেহে সংবহনতন্ত্র

উদ্ভিদের জীবন ধারণের জন্য অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড, জল এবং খনিজ লবণ ইত্যাদির প্রয়োজন হয়, অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড উদ্ভিদ দেহে **লেনটিসেল** (কাণ্ডের ত্বকে উৎপন্ন ছিদ্র) ও **পত্ররন্ধ্রের** মাধ্যমে পত্রের মধ্যে প্রবেশ করে। জল ও জলে দ্রবীভূত অবস্থায় খনিজ লবণ এবং অক্সিজেন মূলরোমের মাধ্যমে ব্যাপন ক্রিয়ায় উদ্ভিদের মূলে প্রবেশ করে। পত্ররন্ধ্র এবং কাণ্ডের গাত্রের লেনটিসেল দিয়ে অক্সিজেন বা কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রবেশের পরে **কোষ-অন্তর্বর্তী**

স্থানের মাধ্যমে বিভিন্ন অঙ্গে পরিবাহিত হয়। মূলরোমের দ্বারা গৃহীত জল ও জলে দ্রবীভূত বিভিন্ন খনিজ মূল ও কাণ্ডের মধ্য দিয়ে অবশেষে পাতায় উপস্থিত হয়। পাতায় খাদ্য প্রস্তুত হওয়ার পর আবার দেহের বিভিন্ন অংশে এমনকি দূরবর্তী মূল অঞ্চলেও খাদ্য সরবরাহ হয়।

উদ্ভিদ দেহে জল ও বিভিন্ন বস্তুর সংবহন ঃ উদ্ভিদের মূলরোমের সাহায্যে এবং **অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায়** (Osmosis) মাটি থেকে জল এবং জলে দ্রব বিভিন্ন খনিজ বস্তু গ্রহণ করে মূলের অভ্যন্তরে নালিকা বাণ্ডিলে (Vascular bundle) প্রেরণ করে। নালিকা বাণ্ডিলের মধ্যে জাইলেম ও ফ্লোয়েম নামক দুই প্রকারের কলা থাকে।

(১) **মূলরোম দ্বারা জল গ্রহণ ঃ** প্রধান মূল বা শাখামূলের অগ্রবর্তী অঞ্চলে বহু সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম এককোষী মূলরোম থাকে। মূলরোম ত্বকের আঠালো পদার্থের দ্বারা মাটির কণার সাথে সংযুক্ত থাকায় মাটি কণার সঙ্গে যুক্ত পাতলা জলস্তরের সঙ্গে



১৯নং চিত্র॥ উদ্ভিদদেহে মূলরোম দ্বারা মাটির জলশোষণ ও জাইলেমবাহিকার মাধ্যমে সংবহনের চিত্র।

মূলরোম সংযুক্ত হয়। ব্যাপনক্রিয়ায় মূলরোম জল ও জলে দ্রব খনিজ গ্রহণ করার পর পরবর্তী কোষ থেকে কোষান্তরে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় যেতে যেতে অবশেষে নালিকা

বাণ্ডিলের জাইলেমবাহিকায় প্রবেশ করে। মূলরোম দ্বারা গৃহীত ও জাইলেম দ্বারা বাহিত জলকে **উদ্ভিদ রস** (Plant sap) বলে।

(২) **উধ্বর্মুখী সংবহনে জাইলেমবাহিকার দ্বারা পাতায় জল ও খনিজ পরিবহন ঃ** নালিকা বাণ্ডিলের জাইলেম (Xylem) কলার কোষগুলি স্তম্ভাকার এবং প্রাচীর সেলুলোজ ও লিগনিন নামক জৈব বস্তুর দ্বারা গঠিত হওয়ায় বেশ পুরু। পর পর সাজানো স্তম্ভাকার কোষগুলির মধ্যবর্তী প্রাচীর দ্রবীভূত এবং কোষ মধ্যস্থ সাইটোপ্লাজমের মৃত্যু হওয়ায় জাইলেমবাহিকা অবিচ্ছিন্ন ও দীর্ঘ নলাকার হয়। মাটি থেকে জল ও জলে দ্রব খনিজ ইত্যাদি মূলের মধ্যস্থ জাইলেমবাহিকার সাহায্যে কাণ্ডের জাইলেমবাহিকায় প্রবেশ করে এবং অবশেষে পাতার জাইলেমবাহিকায় বাহিত হয়ে খাদ্য উৎপাদনে সাহায্য করে। পাতার শিরাত্মক কলাসমষ্টির মধ্যেও জাইলেমবাহিকা থাকায় উদ্ভিদ রস জাইলেমবাহিকা থেকে পাতার স্পঞ্জি ও প্যালাইসেড প্যারেনকাইমা কলার কোষের মধ্যে প্রবেশ করে। এই স্থানে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় জল খাদ্য উৎপাদনে সাহায্য করে এবং প্রয়োজনাতিরিক্ত জল **বাষ্পমোচন** (Transpiration) প্রক্রিয়ায় পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে বেরিয়ে যায়। জাইলেমবাহিকার মাধ্যমে মাটির জল ও অন্যান্য খনিজ উদ্ভিদ-রসরূপে উধ্বর্দিকে প্রবাহিত হয় বলে একে **উধ্বর্মুখী সংবহন** বলে।

যত বড় গাছই হোক না কেন জাইলেমবাহিকার দ্বারা জল গাছের অগ্রবর্তী অঞ্চলেও উঠতে পারে। অস্ট্রেলিয়ার ইউক্যালিপটাস বা আমেরিকার রেড উড নামক সুউচ্চ (প্রায় ১৪০ মিটার) গাছের শীর্ষদেশে জল অন্যান্য গাছের মত একই উপায়ে সংবহিত হয়। ১৪০ মিটার উচ্চ একটি গাছের কাণ্ডের শীর্ষে জল তুলতে যে পরিমাণ চাপের প্রয়োজন তা প্রায় প্রতি সেন্টিমিটারে ১৫ কেজির মত এবং যে গতিতে এই জল উঠতে থাকে তা অবিশ্বাস্য মনে হয়। কোনও কোনও গাছে ঘণ্টায় ৪৫ মাইল বেগে জল উপরে উঠতে থাকে এবং মরুভূমি অঞ্চলের শুষ্কতা ও তাপের ফলে জলের অভাব মেটাতে কোনও কোনও উদ্ভিদে ৩৭০ লিটারের মত জল সংবহিত হয়।

(৩) **নিম্নমুখী সংবহনে ফ্লোয়েম কলার দ্বারা পাতায় উৎপন্ন খাদ্য পরিবহন ঃ** ফ্লোয়েম কলার মধ্যে সীভনল বা সীভ টিউব (Sieve tube) নামক কোষই খাদ্য পরিবহনে প্রধান অংশ গ্রহণ করে। সীভ নলের কোষগুলিও স্তম্ভাকার এবং পরপর সাজানো। কিন্তু জাইলেমের মত ফ্লোয়েম কলা মৃত নয়। এদের দুটি কোষের মধ্যবর্তী প্রাচীর বা **সীভপ্লেট** (Sieve plate) দ্রবীভূত না হয়ে ছিদ্রযুক্ত

হয়। এই ছিদ্রের মাধ্যমে এক কোষের সাইটোপ্লাজমের সাথে অপর কোষের সাইটোপ্লাজম সংযুক্ত হয় এবং বাকী অংশ ফাঁপা থাকে। জাইলেমের ন্যায় সীভনল পরপর যুক্ত হয়ে অবিচ্ছিন্ন বাহিকার সৃষ্টি করে। পাতায় জাইলেমবাহিকার মাধ্যমে বাহিত জল, খনিজ পদার্থ ও বায়ুর কার্বন ডাই-অক্সাইড দ্বারা খাদ্য উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন খাদ্য তরল অবস্থায় ফ্লোয়েম কলার দ্বারা উদ্ভিদদেহের বিভিন্ন অংশে বাহিত হয়ে পুষ্টি সাধন করে। পাতা থেকে কাণ্ডের মাধ্যমে মূলের দিকে তরল খাদ্যের পরিবহনকে **নিম্নমুখী সংবহন** বলে।

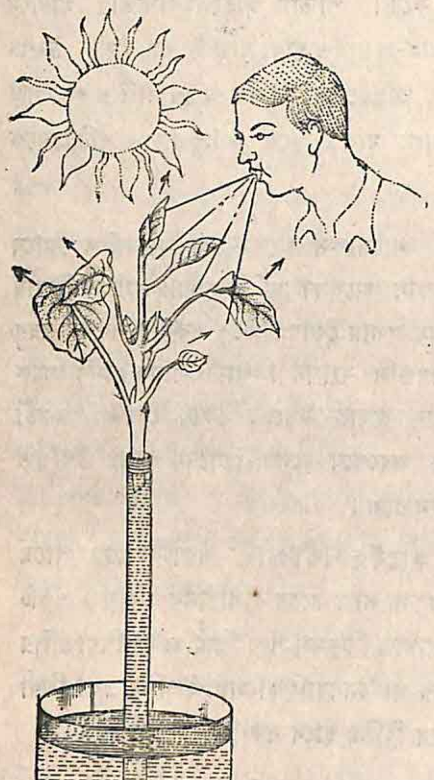
নিম্নমুখী সংবহন কিরূপে হয়ঃ সালোকসংশ্লেষে উৎপন্ন মেসোফিল কোষে শর্করার ঘনত্ব নিকটবর্তী ফ্লোয়েম কলার কোষ অপেক্ষা অধিক হওয়ায় ব্যাপন ক্রিয়ায় ফ্লোয়েমে শর্করা বাহিত হয়। ফলে ফ্লোয়েম কলার কোষগুলিতে শর্করার ঘনত্ব নিম্নের কোষ অপেক্ষা অধিক হয়। নিম্নের কোষগুলি ব্যাপন ক্রিয়ায় উপরের কোষ থেকে শর্করা শোষণ করে। পর্যায়ক্রমে ফ্লোয়েম কলার উপরের কোষ থেকে পরবর্তী কোষ স্তরগুলিতে শর্করা বাহিত হতে হতে অবশেষে মূলের ফ্লোয়েম কলায় উপস্থিত হয়। এই প্রকার সংবহনকে নিম্নমুখী সংবহন বলে।

জল সংবহনে জাইলেমবাহিকার কার্যের পরীক্ষাঃ একটি কাঁচের পাত্রে কিছু পরিমাণ **ইওসিন** দ্রবণে (এক প্রকার লাল রঙের রাসায়নিক পদার্থ) একটি বোঁটাসহ আম পাতার বোঁটাটি ডুবিয়ে রাখলে কিছুক্ষণ পরে শিরা ও উপশিরাগুলির রঙ লাল হয়েছে দেখা যায়। কারণ বোঁটার জাইলেমবাহিকা দ্বারা ইওসিন দ্রবণ শিরা ও উপশিরার মধ্যের জাইলেমবাহিকার মাধ্যমে বিভিন্ন স্থানে সঞ্চারিত হয়েছে।

উদ্ভিদ দেহে সংবহনের বিভিন্ন মতবাদঃ উদ্ভিদের দেহে উন্নত শ্রেণীর প্রাণীর হৃদযন্ত্রের মত কোনও যন্ত্র নেই যার দ্বারা মাটি থেকে জল শোষণ ও চাপসৃষ্টির করে গাছের উচ্চ শাখা-প্রশাখায় পাঠাতে পারে। সুতরাং কি উপায়ে জল সংবহন হয় তার বিষয়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানীর বিভিন্ন মতবাদ আছে।

(১) **মূলজ চাপ মতবাদঃ** একটি উদ্ভিদের কাণ্ডকে মাটির কয়েক সেন্টিমিটার উপরে কাটলে সেই কাটা জায়গা থেকে অনেকক্ষণ ধরে উদ্ভিদ রস বেরোতে থাকে। সেই অংশে একটি কাঁচের নল রবার নলের সাহায্যে সংযুক্ত করলে কাঁচের নলের মধ্যে রস জমে জমে ক্রমশঃ পরিমাণে বাড়তে থাকে। এই রস কি পরিমাণ চাপ সৃষ্টি দ্বারা বেরোতে থাকে তা একটি পারদ চাপমাপক যন্ত্রের (Mercury manometer) সাহায্যে নির্ণয় করা যায়। যে চাপের সাহায্যে কাণ্ডের কাটা অংশ থেকে রস নির্গত

হয় তাকে **মূলজ চাপ** (Root pressure) বলে। টম্যাটোর শাখামূলের সাহায্যে কি পরিমাণ চাপসৃষ্টির দ্বারা রস জাইলেমবাহিকার মাধ্যমে উপরের দিকে প্রবাহিত হয় তা পরীক্ষার মাধ্যমে প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে ২-৬ কেজি পর্যন্ত হতে পারে বলে জানা গেছে। এই পরিমাণ চাপ সহজেই ৬৫ মিটার উচ্চতায়ও জলকে তুলতে পারে। তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মূলজ চাপের পরিমাণ অল্প বা একেবারেই থাকে না, যদিও সে সময় উদ্ভিদের জলের খরচের পরিমাণ অত্যন্ত বেশী বলে বিভিন্ন বিজ্ঞানী দেখেছেন। সুতরাং এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, অন্য কোনও প্রক্রিয়া মূলজ চাপের সাথে যুক্ত হয়ে মাটি থেকে জল উত্তোলনে সাহায্য করে॥



২০নং চিত্র॥ সংসক্তি ও শোষণ চাপ দ্বারা উদ্ভিদদেহে জল সংবহনের পরীক্ষা—দ্রুত বাষ্প মোচনের ফলে কাণ্ডের শাখায় যে পরিমাণ জল উঁচুতে উঠতে পারে তা প্রাকৃতিক চাপ অপেক্ষা বৃহত্তর।

(২) **শোষণ চাপ ও সংসক্তি মতবাদ** (Suction pressure & Cohesion theory): ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে দুজন আইরিশ উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী ডিক্সন (H. H. Dixon) এবং জলি (J. Joly) এই মতবাদ প্রচার করেন যে, মাটির অভ্যন্তরের জল কেবলমাত্র উদ্ভিদের নিম্নাংশের মূলজ চাপ দ্বারা উপরে না উঠে কাণ্ডের উপরিভাগের শাখা-প্রশাখা ও পাতার শোষণ চাপ দ্বারাও সংবহিত হতে পারে। এই শোষণ দ্বারা যে চাপ সৃষ্টি হয় তা জলের বিভিন্ন অণুর সংসক্তি বা আকর্ষণের দ্বারা পরিচালিত হয়। **সংসক্তি** (Cohesion) হচ্ছে একটি বস্তুর বিভিন্ন অণুর পারস্পরিক আকর্ষণ এবং এই আকর্ষণের দ্বারা একটি বস্তু সংযুক্ত থাকে। উদ্ভিদের জলীয় রসের বিভিন্ন অণুর মধ্যে সংসক্তির প্রভাব বেশী হওয়ায় বলপূর্বক আকর্ষণে গাছের সুউচ্চ স্থান পর্যন্ত উঠতে পারে।

তবে কোন্ আকর্ষণ উদ্ভিদের মধ্যের রসকে আকর্ষণ করে যাতে গাছের উপরে তা উঠতে পারে? পাতার অভ্যন্তরস্থ মেসোফিল নামক কোষের মধ্যে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় প্রচুর পরিমাণ শর্করা উৎপন্ন হয়। এই সময় প্রচুর জল বায়ুর মধ্যে বহিষ্কৃত হওয়ায় জলে দ্রবীভূত শর্করার ঘনত্ব বৃদ্ধি পায় এবং জলের পরিমাণ কমে যায়। এজন্য শোষণ চাপের বৃদ্ধি ঘটে এবং মাটির মধ্যের জল অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় জাইলেমবাহিকার মধ্যে উদ্ভিদ-রসরূপে উঠতে থাকে। জাইলেমবাহিকার অভ্যন্তর নলের মত এবং এর মধ্যে জলীয় উদ্ভিদ-রস স্তম্ভাকারে ভরে থাকে। পত্ররন্ধ্র দিয়ে বাষ্পীভবন (Evaporation) দ্বারা জলত্যাগের ফলে যে জলাভাবের ও শোষণ শক্তির সৃষ্টি হয় তাতে জলীয় রস সংসক্তির দ্বারা উপরের দিকে প্রবাহিত হয়। শোষণ চাপের সৃষ্টি কেবল মাত্র সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় জল পত্ররন্ধ্র দিয়ে জলীয় বাষ্পরূপে বেরিয়ে যাওয়াতেই শুধু হয় না উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য বা **বাষ্পমোচনের** (Transpiratio) ফলেও ঘটে। এই শোষণ শক্তির পরিমাণ এত অধিক যে, তাতে জাইলেমবাহিকার অভ্যন্তরে জলস্তম্ভ গাছের সুউচ্চ অঞ্চলেও উঠতে পারে।

বিভিন্ন জৈববস্তুর পরিবহন: জাইলেমবাহিকার মাধ্যমে জল ও জলে দ্রবীভূত বিভিন্ন খনিজ পরিবাহিত হয় কিন্তু জৈব বস্তুগুলি ফ্লোয়েম কলা সংবহিত করে। ফ্লোয়েম কলার সীভনলের দ্বারা খাদ্যের বিভিন্ন অংশ উদ্ভিদ দেহের বিভিন্ন অংশে বাহিত হলেও কিভাবে এই ক্রিয়া ঘটে তা সঠিকভাবে জানা নেই।

প্রাণিদেহে পরিবহন ও সংবহন

প্রাণীদের জৈবিক ক্রিয়ার জন্য দেহের সর্বত্র বিভিন্ন কোষের মধ্যে খাদ্য এবং অক্সিজেনের সর্বদা প্রয়োজন হয়। দেহের মধ্যে বিপাকীয় ক্রিয়ায় উৎপন্ন বর্জ্য বস্তুগুলি তৎক্ষণাৎ বহিষ্কৃত হয়। এককোষী প্রাণী যথা, অ্যামিবার দেহে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড জলের মধ্যে বিনিময় কোষের মধ্যের সঞ্চালিত প্রোটোপ্লাজমের দ্বারা সংঘটিত হয়। নিম্নশ্রেণীর বহুকোষী প্রাণী যথা—স্পঞ্জ, হাইড্রা, ওবেলিয়া ইত্যাদি প্রাণীর দেহের বহিঃস্থ কোষের দ্বারা অভিস্রবণ ক্রিয়ায় অন্তর্বর্তী কোষগুলির মধ্যে খাদ্য ও অক্সিজেন পরিবাহিত এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড ও বর্জ্য বস্তুগুলি একই উপায়ে বহিষ্কৃত হয়। অধিকতর উন্নত শ্রেণীর প্রাণীদের বিভিন্ন দেহযন্ত্র দেহ-প্রাচীরের বহিঃস্থ কোষস্তর থেকে আলাদা হয়ে দেহের অভ্যন্তরে থাকায় সেই সকল প্রাণীর ক্ষেত্রে আলাদা রক্ত সংবহনতন্ত্রের উদ্ভব হয়। এই প্রকার রক্ত

সংবহনতন্ত্রের মাধ্যমে এই সকল প্রাণীর দেহে পৌষ্টিকতন্ত্রের মাধ্যমে খাদ্যবস্তু শোষণ এবং শ্বাসযন্ত্রের মাধ্যমে অক্সিজেন গ্রহণ করে দেহের বিভিন্ন অংশে দ্রুত প্রবাহিত হয়। এইভাবে দেহের বিভিন্ন প্রান্তের কোষগুলি খাদ্য ও অক্সিজেন পাওয়ায় বিপাকীয় ক্রিয়া সংঘটিত এবং বিপাকীয় ক্রিয়ায় উদ্ভূত বর্জ্যবস্তু পরিত্যাগ করে। রক্ত সংবহতন্ত্রের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় অংশগুলি যথাক্রমে—(ক) প্লাজমা ও রক্তকণিকার দ্বারা গঠিত **তরল যোগ কলা—রক্ত**, (খ) তরল রক্তকে দেহের বিভিন্ন অংশে প্রবাহিত করার জন্য চাপসৃষ্টিকারী পেশীবহুল **হৃদযন্ত্র**, (গ) রক্ত প্রবাহিত হওয়ার জন্য পেশীকলা দ্বারা গঠিত নলাকার **ধমনী** ও **শিরাতন্ত্র** এবং তার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা।

রক্ত (Blood)

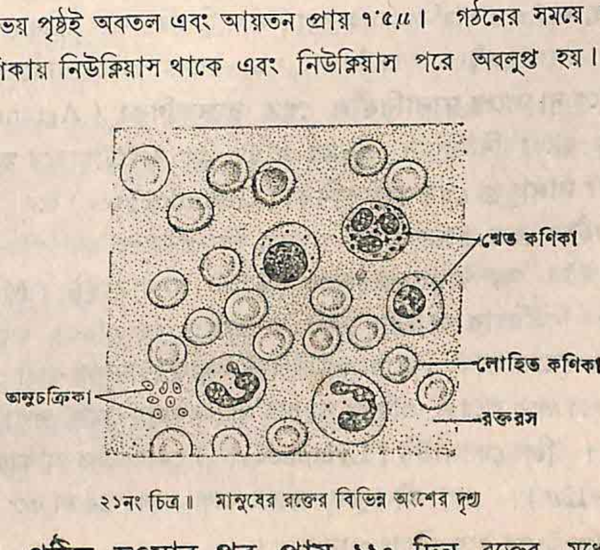
রক্ত একপ্রকার **তরল যোগকলা**, এর তরল অংশকে প্লাজমা (Plasma) বা রক্তরস বলে। তরল প্লাজমার মধ্যে রক্তকোষ বা কণিকাগুলি অবস্থিত। রক্তকণিকাগুলি বিভিন্ন প্রকার। যথা,—**লোহিত রক্তকণিকা** বা **ইরাইথ্রোসাইট** (Red blood corpuscles or Erythrocyte), **শ্বেত রক্তকণিকা** বা **লিউকোসাইট** (White blood corpuscles or Leucocyte) এবং **অণুচক্রিকা** বা **থ্রমবোসাইট** (Thrombocyte) বলে। অণুচক্রিকাকে **প্ল্যাটলেট** (Platlte)-ও বলে। যদিও মেরুদণ্ডী প্রাণীদের রক্ত এই সকল উপাদান দ্বারা গঠিত কিন্তু অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের রক্ত ভিন্ন প্রকারের হয়।

(ক) **অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের রক্তঃ** মেরুদণ্ডী প্রাণী অপেক্ষা অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের প্লাজমার (রক্তরস) মধ্যে অত্যন্ত অল্পসংখ্যক রক্তকণিকা থাকে। এই সকল রক্তকণিকা মেরুদণ্ডী প্রাণীদের শ্বেত-রক্তকণিকার মত ক্ষণপদ বিস্তার করে খাদ্যবস্তু গ্রহণ, দেহে রোগসৃষ্টিকারী জীবাণু গ্রাস বা অন্যান্য কার্য করে। শ্বাসক্রিয়ায় অক্সিজেন বহনকারী হিমোগ্লোবিনের ন্যায় কোনও বস্তু থাকলে তা লোহিত রক্তকণিকার মধ্যে অথবা প্লাজমায় থাকে। **কেঁচোর রক্তে হিমোগ্লোবিন রক্তকণিকায় থাকে না, প্লাজমায় দ্রবীভূত থাকায় রক্তের রঙ লাল হয়।** চিংড়ির রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিবর্তে তাম্র-ঘটিত **হিমোসায়ানিন** নামক বস্তু অক্সিজেন সহযোগে যে যৌগ উৎপন্ন হয়, তার বর্ণ নীল রঙের হয়।

(খ) **মেরুদণ্ডী প্রাণীদের রক্ত ঃ** মেরুদণ্ডী প্রাণীদের রক্ত (১) প্লাজমা নামক বর্ণহীন জলীয় অংশ, (২) শ্বেত রক্তকণিকা, (৩) লোহিত রক্তকণিকা এবং (৪) অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অণুচক্রিকা দ্বারা গঠিত।

(১) **প্লাজমা (Plasma) ঃ** মানুষের রক্তের প্লাজমার রঙ ফেকাশে হলুদ বর্ণের হয়। প্লাজমায় জলের পরিমাণ প্রায় ৯২%, বিভিন্ন অজৈব লবণ যার মধ্যে বেশীর ভাগই সোডিয়াম ক্লোরাইড, তার পরিমাণ প্রায় ৯%। বাকী অংশ প্রোটিন ও অন্যান্য জৈব বস্তু দ্বারা গঠিত। শারীরিক অবস্থা অনুযায়ী প্লাজমায় বিভিন্ন বস্তুর পরিমাণ পরিবর্তিত হতে পারে। কোনও কারণে রক্তের ঘনত্ব বাড়লে, রক্তের মধ্যে পাতিত জলে প্লাজমার লবণের সমমাত্রায় লবণ ($NaCl$) দ্বারা দ্রবণ প্রস্তুত করে প্রবেশ করালে কণিকার কোনও ক্ষতি না হয়ে ঘনত্ব কমে যায়। এই প্রকার দ্রবণকে "স্যালাইন" বলে। **পূর্ণবয়স্ক মানুষের দেহে গড়ে পাঁচ থেকে ছয় লিটার রক্ত থাকে এবং এই রক্তের প্রায় ৬০ ভাগ হচ্ছে প্লাজমা।**

(২) **লোহিত রক্তকণিকা বা ইরাইথ্রোসাইট (Erythrocyte or Red blood corpuscles) :** স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে উট ব্যতীত সকলেরই লোহিত কণিকায় কোনও নিউক্লিয়াস থাকে না, অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণীদের লোহিত রক্তকণিকায় নিউক্লিয়াস থাকে। মানুষের লোহিত রক্তকণিকা গোলাকার থালার আকৃতির, উভয় পৃষ্ঠই অবতল এবং আয়তন প্রায় ৭·৫μ। গঠনের সময়ে স্তন্যপায়ীদের লোহিত কণিকায় নিউক্লিয়াস থাকে এবং নিউক্লিয়াস পরে অবলুপ্ত হয়। **লোহিত**



২১নং চিত্র ॥ মানুষের রক্তের বিভিন্ন অংশের দৃশ্য

রক্তকণিকা গঠিত হওয়ার পর প্রায় ১২০ দিন রক্তের মধ্যে সংবহিত হয়ে পরে বিনষ্ট হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় প্রতি কিউবিক মিলিমিটার রক্তে

লোহিত রক্তকণিকা পুরুষের ক্ষেত্রে প্রায় ৫,০০০,০০০ এবং স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে ৪,৫০০,০০০ হয়। শিশু এবং পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের রক্তে লোহিত কণিকার সংখ্যা অধিক। মানুষের রক্তে লোহিত কণিকার স্বাভাবিক সংখ্যা বিভিন্ন রোগের জন্য কম হতে পারে, একে **রক্তাল্পতা রোগ** (Anemia) বলে। **লোহিত রক্তকণিকা অস্থির মধ্যে লোহিত মজ্জায় উৎপন্ন হয়** এবং পরিমাণে অধিক হলে প্লীহার মধ্যে সাময়িকভাবে সঞ্চিত থাকে। স্বাভাবিক জৈবিক ক্রিয়ার পর **লোহিত রক্তকণিকা প্লীহার মধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত** হয় এবং হিমোগ্লোবিন কণিকা যকৃতের মধ্যে পিত্তের রঙিন কণিকায় পরিবর্তিত হয়। লোহিত রক্তকণিকার সাইটোপ্লাজমের মধ্যে **হিমোগ্লোবিন** নামক লোহিত রঙ্গক থাকে। ইহা **হিম** (Haen) নামক লৌহঘটিত যৌগ ও **গ্লোবিউলিন** নামক প্রোটিন দ্বারা গঠিত। এই যৌগের অতিরিক্ত অক্সিজেন আসক্তির ফলে অক্সিজেন সংযোগে **অক্সিহিমোগ্লোবিন** উৎপন্ন করে এবং এর বর্ণ টকটকে লাল হওয়ায় রক্তে এই কণিকার উপস্থিতিতে রক্ত লাল বর্ণের হয়।

(৩) **শ্বেত রক্তকণিকা বা লিউকোসাইট** (Leucocytes or White blood corpuscles) : মানুষের রক্তের শ্বেত রক্তকণিকা নিউক্লিয়াসযুক্ত এবং বিভিন্ন প্রকারের হয়। শ্বেত রক্তকণিকা অ্যামিবার মত ক্ষণপদের সাহায্যে চলাচল করে এবং দেহে অনুপ্রবেশকারী ক্ষতিকারক রোগ জীবাণু ধ্বংস করে। শ্বেত রক্তকণিকা আকার, গঠন, কার্য ও রাসায়নিক রঞ্জক পদার্থ দ্বারা নিউক্লিয়াসকে রঙিন (Staining) করে বিভিন্ন ভাগে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়। যথা—যাদের সাইটোপ্লাজমের মধ্যে অতি ক্ষুদ্র দানা থাকে না তাদের **দানাবিহীন শ্বেত রক্তকণিকা** (Agranulocytes) বলে। আর যাদের নিউক্লিয়াস বহুভাগে খণ্ডিত এবং সাইটোপ্লাজমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানা আছে, তাদের **দানাযুক্ত শ্বেত রক্তকণিকা** (Granulocytes) বলে।

দানাবিহীন শ্বেত রক্তকণিকা আবার দুই প্রকারের হয়, যথা—মনোসাইট ও লিমফোসাইট। অপেক্ষাকৃত বড়গুলিকে (25μ) **মনোসাইট** (Monocyt) বলে। এদের নিউক্লিয়াস অপরিণত অবস্থায় গোলাকার এবং পরিণত অবস্থায় অর্ধচন্দ্র বা বৃক্কের আকারের হয়। এরা ব্যাকটিরিয়া ও অন্যান্য রোগ সৃষ্টিকারী বস্তুকে দেহের মধ্যে গ্রহণ করে ধ্বংস করে। পরিণত অবস্থায় এরা একস্থান থেকে অন্যস্থানে চলাচল করতে পারে। **লিমফোসাইট** (Lymphocyt) কোষগুলির আকার অপেক্ষাকৃত ছোট (—12μ)। এরা জীবাণুকে দেহের মধ্যে গ্রহণ করে না তবে রক্তের মধ্যে প্রতিরোধ শক্তি উৎপন্ন করে জীবাণু ধ্বংস করে।

দানাযুক্ত শ্বেত রক্তকণিকা তিন প্রকারের, যথা—**নিউট্রোফিল্,**

ইয়োসিনোফিল্ এবং **বেসোফিল্**। **নিউট্রোফিল্** (Neutrophil) আকারে প্রায় ১০—১২μ এবং সংখ্যায় সর্বাধিক। এদের নিউক্লিয়াস বহুভাগে (২—৭ খণ্ডে) বিভক্ত। এরা মনোসাইটের মত রোগজীবাণু নিজেদের দেহের মধ্যে গ্রহণ করে ধ্বংস করে। রক্তে **ইয়োসিনোফিল্** (Eosinophil) ও **বেসোফিলের** (Basophil) সংখ্যা সর্বাপেক্ষা কম এবং এদের কার্যপ্রণালী নিশ্চিতভাবে বলা যায় না ; তবে এরা রোগ প্রতিরোধ করে। কৃমিজাতীয় পরজীবী প্রাণীর সংক্রমণে ইয়োসিনোফিলের সংখ্যা বেড়ে যায়।

প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির শ্বেত রক্তকণিকা অস্থির লোহিত মজ্জা, প্লীহা (Spleen) এবং লসিকা গ্রন্থিতে উৎপন্ন হয়। শ্বেত রক্তকণিকা গঠিত হওয়ার প্রায় ১২—১৩ দিন পরে ধ্বংস হয়। অস্থি বা প্লীহার মধ্যে শ্বেত রক্তকণিকা উৎপন্নকারী কোনও কোষ অস্বাভাবিক মাত্রায় শ্বেত কণিকা উৎপন্ন করতে শুরু করে। এর ফলে রক্তের মধ্যে এক বা দুই শ্রেণীর শ্বেত রক্তকণিকা সংখ্যার অত্যধিক বৃদ্ধি ঘটে এবং বিভিন্ন প্রকার ক্ষতিকারক উপসর্গ দেখা দেয়। এই অবস্থাকে **লিউকেমিয়া** (Leukemia) বা রক্তের ক্যানসার বলে। এই রোগ চিকিৎসার কোন ঔষধ আজ পর্যন্ত বার হয়নি এবং এই রোগ হলে মৃত্যু প্রায় অবধারিত। স্বাভাবিক অবস্থায় শ্বেত রক্তকণিকা প্রতি কিউবিক মিলিমিটার রক্তে সংখ্যায় প্রায় ৮,০০০—১০,০০০ থাকে।

(৪) **অণুচক্রিকা** ঃ রক্তের মধ্যে লোহিত রক্তকণিকার ন্যায় থালার আকৃতির অতি ক্ষুদ্র নিউক্লিয়াসবিহীন বহু অণুচক্রিকা আছে। দেহের কোনও অংশ কেটে গেলে বা অন্য কোন দুর্ঘটনায় ক্রমাগত রক্ত বেরোতে থাকলে অণুচক্রিকা বিভক্ত হয়ে থ্রম্বোপ্লাসটিন উৎপন্ন করে। এই থ্রম্বোপ্লাসটিন রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে।

রক্তের বিভিন্ন প্রকার কার্য ঃ

(ক) **পরিবহন** ঃ (১) শ্বাসযন্ত্র ও দেহের কলার মধ্যে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিবহন করে। (২) পৌষ্টিকতন্ত্রের মধ্যে খাদ্যের পরিপাকের পর খাদ্যবস্তু ও জল দেহের বিভিন্ন অঞ্চলে বহন করে। (৩) দেহের বিভিন্ন যন্ত্র বা কোষের মধ্যে সঞ্চিত খাদ্যদ্রব্য বিভিন্ন অঞ্চলে প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবহন করে এবং অতিরিক্ত খাদ্যবস্তু সঞ্চিত রাখে। (৪) বিপাক ক্রিয়ায় উৎপন্ন বিভিন্ন বর্জ্য বস্তু জল ও অতিরিক্ত খনিজ পদার্থ জলে দ্রবীভূত অবস্থায় রক্তের দ্বারা বৃক্কের মাধ্যমে বহিষ্কৃত হয়। (৫) অন্তর্বর্তী গ্রন্থিগুলিতে উৎপন্ন বিভিন্ন **হরমোন** (Hormone) **রক্তের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়ে** বিভিন্ন অঞ্চলে সরবরাহ হয়।

(খ) **অম্লত্ব ও ক্ষারত্ব রক্ষা ঃ** রক্ত দেহের বিভিন্ন কলার **অম্লত্ব** (Acidity) ও **ক্ষারত্ব** (Alkalinity) বিভিন্ন ফসফেট ও কার্বোনেট যৌগের সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত করে। রক্ত সামান্য পরিমাণ ক্ষারীয়।

(গ) **জলসাম্য রক্ষা ঃ** দেহের বিভিন্ন কলা ও রেচনযন্ত্রের মাধ্যমে দেহের **জলসাম্য রক্ষা** করে। এইজন্য রক্তের মধ্যে জলের পরিমাণের তারতম্য হয় না।

(ঘ) **তাপমাত্রা রক্ষা ঃ** দেহের ত্বকে এবং অভ্যন্তর ভাগের বিভিন্ন যন্ত্রের মধ্যে রক্ত সঞ্চালনের তারতম্য দ্বারা সর্বত্র **তাপমাত্রা মোটামুটি নির্দিষ্ট রাখে।**

(ঙ) **আত্মরক্ষামূলক কার্য ঃ** শ্বেতরক্তকণিকারা দেহের মধ্যে অনুপ্রবেশকারী রোগজীবাণুগুলিকে ক্ষণপদের সাহায্যে গ্রহণ করে ধ্বংস করলে রোগ সৃষ্টি হয় না। রক্তের মধ্যে অধিবিষ বা টক্সিন (Toxin) সৃষ্টিকারী রোগজীবাণু প্রবেশ করলে অ্যান্টিবডি (Antibody) বা প্রতিষেধক সৃষ্টি দ্বারা পুনর্বার **উক্ত** রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ করে।

পুঁজ (Pus) কাকে বলে এবং কিরূপে উৎপন্ন হয় ঃ দেহের কোনও কাটা স্থানে ক্ষত, বা যে বিষস্ফোটক ও ব্রণ উৎপন্ন হয় তা ব্যাকটিরিয়ার আক্রমণে ঘটে। আক্রান্ত স্থানের নিকটবর্তী শ্বেত রক্তকণিকার সঙ্গে ব্যাকটিরিয়ার সংগ্রামে পরাজিত ও মৃত শ্বেত রক্তকণিকা, জীর্ণ কোষ, পেশীতন্তু এবং লসিকা একত্রে যে ক্ষারীয় তরল পদার্থের সৃষ্টি করে তাকে পুঁজ বলে।

রক্তের তঞ্চন (Blood clotting) **ঃ** দেহের কোন স্থান কেটে গেলে সেই অঞ্চলের ধমনী বা শিরার সূক্ষ্ম কৈশিক বা জালক থেকে রক্ত বেরোতে থাকে। কিছু সময় পরে জমাট বেঁধে রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে যায়। কাটা অসমতল স্থানের সংস্পর্শে অণুচক্রিকা ভেঙ্গে গিয়ে **থ্রম্বোপ্লাস্টিন** (Thromboplastin) মুক্ত করে। রক্তের প্লাজমার মধ্যের **ক্যালসিয়াম আয়নের** সাথে থ্রম্বোপ্লাস্টিন মিশে রক্তের মধ্যে **প্রোথ্রম্বিনের** (Prothrombin) উপর ক্রিয়ার দ্বারা **থ্রম্বিনে** (Thrombin) পরিণত হয়। **ভিটামিন** K যকৃতের মধ্যে উপস্থিত থেকে **প্রোথ্রম্বিন** উৎপন্ন করে। থ্রম্বিন প্লাজমার মধ্যে দ্রবীভূত **ফাইব্রিনোজেন** নামক প্রোটিনকে **ফাইব্রিন** নামক অতি সূক্ষ্ম সূতার মত বস্তুতে পরিবর্তিত করে। অসংখ্য ফাইব্রিন একত্রে জালের আকার ধারণ করে এবং এর মধ্যে রক্ত কণিকা আটকিয়ে গিয়ে রক্ত পড়া বন্ধ হয়। সমগ্র প্রক্রিয়াকে রক্তের **তঞ্চন** (Coagulation of blood) বলে। রক্ত তঞ্চনের ফলে জমাট রক্ত থেকে যে হলুদ বর্ণের রস নিঃসরণ হয় তাকে **সিরাম** (Serum বা **রক্তমস্ত** বলে।

রক্ত তঞ্চন প্রক্রিয়ার সারাংশ ঃ

প্রথম পর্যায়	অণুচক্রিকা → **থ্রম্বোপ্ল্যাস্টিন** ↓
দ্বিতীয় পর্যায়	প্রোথ্রম্বিন + ক্যালসিয়াম আয়ন→**থ্রম্বিন** ↓
তৃতীয় পর্যায়	ফাইব্রিনোজেন → **ফাইব্রিন** ↓
চতুর্থ পর্যায়	রক্তকণিকা → তঞ্চন

অ্যাণ্টিবডি বা রক্তমধ্যে রোগজীবাণু প্রতিষেধক (Antibody) উৎপাদন ঃ কোন প্রাণীর রক্তের মধ্যে বহিরাগত প্রোটিন জাতীয় বস্তু প্রবেশ করলে রক্তের মধ্যে বিশেষ প্রতিক্রিয়া দ্বারা ওই প্রোটিনের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মুক্ত করার প্রতিষেধক উৎপন্ন হয়, একে **অ্যাণ্টিবডি** বলে। রোগ উৎপন্নকারী বিভিন্ন জীবাণু দেহের মধ্যে প্রবেশ করে যে রোগ সৃষ্টি হয় তা থেকে আরোগ্য লাভের ফলে সেই রোগের প্রতিষেধক বা অ্যাণ্টিবডি রক্তের মধ্যে উৎপন্ন হয়। এর ফলে দেহে ঐ রোগের পুনর্বার আক্রমণের আশঙ্কা কমে যায়। রোগ প্রতিরোধের জন্য বিশেষ রোগে মৃত বা ক্ষতিকর প্রভাবমুক্ত জীবাণু অতিসূক্ষ্ম পরিমাণে প্রবেশ করিয়ে রক্তের মধ্যে অ্যাণ্টিবডি উৎপন্ন করা হয়। বর্তমানে এই অ্যাণ্টিবডি মানুষ বা গৃহপালিত প্রণীর দেহে প্রয়োগ করা হয়। এই প্রকার বস্তুকে ভ্যাকসিন (Vaccine) বলে। ইংরেজ বিজ্ঞানী **এডওয়ার্ড জেনার** (Edward Jenner) ১৭৯৬ খ্রীস্টাব্দে সর্বপ্রথম বসন্তরোগের ভ্যাকসিন আবিষ্কার করেন। ঘোড়ার দেহে সাপের বিষ বা অন্য কোনও জীবাণুদেহ-নিঃসৃত টক্সিন নামক বিষাক্ত পদার্থ প্রবেশ করালে রক্তের মধ্যে প্রতিবিষ বা অ্যাণ্টিটক্সিন (Antitoxin) উৎপন্ন হয়। ঘোড়ার রক্তের সিরাম আলাদা করলে অ্যাণ্টিটক্সিন সিরামে চলে আসে, এই সিরাম কোন জীবজন্তু বা মানুষকে ইনজেকশন দ্বারা প্রবেশ করালে সেই প্রকার রোগের আক্রমণ রোধ করা যায়। বসন্ত, টাইফয়েড ইত্যাদি রোগের প্রতিরোধককে ভ্যাকসিন এবং ডিপথেরিয়া, তড়কা (Tetanus) বা সর্পাঘাতের প্রতিবিষকে **অ্যাণ্টিটক্সিন** (Antitoxin) বলে।

রক্তের শ্রেণীবিভাগ ঃ রক্তাল্পতা রোগে, অস্ত্র-চিকিৎসায় বা কোন দুর্ঘটনায় দেহ থেকে প্রচুর রক্তপাত হলে মানুষকে বাঁচানোর জন্য তার দেহে অন্য মানুষের রক্ত প্রবাহিত করা হয়। তবে অনেক সময় দেখা যায় যে, একজন মানুষের রক্ত অন্যের দেহে প্রবাহিত করালে দাতার রক্তের লোহিত কণিকাগুলি গ্রহীতার রক্তের প্লাজমায়

সাথে মিশে একত্রে জুড়ে দানা বেঁধে যায়। এই অবস্থাকে রক্তের দানা বাঁধা বা অ্যাগ্লুটিনেসান্ (Agglutination) বলে। কোন ব্যক্তির দেহে রক্ত দানের ফলে যদি তার দেহে রক্ত জুড়ে দানা বেঁধে যায় তাহলে সেই ব্যক্তির মৃত্যু সুনিশ্চিত। সেইজন্য রক্ত দানের আগে পরীক্ষার দ্বারা দেখতে হবে যে, দাতা এবং গ্রহীতার রক্ত পরস্পরের উপযুক্ত কিনা।

১৯০০ খ্রীস্টাব্দে **কার্ল ল্যাণ্ডস্টেইনার** (Karl Landsteiner) এই প্রকার বিক্রিয়ার কারণ আবিষ্কার করেন। তিনি লোহিত রক্তকণিকার মধ্যে রক্তের দানা বাঁধিয়ে দেওয়ার পদার্থকে **অ্যান্টিজেন** (Antigen) এবং এই অ্যান্টিজেনের দ্বারা প্লাজমার যে পদার্থ দানা বাঁধে সেই পদার্থকে **অ্যান্টিবডি** (Antibody) বলেন।

ল্যাণ্ডস্টেইনার লোহিত রক্তকণিকার মধ্যে বিভিন্ন প্রকার অ্যান্টিজেনের উপস্থিতি অনুযায়ী মানুষের রক্তকে চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন—একেই **রক্ত শ্রেণীবদ্ধকরণ** (Blood grouping) বলে। লোহিত রক্তকণিকায় দুপ্রকার অ্যান্টিজেন থাকে, যথা *A* ও *B*। অনেক লোহিত রক্তকণিকায় *AB* উভয়েই একত্রে থাকে আবার অনেক লোহিত রক্তকণিকায় কোন অ্যান্টিজেন না থাকায় তাদের *O* শ্রেণীর রক্ত বলে চিহ্নিত করা হয়। সুতরাং লোহিত রক্তকণিকায় অ্যান্টিজেনের উপস্থিতি অনুযায়ী রক্তকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। *A* অ্যান্টিজেন রক্তে *b* অ্যান্টিবডি এবং *B*-তে *a* অ্যান্টিবডি থাকে। *AB*-তে কোনও অ্যান্টিবডি থাকে না কিন্তু *O* শ্রেণীর রক্তে *ab* উভয় অ্যান্টিবডিই থাকে। A শ্রেণীর রক্তের অ্যান্টিজেন *B* শ্রেণীর রক্তের *a* অ্যান্টিবডির সাথে মিশলে দানা বেঁধে যাবে **এজন্য অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিবডির বিরুদ্ধতা অনুযায়ী রক্তের দাতা ও গ্রহীতা নির্বাচন করা উচিত।**

রক্তের শ্রেণীবিভাগ, দাতা ও গ্রহীতা নির্ণয় ঃ

রক্তের শ্রেণী ও গ্রহীতা	R. B. C-তে অ্যান্টিজেন	প্লাজমার অ্যান্টিবডি	রক্তদাতা নির্ণয়	
			অনুপযুক্ত	উপযুক্ত
A	A	b	B ও AB	A ও O
B	B	a	A ও AB	B ও O
AB	AB	—	—	A, B, AB ও O
O	—	ab	A, B ও AB	O

উপরের তালিকায় দেখা যাচ্ছে যে, *A* নিজের শ্রেণী ব্যতীত *O* শ্রেণীর রক্ত, *B* নিজের ব্যতীত *O* শ্রেণীর রক্ত, *AB* নিজের ব্যতীত *O* শ্রেণীর রক্ত কেবল গ্রহণ

করতে পারে, অন্য কোনও শ্রেণীর রক্ত গ্রহণ করলে রক্ত দানা বেঁধে যায়। *O* শ্রেণীর রক্ত সবকটি শ্রেণীকে রক্তদান করতে পারে কিন্তু নিজের শ্রেণী ব্যতীত অন্য কোনও শ্রেণীর রক্ত গ্রহণ করতে পারে না। এজন্য এই শ্রেণীকে **সার্বজনীন দাতা** (Universal donor) বলে। *AB* সব শ্রেণীর রক্ত গ্রহণ করে বলে **সার্বজনীন গ্রহীতা** (Universal recipient) বলে।

রক্তের শ্রেণীবিভাগের গুরুত্ব :

(১) দাতা ও গ্রহীতার রক্তের শ্রেণীবিভাগের দ্বারা সঠিক রক্ত দান করলে গ্রহীতার কোন বিপদ হয় না। (২) কোনও শিশুর পিতৃত্ব নির্ধারণে শিশুর রক্তের শ্রেণীর সাথে পিতৃরক্তের শ্রেণীর মিল দ্বারা নির্ণয় করা যায়। (৩) হত্যা বা অন্য প্রকার হিংস্র অপরাধমূলক ঘটনায় রক্তের শ্রেণী নির্ণয় করে অপরাধীকে ধরা যায়।

লোহিত রক্তকণিকায় অ্যান্টিজেনের গুণানুযায়ী রক্তের শ্রেণী পূর্বে চার প্রকার নির্দিষ্ট হয়েছিল। ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দে ল্যাণ্ডস্টেইনার আরও এক প্রকারের গুরুত্বপূর্ণ অ্যান্টিজেনের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। লোহিত রক্তকণিকায় এই অ্যান্টিজেন থাকলেও প্লাজমার মধ্যে এর কোনও অ্যান্টিবডি থাকে না। এর অ্যান্টিবডি রীস্যাস্ (Rhesus) নামক উত্তর-ভারতের এক প্রকার ক্ষুদ্র বানরের লোহিত রক্তকণিকা, গিনিপিগ বা খরগোসের রক্তের মধ্যে প্রবেশ করানোর ফলে উৎপন্ন বিরুদ্ধ সিরাম (Anti-serum) দ্বারা নির্ধারিত হয়। এজন্য এই অ্যান্টিজেনকে রীস্যাস্ ফ্যাক্টর (Rhesus factor) বলে। যাদের লোহিত রক্তকণিকায় এই বিশেষ বস্তুটি থাকে তাদের Rh^+ এবং যাদের থাকে না তাদের Rh^- বলে। যদি Rh^+ রক্তকে Rh-রক্তবিশিষ্ট ব্যক্তির দেহে প্রবাহিত করা যায় তাহলে রক্তের মধ্যে সাংঘাতিক ধরনের প্রতিক্রিয়া ঘটে, এমন কি লোহিত রক্তকণিকাগুলি ভেঙ্গেও যায়। সুতরাং রোগীর দেহে রক্তদানের সময় দাতা এবং গ্রহীতার রক্তের এই গুণটির পরীক্ষার পর রক্ত দেওয়া উচিত।

রক্ত সংবহন

প্রাণীদেহে রক্ত সংবহন আবিষ্কার : উইলিয়াম হার্ভে (William Harvey) নামে বিশিষ্ট ইংরেজ চিকিৎসকের ১৬২৮ খ্রীস্টাব্দে '**প্রাণীদের রক্ত ও হৃদসঞ্চালন**' নামে এক যুগান্তকারী গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তিনি এই

প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রমাণাদির দ্বারা প্রাণীদের হৃদযন্ত্র থেকে কিরূপে রক্ত সংবহন হয় তা বর্ণনা করেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে, হৃদযন্ত্র থেকে রক্ত ধমনীর সাহায্যে পরিবাহিত হয়ে বিশেষ কোনও উপায়ে তা আবার শিরার মধ্যে আসে এবং অবশেষে হৃদযন্ত্রে উপস্থিত হয়। কিন্তু কিভাবে ধমনী ও শিরা যুক্ত থাকে, তিনি তা জানতেন না। পরবর্তীকালে **মারসেল্লো ম্যালপিগী** (Marcello Malpighi) নামে একজন ইটালিয়ান বিজ্ঞানী ১৬৬০ খ্রীস্টাব্দে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে কিভাবে ধমনী (Artery) বহু জালকে বিভক্ত হয় এবং জালকগুলি পুনর্বার মিলিত হয়ে শিরার উৎপত্তি করে তা আবিষ্কার করেন।

পরবর্তীকালে বিভিন্ন বিজ্ঞানীর কার্যের ফলে জানা গেছে যে, জালকের প্রাচীর এককোষস্তরবিশিষ্ট হওয়ায় তার মধ্য দিয়ে খাদ্যবস্তু, অক্সিজেন ইত্যাদি বিভিন্ন কোষের মধ্যবর্তী তরল কলা রস বা লসিকার মধ্যে প্রবেশ করে। লসিকার মাধ্যমে এই সকল খাদ্যবস্তু কোষ কর্তৃক গৃহীত হয় এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড ও বিভিন্ন বর্জ্য পদার্থ বিপরীতভাবে রক্তে প্রবেশ করে। রক্ত জালকের মধ্য দিয়ে শিরায় প্রবাহিত হয়ে অবশেষে হৃদযন্ত্রে উপস্থিত হয়। সুতরাং রক্ত সংবহনতন্ত্র—(১) হৃদযন্ত্র, (২) ধমনী ও শিরার দ্বারা গঠিত।

প্রাণীদের সংবহন

অ্যামিবা ও অন্যান্য নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর সংবহন: অতি ক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক প্রাণীদের কোনও সংবহনতন্ত্র থাকে না। এই সকল প্রাণীর **ব্যাপন-প্রক্রিয়ায়** গৃহীত অক্সিজেন ও খাদ্যদ্রব্য কোষের মধ্যে সাইটোপ্লাজমের চলনের ফলে সর্বত্র সরবরাহ হয়। অ্যামিবা, প্যারামেসিয়াম, ইউগ্লিনা ও অন্যান্য আদ্যপ্রাণীর দেহের খাদ্য-গহ্বরের মধ্যে খাদ্য পরিপাক হওয়ার সময় সাইটোপ্লাজমের প্রবাহের ফলে একস্থান থেকে অন্যস্থানে ঘুরতে থাকে। এই সময় জীর্ণ খাদ্য হতে পুষ্টিসাধক খাদ্যের সারাংশ ব্যাপন ক্রিয়ায় সাইটোপ্লাজমে সরবরাহ এবং অজীর্ণ খাদ্য, কার্বন ডাই-অক্সাইড ও বর্জ্য-পদার্থ একই উপায়ে জলের মধ্যে পরিত্যক্ত হয়।

স্পঞ্জ, হাইড্রা ও প্ল্যানেরিয়া ইত্যাদি প্রাণীর সংবহন: স্পঞ্জ বহুকোষী **ছিদ্রাল** পর্বের প্রাণী, তাদের দেহের অভ্যন্তরে অসংখ্য জলবাহী নালী

থাকায় এবং দেহের অভ্যন্তরে কোয়ানোসাইট নামক কোষের সূত্রাকার ফ্ল্যাজেলার সঞ্চালনে জলপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। জলের সাথে বিভিন্ন খাদ্যবস্তু ও জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশের পর খাদ্যবস্তু অ্যামিবার ন্যায় কোষের দ্বারা গৃহীত ও জীর্ণ হয়। জীর্ণ খাদ্যের পুষ্টিসাধক বস্তু দেহের বিভিন্ন কোষে সরবরাহ এবং কোষের উৎপন্ন বর্জ্য পদার্থসমূহ জলের মধ্যে পরিত্যক্ত হয়। কোষ দ্বারা অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই-অক্সাইডের বিনিময়ও ঘটে। **হাইড্রা** নামক **একনালীদেহী** প্রাণীদেরও স্পঞ্জের মত একই উপায়ে অক্সিজেন ও খাদ্যবস্তু গ্রহণ এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড ও বর্জ্যবস্তু পরিত্যক্ত হয়।

প্ল্যানেরিয়া নামক চ্যাপ্টা দেহবিশিষ্ট প্ল্যাটিহেলমিনথেস জাতীয় প্রাণীর কোনও নির্দিষ্ট সংবহনতন্ত্র থাকে না। এদের দেহের অভ্যন্তরে বিভিন্ন যন্ত্রের মধ্যে অল্প পরিমাণ তরল পদার্থ থাকে এবং দেহের অত্যধিক সংকোচন ও প্রসারণের দ্বারা এই তরল পদার্থের সংবহন ঘটে। এদের দেহের পাতলা ত্বকের সাহায্যে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড বিনিময় ঘটে এবং বহু ভাগে বিভক্ত অন্ত্রের সাহায্যে খাদ্যবস্তু দেহের সর্বত্র বাহিত হয়।

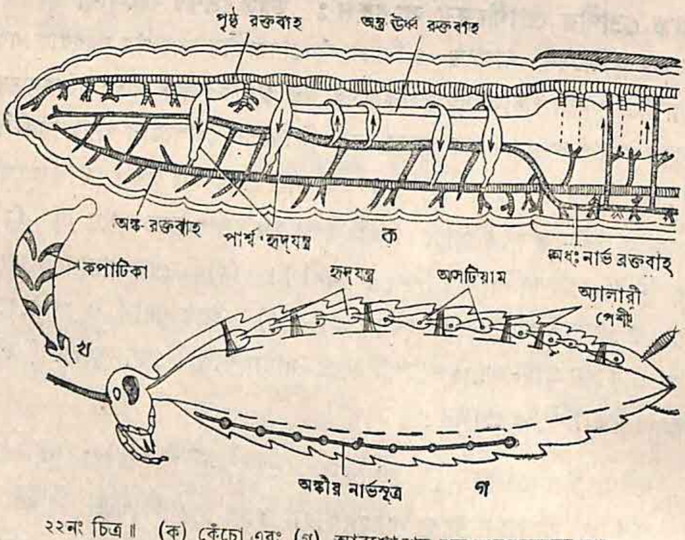
উন্নত শ্রেণীর প্রাণীদের সংবহন ঃ উন্নত শ্রেণীর বহুকোষী প্রাণীদের ক্ষেত্রে দেহের সর্বত্র অক্সিজেন, খাদ্যবস্তু ও বিভিন্ন অত্যাবশ্যকীয় পদার্থের সরবরাহ এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড ও বর্জ্য পদার্থসমূহ দূরীকরণের জন্য সুপরিকল্পিত স্বতন্ত্র সংবহনতন্ত্র থাকে। এই প্রকার আদর্শ সংবহনতন্ত্রের দক্ষতা কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দ্বারা নির্ধারিত হয়। যথা— (১) বিভিন্ন প্রকার অত্যাবশ্যক বস্তু সংবহনের জন্য তরল পদার্থ প্রয়োজন যার মধ্যে বস্তুগুলি দ্রবীভূত হতে পারে (এই তরল বস্তু রক্তও হতে পারে)। (২) তরল পদার্থের নির্দিষ্ট বাহিকা থাকে (শিরা ও ধমনী)। (৩) তরল পদার্থকে চাপের দ্বারা চালনার জন্য চাপসৃষ্টিকারী যন্ত্র (হৃদযন্ত্র) এবং (৪) তরল পদার্থ ও পরিবেশের মধ্যে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড বিনিময়ের মাধ্যমরূপে বিশেষ যন্ত্রের (ত্বক, ফুলকা এবং ফুসফুস ইত্যাদি) প্রয়োজন।

সংবহনতন্ত্রের প্রকার ঃ উচ্চশ্রেণীর প্রাণীদের সংবহনতন্ত্র দুই প্রকারের। **প্রথম প্রকার সংবহনতন্ত্রে** সংবহনকারী তরল পদার্থ সর্বদা নির্দিষ্ট বাহিকার মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে আদর্শ সংবহনতন্ত্রের সকল কার্য সম্পন্ন করে। এই প্রকার সংবহনতন্ত্রকে **রুদ্ধ বা বদ্ধ সংবহনতন্ত্র** (Closed circulatory system) বলে।

দ্বিতীয় প্রকার সংবহনতন্ত্রের তরল পদার্থ বাহিত হওয়ার সময় কিছু অংশ নির্দিষ্ট বাহিকার দ্বারা এবং কিছু অংশ দেহগহ্বর বা সিলোমের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়। এই প্রকার সংবহনতন্ত্রকে **মুক্ত সংবহনতন্ত্র** (Open circulatory system) বলে।

কেঁচোর রক্ত সংবহন ঃ কেঁচোর সংবহনতন্ত্র অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ও জটিল কিন্তু এই সংবহনতন্ত্রে আদর্শ সংবহনতন্ত্রের সকল বৈশিষ্ট্যগুলি উপস্থিত। কেঁচোর সংবহনতন্ত্রের তরল পদার্থকে রক্ত বলে। এই রক্তের মধ্যে জলের পরিমাণ অধিক এবং জলের মধ্যে দ্রবীভূত বিভিন্ন গ্যাস, শর্করা, অ্যামাইনো অ্যাসিড, লবণ ও অক্সিজেন বহনকারী রঙ্গক পদার্থ—হিমোগ্লোবিন থাকে। **হিমোগ্লোবিন কোনও কণিকার মধ্যে আবদ্ধ থাকে না, প্লাজমায় দ্রবীভূত থাকায় রক্তের বর্ণ লাল হয়।**

কেঁচোর রক্ত সর্বদাই নলাকার বদ্ধ বাহিকার দ্বারা দেহের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রবাহিত হয়। কয়েকটি প্রধান রক্তবাহিকা অপেক্ষাকৃত ছোট বাহিকায় এবং অবশেষে ছোট বাহিকাগুলি কোষের মধ্যে অক্সিজেন ও খাদ্যবস্তু সরবরাহ করে। কোষের মধ্যে বিপাকীয় ক্রিয়ায় উৎপন্ন বর্জ্যবস্তু ও কার্বন ডাই-অক্সাইড একই উপায়ে জালকের



২২নং চিত্র॥ (ক) কেঁচো এবং (গ) আরশোলার রক্ত সংবহনতন্ত্রের দৃশ্য.
(খ) কেঁচোর পার্শ্ব হৃদযন্ত্রের আভ্যন্তরিক গঠনের চিত্র।

রক্তের মধ্যে ফিরে আসে। রক্ত সংবহনের জন্য চাপসৃষ্টিকারী চার জোড়া পার্শ্বনালী বা পার্শ্ব **হৃদযন্ত্র** (Lateral hearts) সংকোচন-প্রসারণ দ্বারা রক্তকে অঙ্কীয় রক্ত-

বাহিকায় (Ventral blood vessels) প্রবাহিত করে। অঙ্কীয় রক্তবাহিকা দেহের উভয় প্রান্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখাবাহিকার মাধ্যমে এবং অবশেষে জালক দ্বারা কোষের মধ্যে রক্ত সরবরাহ করে। জালকগুলি পুনরায় সংযুক্ত হয়ে ক্ষুদ্র বাহিকা এবং এই বাহিকাগুলি মিলিত হয়ে পৃষ্ঠ রক্তবাহিকা (Dorsal blood vessels) উৎপন্ন করে। পৃষ্ঠ রক্তবাহিকার সংকোচন-প্রসারণের ফলে রক্ত পার্শ্ব হৃদযন্ত্রে পুনরায় প্রবেশ করে। কেঁচোর রক্ত সংবহন বদ্ধ বাহিকার মাধ্যমে বাহিত হয় বলে এই প্রকার **সংবহনকে বদ্ধ সংবহন বলে।**

আরশোলার রক্ত সংবহন : আরশোলার রক্ত সংবহনে রক্ত একটি নির্দিষ্ট পথ বদ্ধ বাহিকার মাধ্যমে এবং পরবর্তী অংশ **সিলোম বা দেহগহ্বরের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়।** এইজন্য আরশোলার রক্ত সংবহনকে মুক্ত সংবহন বলে। আরশোলার দেহগহ্বরের মধ্যে বিভিন্ন দেহযন্ত্র থাকায় দেহগহ্বর কয়েকটি প্রকোষ্ঠ বা **সাইনাসে** (Sinus) বিভক্ত হয়।

আরশোলার সংবহনতন্ত্রের বদ্ধ অংশটি পৃষ্ঠদেশ বরাবর একটি দীর্ঘ **নলাকার হৃদযন্ত্র** এবং মহাধমনীর দ্বারা গঠিত। হৃদযন্ত্রটির উভয় পার্শ্বে **সংকোচনশীল অ্যালারী পেশী** থাকায় হৃদযন্ত্রের সংকোচন-প্রসারণ ঘটে। হৃদযন্ত্রটির চারপাশ হার্দঝিল্লী দ্বারা আবৃত থাকে। হার্দঝিল্লী ও হৃদযন্ত্রের মধ্যবর্তী অঞ্চলকে **পেরিকার্ডিয়াল সাইনাস** (Pericardial sinus) বলে। আরশোলার বক্ষদেশ ও উদর তেরটি দেহখণ্ডকে বিভক্ত হওয়ায় **হৃদযন্ত্রটিও তেরটি প্রকোষ্ঠে** বিভক্ত। প্রতিটি প্রকোষ্ঠে একজোড়া ছিদ্র বা **অস্টিয়া** (Ostia) ও প্রতি ছিদ্র একজোড়া **কপাটিকা** (Valve) যুক্ত হয়।

হৃদযন্ত্রের সংকোচন ও প্রসারণের ফলে হিমোসিলের (যে দেহগহ্বরে রক্ত বাহিত হয়) এবং রক্ত ও বিভিন্ন দেহযন্ত্রের কোষগুলির মধ্যে বিভিন্ন পদার্থের বিনিময় ঘটে। দেহের বিভিন্ন পেশীর সংকোচনের ফলে রক্ত হিমোসিল থেকে পুনরায় পেরিকার্ডিয়াল সাইনাস ও অবশেষে হৃদযন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করে। **আরশোলার রক্তে কোন অক্সিজেন বহনকারী রঙ্গক পদার্থ থাকে না।** শ্বাসকার্যে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিবহন শ্বাসনালী বা ট্রাকিয়ার (Trachea) মাধ্যমে ঘটে এবং শ্বাসনালীগুলি দেহের সর্বত্র কোষের নিকটে প্রসারিত হয়। সুতরাং আরশোলার সংবহনতন্ত্রে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিবহনের জন্য শ্বাসতন্ত্র ও অন্যান্য বস্তু সংবহনের জন্য রক্ত সংবহনতন্ত্র, এই দুটি আলাদা তন্ত্র আছে।

বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীর রক্তসংবহন

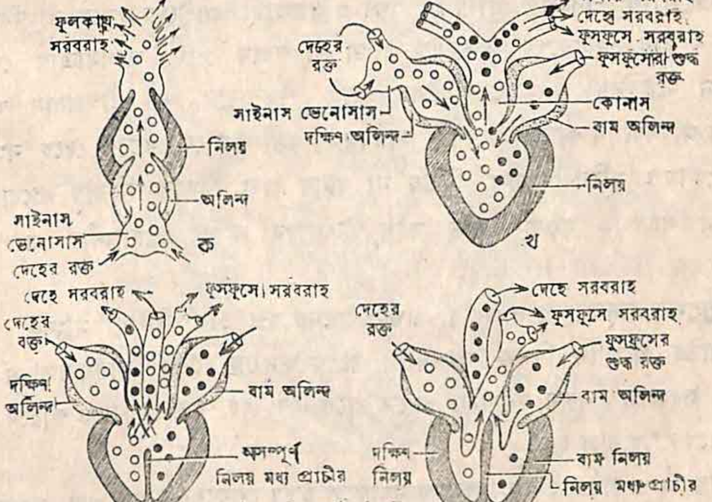
মেরুদণ্ডী প্রাণীদের রক্ত সংবহনতন্ত্র কেঁচোর মত **বদ্ধ সংবহনতন্ত্রের** অন্তর্ভুক্ত। মৎস্য হতে স্তন্যপায়ী পর্যন্ত বিভিন্ন প্রাণীর হৃদযন্ত্রের প্রকোষ্ঠ যথাক্রমে দুটি, তিনটি, চারটি অসম্পূর্ণ এবং অবশেষে চারটি সম্পূর্ণ প্রকোষ্ঠে বিভক্ত।

মৎস্য শ্রেণীর রক্তসংবহন—মাছের হৃদ্‌যন্ত্র **একটি অলিন্দ ও একটি নিলয় দ্বারা গঠিত।** দেহের বিভিন্ন প্রান্তের রক্ত শিরার দ্বারা বাহিত হয়ে অবশেষে পাতলা প্রাচীরযুক্ত অলিন্দের মধ্যে উপনীত হয়। অলিন্দের সংকোচনের ফলে রক্ত প্রসারিত নিলয়ের মধ্যে প্রবেশ করে। অলিন্দ-নিলয় মধ্যবর্তী ছিদ্রটি কপাটিকাযুক্ত থাকায় পেশীবহুল নিলয়ের সংকোচনের সময় রক্ত অলিন্দের মধ্যে ফিরে যেতে পারে না। রক্ত অঙ্কীয় ধমনীর সাহায্যে ফুলকার মধ্যে প্রবাহিত হয় এবং অঙ্কীয় ধমনীর উৎপন্ন স্থানে অনেকগুলি কপাটিকা থাকায় রক্ত ধমনী থেকে নিলয়ে ফিরতে পারে না। ধমনী ফুলকার মধ্যে জালকে বিভক্ত হয়ে রক্তের কার্বন ডাই-অক্সাইড জলে পরিত্যাগ ও জলের মধ্যে দ্রবীভূত অক্সিজেন রক্তের মধ্যে গ্রহণ করে। অক্সিজেনযুক্ত রক্ত বিভিন্ন ধমনীর সাহায্যে দেহের সর্বত্র কোষের নিকট প্রবাহিত হয়ে খাদ্যবস্তু ও অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড ও বর্জ্যবস্তুর বিনিময় করে। পরে দূষিত রক্ত শিরাতন্ত্রের মাধ্যমে হৃদযন্ত্রের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করে।

উভচর ও সরীসৃপের রক্তসংবহন ঃ উভচর শ্রেণীর প্রাণী **ব্যাঙের হৃদযন্ত্র দুটি অলিন্দ ও একটি নিলয় দ্বারা গঠিত।** দক্ষিণ অলিন্দে দেহের দূষিত ও বাম অলিন্দে শুদ্ধ রক্ত উপনীত হয়। উভয় অলিন্দ সংকোচনের ফলে দূষিত ও শুদ্ধ রক্ত নিলয়ের মধ্যে প্রবাহিত হয় এবং নিলয়ের সংকোচনের ফলে রক্ত একটি বাহিকার (কোনাস আরটেরিওসাস) মধ্যে প্রবেশ করে। বাহিকাটি দক্ষিণ ও বাম ভাগে (ট্রাঙ্কাস আরটেরিওসাস) বিভক্ত হয়ে অবশেষে প্রতি ভাগ ক্যারোটিড, সিসটেমিক ও পালমোনারি ধমনীতে বিভক্ত হয়। নিলয়ের মধ্যে দূষিত ও শুদ্ধ রক্তের কিছু পরিমাণ মিশ্রণ ঘটে যার ফলে দূষিত, মিশ্র ও বিশুদ্ধ রক্তরূপে প্রবাহিত হয়। দূষিত রক্ত পালমোনারি ধমনীর সাহায্যে ফুসফুস ও ত্বকের মধ্যে বাহিত হয়ে কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিত্যাগ ও অক্সিজেন গ্রহণ করে শুদ্ধ হয় এবং বাম অলিন্দে প্রত্যাবর্তন করে। সিসটেমিক ধমনী দেহের বিভিন্ন অংশে মিশ্ররক্ত এবং ক্যারোটিড ধমনী মুখমণ্ডল ও মস্তিষ্কে শুদ্ধ রক্ত বহন করে।

সরীসৃপ শ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে **টিকটিকি, গিরগিটি ইত্যাদির হৃদযন্ত্র দুটি**

অলিন্দ ও দুটি অসম্পূর্ণ নিলয় দ্বারা গঠিত। নিলয়ের অভ্যন্তরে নিলয় মধ্যবর্তী প্রাচীর অসম্পূর্ণ থাকায় অলিন্দ হতে প্রবাহিত দূষিত ও শুদ্ধ রক্তের কিঞ্চিৎ মিশ্রণ ঘটে। নিলয়ের সংকোচনের ফলে অসম্পূর্ণ নিলয়-মধ্যবর্তী প্রাচীরটি অলিন্দ-নিলয় প্রাচীরের গায়ে লেগে যাওয়ায় নিলয় সম্পূর্ণরূপে দুভাগে বিভক্ত হয় এবং রক্তের মিশ্রণে বাধা পড়ে। দক্ষিণ নিলয়ের দূষিত রক্ত ফুসফুসে এবং বাম নিলয়ের শুদ্ধ রক্ত দেহের সর্বত্র প্রবাহিত হয়। বাম নিলয়ের মিশ্রিত রক্ত দেহের মধ্যে প্রবাহিত হলেও সেই রক্তে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ অত্যল্প থাকায় কোনও অসুবিধা হয় না।



২৩নং চিত্র॥ বিভিন্ন প্রাণীর হৃদযন্ত্রের আভ্যন্তরীণ গঠনের দৃশ্য—(ক) মাছ, (খ) ব্যাঙ, (গ) সরীসৃপ এবং (ঘ) পক্ষী ও স্তন্যপায়ী।

পক্ষী ও স্তন্যপায়ীর রক্তসংবহন: পক্ষী ও স্তন্যপায়ীদের হৃদযন্ত্র **দুটি অলিন্দ ও দুটি নিলয়—মোট চারটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত।** নিলয় মধ্যবর্তী প্রাচীর সম্পূর্ণ হওয়ায় দূষিত ও শুদ্ধ রক্তের মিশ্রণ ঘটতে পারে না। দক্ষিণ অলিন্দ দেহের দূষিত রক্ত গ্রহণ করে দক্ষিণ নিলয়ে এবং বাম অলিন্দ শুদ্ধ রক্ত গ্রহণ করে বাম অলিন্দে প্রেরণ করে। বাম নিলয়ের শুদ্ধ রক্ত দেহের সর্বত্র ধমনীর সাহায্যে বাহিত হয় এবং দক্ষিণ নিলয়ের দূষিত রক্ত ফুসফুসের মধ্যে বাহিত হয়ে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও অক্সিজেনের বিনিময় ঘটায়।

অনুষ্ণ ও উষ্ণশোণিত-বিশিষ্ট প্রাণী (Cold-blooded & Hot-blooded animals) : যে সকল প্রাণীর দেহের তাপ তাদের পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তাদের **অনুষ্ণশোণিত-বিশিষ্ট প্রাণী** বলে। এইপ্রকার প্রাণীর রক্তের মধ্যে অক্সিজেন কম পরিমাণে থাকে এবং বিপাক ক্রিয়ায় অধিক অক্সিজেনের সরবরাহ না হওয়ায় অনুষ্ণশোণিত-বিশিষ্ট হয়। মাছ, ব্যাঙ ও সরীসৃপ ইত্যাদি শ্রেণীর প্রাণীরা অনুষ্ণশোণিত-বিশিষ্ট প্রাণী। অধিক শীত বা গরমে দেহের তাপ অত্যধিক পরিবর্তন হয় বলে শীতকালে ব্যাঙ শীতঘুম দেয়। গ্রীষ্মের অধিক উষ্ণতায় ব্যাঙ, সাপ ইত্যাদি প্রাণী দিনের বেলায় বেরোতে পারে না, রাত্রিকালে বেরোয়।

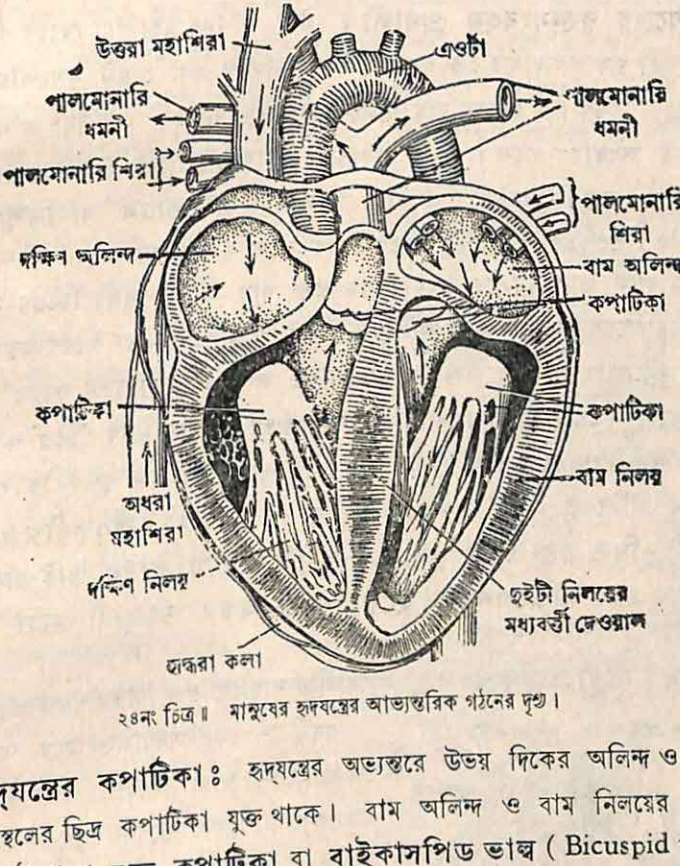
উষ্ণশোণিত-বিশিষ্ট প্রাণী : পক্ষী ও স্তন্যপায়ী প্রাণীদের দেহে তাপনিয়ামক ব্যবস্থা থাকায় পরিবেশের অত্যধিক ঠাণ্ডা বা গরমে দেহের তাপমাত্রার কোনও পরিবর্তন ঘটে না। এইজন্য এইসব প্রাণী শীতপ্রধান বা গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে সমভাবে জীবনযাপন করতে পারে। কারণস্বরূপ বলা যায় যে, এদের দেহে সংবহিত রক্তে কোনও দূষিত রক্তের মিশ্রণ না ঘটায় এবং বিপাক ক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সরবরাহ হওয়ায় দ্রুত তাপ উৎপাদন দ্বারা প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত হয়।

মানুষের হৃদ্‌যন্ত্রের বর্ণনা : রক্তসংবহনের জন্য চাপসৃষ্টিকারী মাংসল, ফাঁপা এবং বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে বিভক্ত স্পন্দনশীল যন্ত্রকে **হৃদ্‌যন্ত্র** বলে। মানুষ যতদিন বাঁচে ততদিন হৃদ্‌যন্ত্রের স্পন্দন নিয়মিত চলতে থাকে এবং এই স্পন্দন কোনও কারণে থেমে গেলে সাথে সাথে মৃত্যু হয়।

অবস্থান ও গঠন : বক্ষগহ্বরের মধ্যস্থলে উভয় ফুসফুসের মধ্যে এবং মধ্যচ্ছদার উপরে হৃদ্‌যন্ত্র অবস্থিত। ত্রিকোণাকার হৃদ্‌যন্ত্রের দেহসংলগ্ন প্রথম অংশটি বেশ প্রশস্ত এবং অগ্রভাগটি কিছুটা সরু। সমগ্র হৃদ্‌যন্ত্রটি পেরিকার্ডিয়াম (Pericardium) বা হার্দঝিল্লি নামক পাতলা পর্দায় আবৃত এবং এর মধ্যের রসকে **হার্দঝিল্লি রস** (Pericardial fluid) বলে। এই রসের পিচ্ছিলতায় হৃদ্‌যন্ত্র অনবরত স্পন্দিত হলেও কোন ক্ষয় হয় না। হৃদ্‌যন্ত্রের মাংসল পেশী হৃৎ-পেশীর দ্বারা গঠিত হওয়ার ফলে হৃদ্‌যন্ত্র অনবরত স্পন্দিত হলেও কখনও পরিশ্রান্ত হয় না।

হৃদ্‌যন্ত্রের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠ : হৃদ্‌যন্ত্রের অভ্যন্তরে চারটি প্রকোষ্ঠ আছে। উপরের দুটি প্রকোষ্ঠকে **অলিন্দ** (Auricle) এবং নিম্নের দুটিকে **নিলয়** (Ventricle) বলে। ডানদিকে অবস্থিত উপরের ও নীচের প্রকোষ্ঠ দুটিকে **ডান অলিন্দ** ও **ডান নিলয়** এবং বামদিকের দুটিকে **বাম অলিন্দ** ও **বাম নিলয়**

বলে। উভয় অলিন্দের মধ্যে অবস্থিত প্রাচীরকে অলিন্দ মধ্যবর্তী প্রাচীর (Inter-auricular septum) বলে এবং উভয় নিলয়ের মধ্যবর্তী প্রাচীরকে **নিলয় মধ্যবর্তী প্রাচীর** (Inter-ventricular septum) বলে।



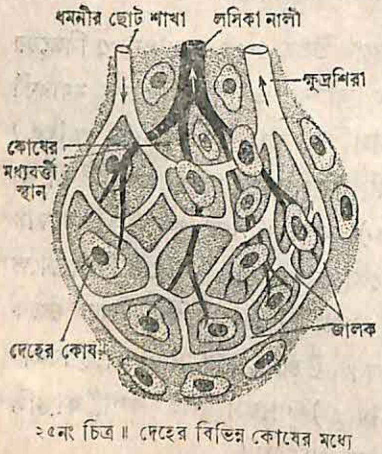
২৪নং চিত্র ॥ মানুষের হৃদযন্ত্রের আভ্যন্তরিক গঠনের দৃশ্য।

হৃদ্‌যন্ত্রের কপাটিকা ঃ হৃদ্‌যন্ত্রের অভ্যন্তরে উভয় দিকের অলিন্দ ও নিলয়ের সংযোগস্থলের ছিদ্র কপাটিকা যুক্ত থাকে। বাম অলিন্দ ও বাম নিলয়ের মধ্যবর্তী ছিদ্রে **দুইপাল্লা যুক্ত কপাটিকা** বা **বাইকাসপিড ভাল্ব** (Bicuspid valve) এবং দক্ষিণ অলিন্দ ও দক্ষিণ নিলয়ের ছিদ্রের কাছে **তিনপাল্লা যুক্ত কপাটিকা** বা **ট্রাইকাসপিড্ ভাল্ব** (Tricuspid valve) আছে। এই কপাটিকা থাকায় রক্ত অলিন্দ থেকে নিলয়ে এলে নিলয়ের সংকোচনে পুনরায় অলিন্দে ফিরে যেতে পারে না। বাম নিলয় থেকে **মহাধমনী** (Aorta) এবং দক্ষিণ নিলয় থেকে **ফুসফুসীয়** বা পালমোনারি ধমনী উৎপন্ন হয়। উভয় ধমনীর মুখের কাছে তিনটি করে অর্ধচন্দ্রাকার কপাটিকা (Semi-lunar valves) থাকে। এই কপাটিকাগুলি থাকায় ধমনীতে প্রবাহিত রক্ত নিলয়ে ফিরে আসতে পারে না।

হৃদ্‌যন্ত্রে রক্ত সরবরাহঃ দেহের অগ্রবর্তী অঞ্চলের **উর্ধ্ব মহাশিরা** এবং পশ্চাৎ অঞ্চলের **নিম্ন বা অধরা মহাশিরা ডান** অলিন্দে এবং চারটি ফুসফুসীয় মহাশিরা বাম আলিন্দে চারটি ভিন্ন ভিন্ন ছিদ্র দ্বারা উন্মুক্ত হয়।

হৃদ্‌যন্ত্রের রক্তসংবহন প্রণালীঃ উর্দ্ধ ও নিম্ন মহাশিরা দেহের অগ্রবর্তী ও পশ্চাদ্‌বর্তী অঞ্চলের দূষিত রক্ত হৃদ্‌যন্ত্রের ডান অলিন্দে এবং চারটি ফুসফুসীয় শিরা অক্সিজেনযুক্ত বিশুদ্ধ রক্ত হৃদয়ের বাম অলিন্দে বহন করে আনে। এই সময় অলিন্দ দুটি সম্প্রসারিত অবস্থায় থাকে। এই অবস্থাকে **ডায়াসটোলি** (Diastole) বা **সম্প্রসারণ** বলে। পরবর্তী অবস্থায় অলিন্দের **সংকোচন** বা **সিস্‌টোলি** (Systole) শুরু হয়। অলিন্দ সংকোচনের ফলে দূষিত রক্ত ডান অলিন্দ-নিলয় ছিদ্রের মাধ্যমে ডান নিলয়ে এবং বিশুদ্ধ রক্ত বাম অলিন্দ-নিলয় ছিদ্রের মাধ্যমে বাম নিলয়ে প্রবেশ করে। উভয় অলিন্দের রক্ত উভয় নিলয়ের মধ্যে প্রবেশ করার পর অলিন্দের সংকোচন সম্পূর্ণ হয়ে আবার সম্প্রসারিত অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করে। এবার উভয় নিলয়ের সংকোচনের বা সিস্‌টোলির ফলে উভয় অলিন্দ-নিলয় ছিদ্রে কপাটিকা থাকায় রক্ত অলিন্দে ফিরতে না পারায় ডান অলিন্দের দূষিত রক্ত ফুসফুসীয় ধমনীতে এবং বাম অলিন্দের বিশুদ্ধ রক্ত মহাধমনীতে প্রবেশ করে। **ফুসফুসীয় ধমনীর সাহায্যে দূষিত রক্ত উভয় ফুসফুসে প্রবাহিত হয়ে কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিত্যাগ এবং অক্সিজেনযুক্ত হয়ে বিশুদ্ধ হয়।** মহাধমনী দেহের বিভিন্ন প্রান্তে বিশুদ্ধ রক্ত পরিবহন করে।

দেহের মধ্যে রক্তসংবহনঃ মহাধমনীর সাহায্যে রক্ত বিভিন্ন শাখা ও প্রশাখা ধমনীতে রক্ত সঞ্চালিত হয়ে অবশেষে জালকের দ্বারা দেহের বিভিন্ন কলা ও কোষের মধ্যে প্রবেশ করে। এইভাবে বিশুদ্ধ রক্তের দ্বারা বাহিত অক্সিজেন ও বিভিন্ন অত্যাবশ্যকীয় বস্তুগুলি কোষ দ্বারা গৃহীত হয়। কোষের মধ্যে বিভিন্ন বর্জ্যবস্তু ও কার্বন ডাই-অক্সাইড জালকের রক্তের মধ্যে প্রবেশ করে। জালকের প্রাচীর ব্যাপন প্রক্রিয়ায় এই প্রকার বিনিময়ে সাহায্য করে। রক্তচাপের ফলে রক্তের মধ্যে জলীয় পদার্থ জালকের

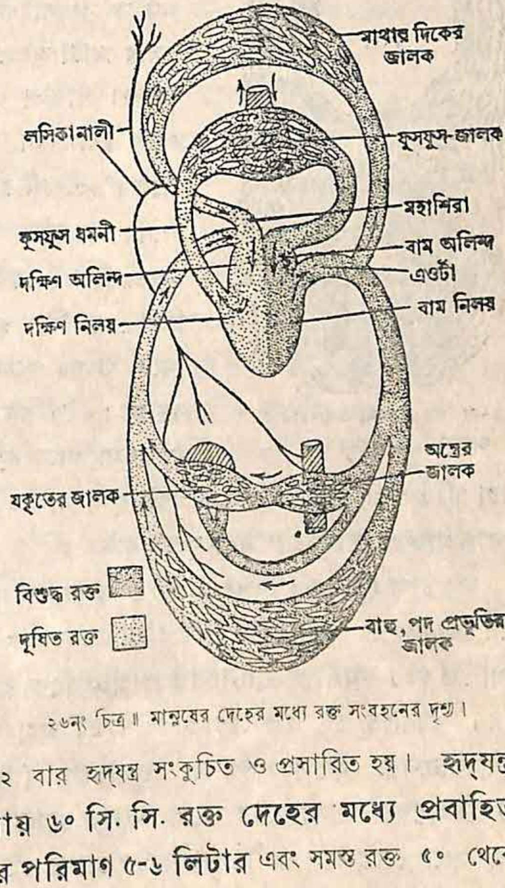


২৫নং চিত্র ॥ দেহের বিভিন্ন কোষের মধ্যে জালক গঠনের দৃশ্য।

প্রাচীরের মধ্যে অবস্থিত অতিক্ষুদ্র অসংখ্য ছিদ্রের মাধ্যমে পরিস্রাবণ দ্বারা ভেদ করে কোষগুলির অন্তর্বর্তী অঞ্চলে প্রবাহিত হয়—এই রসকে বহিঃকোষীয় তরল পদার্থ (Extracellular fluid) বলে। এই তরল পদার্থের মাধ্যমে বাহিত অক্সিজেন ও বিভিন্ন বস্তু কোষ গ্রহণ করে এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড ও বর্জ্যবস্তু পরিত্যাগ করে। বহিঃকোষীয় তরল পদার্থের মধ্যের বস্তুগুলি শিরা উৎপন্নকারী জালকের মাধ্যমে শোষিত হয় এবং যে অংশ শোষিত হয় না তা **লসিকা** (Lymph) উৎপন্ন করে।

সূক্ষ্ম জালকগুলি মিলিত হয়ে শিরা এবং শিরাগুলি মিলিত হয়ে শাখা-শিরা ও অবশেষে মহাশিরা উৎপন্ন করে। মহাশিরার মধ্যে লসিকা নালীর দ্বারা বাহিত বর্জ্যবস্তু মুক্ত হয়। অবশেষে ঊর্ধ্বমহাশিরা ও নিম্নমহাশিরা দক্ষিণ অলিন্দে দূষিত রক্ত বহন করে এবং এই দূষিত রক্ত শোধনের জন্য ফুসফুসীয় ধমনীর দ্বারা ফুসফুসে প্রেরিত হয়।

রক্তসংবহন সর্বদা বাহিকা নালীর মধ্যে সম্পন্ন হওয়ায় এই প্রকার সংবহনও **বদ্ধ শ্রেণীর**।

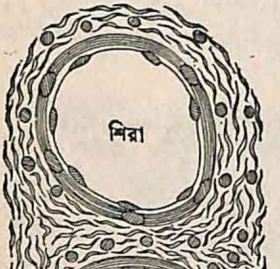


২৬নং চিত্র ॥ মানুষের দেহের মধ্যে রক্ত সংবহনের দৃশ্য।

হৃদ্‌যন্ত্রের সংকোচন-প্রসারণ ও নাড়ী ঃ সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষের বিশ্রাম অবস্থায় প্রতি মিনিটে প্রায় ৭২ বার হৃদ্‌যন্ত্র সংকুচিত ও প্রসারিত হয়। হৃদ্‌যন্ত্র প্রতিবার সংকোচন দ্বারা প্রায় ৬০ সি. সি. রক্ত দেহের মধ্যে প্রবাহিত করে। দেহের মধ্যে রক্তের পরিমাণ ৫-৬ লিটার এবং সমস্ত রক্ত ৫০ থেকে ৬০ বার হৃদ্‌যন্ত্র সংকোচনের ফলে দেহে প্রবাহিত হয়। হৃদ্‌যন্ত্রের সংকোচনের সাথে সাথে যে চাপের সৃষ্টি হয় তাতে রক্ত মহাধমনীর অভ্যন্তরে দ্রুত প্রবাহিত হয় এজন্য দেহের সর্বত্র ধমনীর প্রসারণ ঘটায় স্পন্দন অনুভূত হয়। কব্জির

ধমনীতে (Radial artery) আঙুল দিলে হৃদ্স্পন্দন অনুভব করা যায় এবং এই স্পন্দনকে **নাড়ী** (Pulse) বলে। অভিজ্ঞ চিকিৎসক নাড়ীর প্রসারণ ও সংকোচনের সংখ্যা ও তারতম্য দ্বারা রোগ নির্ণয় করতে পারেন।

রক্ত-বাহ (Blood vessels) : হৃদ্যন্ত্রের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠ, মহাধমনী, ধমনী ও শিরার অভ্যন্তরে অত্যন্ত মসৃণ একস্তরবিশিষ্ট আবরণী আছে। একে অন্তঃআবরণী কলা বা এণ্ডোথেলিয়াম (Endothelium) বলে। মহাধমনী বা ধমনীর প্রাচীরে এই এণ্ডোথেলিয়াম ব্যতীত সম্প্রসারণশীল তন্তুময় যোগকলা ও পেশী-কলার মোটা আস্তরণ থাকে। শিরার প্রাচীর ধমনী অপেক্ষা পাতলা এবং এণ্ডোথেলিয়াম-এর পরবর্তী অংশে যোগকলা ও পেশীকলা কম পরিমাণে থাকে। প্রতিটি রক্তবাহী নালী সম্প্রসারণশীল এবং শিরার অভ্যন্তরে বহু কপাটিকা থাকায় রক্তকে হৃদয়ের দিকেই কেবলমাত্র প্রবাহিত করে। সেজন্য শিরা কেটে গিয়ে রক্ত পড়া সুরু হলে শিরা যে দিক থেকে উৎপন্ন হয়েছে সেই দিকে বাঁধলে রক্ত পড়া বন্ধ হয়। কৈশিক জালকের প্রাচীরে যোগকলা বা পেশীকলা থাকে না, কেবলমাত্র অন্তঃআবরণী কলার দ্বারা গঠিত হয়। শুধুমাত্র অন্তঃআবরণী কলা থাকায় অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড, অন্যান্য খাদ্য ও বর্জ্যবস্তুর বিনিময় সহজে ঘটে।



২৭নং চিত্র ॥ ধমনী ও শিরার আভ্যন্তরিক গঠনের দৃশ্য

রক্তচাপ (Blood Pressure) : **রক্তচাপ কাকে বলে :** হৃদ্যন্ত্রের চাপের ফলে রক্ত সজোরে ধমনীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং ধমনীর প্রাচীর এই চাপের ফলে প্রসারিত হয়। **ধমনীর প্রাচীরের পার্শ্বচাপকে রক্তচাপ** (Blood pressure) বলে। ধমনীতে দুই প্রকারের চাপ অনুভব করা যায়। যথা—(১) **নিলয়ের সংকোচনের ফলে উৎপন্ন রক্তচাপ** (Systolic pressure) এবং (২) **নিলয়ের প্রসারণের ফলে উৎপন্ন রক্তচাপ** (Diastolic pressure)। নিলয় সংকোচনের ফলে ধমনীর প্রাচীরে যে চাপের সৃষ্টি হয় তা পূর্ণবয়স্ক মানুষের প্রায় ১২০—১৩০ মিলিমিটার পারদ চাপের সমান হয়। সাধারণত কোন মানুষের রক্তচাপ স্বাভাবিক অবস্থায় তার বয়সের সাথে ৯০ যোগ করলে যা হয় তার সমান। নিলয় প্রসারণকালে ধমনীতে যে পরিমাণ চাপ থাকে পূর্ণবয়স্ক মানুষে তার পরিমাণ প্রায়

৭৫—৮৫ পারদ চাপের সমান হয়। রক্তচাপমাপক যন্ত্র—**স্ফিগ্‌মো-ম্যানোমিটার** (Sphygmo-manometer) বা ধমনীপ্রেষ-মাপকের সাহায্যে মানুষের রক্তচাপ নির্ণয় করা হয়।

বিভিন্ন অবস্থায় রক্তচাপের পরিমাণঃ (১) স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের রক্তচাপ বেশী। (২) অল্পবয়স্ক ব্যক্তি অপেক্ষা বৃদ্ধের ধমনী-পেশীর কর্মক্ষমতা কম হওয়ায় রক্তচাপ বেশী। (৩) উত্তেজনায়, শারীরিক পরিশ্রমে ও ব্যায়ামের ফলে রক্তচাপ বেশী হয়। (৪) ঘুমিয়ে বা অনাহারে থাকলে রক্তচাপ কম হয়।

রক্তচাপের কার্যঃ (১) সুনির্দিষ্ট মাত্রায় চাপের সৃষ্টি করে দেহের বিভিন্ন অংশে রক্ত পরিবহনে সাহায্য করে। (২) যথেষ্ট চাপ উৎপন্ন দ্বারা কৈশিক বা জালকের আভ্যন্তরিক রক্ত থেকে কোষের মধ্যে খাদ্য প্রেরণ, লসিকা (Lymph) উৎপাদন ও বৃক্কের গ্লোমেরিউলাস থেকে মূত্র উৎপাদন ইত্যাদিতে সাহায্য করে। (৩) উচ্চ রক্তচাপ রক্ত সংবহনতন্ত্রের সঠিক অবস্থা এবং কোষ, কলা ও বিভিন্ন যন্ত্রাদির কার্যকারিতা নির্ণয়ে সাহায্য করে।

করোনারি (হৃদ্‌যন্ত্রে) **সংবহন** (Coronary circulation)**:** হৃদ্‌যন্ত্রের মাংসপেশী কার্যকর রাখার জন্য প্রচুর শক্তি ক্ষয় হয়। এই ক্ষয় পূরণের জন্য হৃদ্‌যন্ত্রে করোনারি ধমনীবাহিত রক্তের মাধ্যমে পুষ্টি ক্রিয়া ও কোষের শ্বাসক্রিয়ার নিমিত্ত অক্সিজেন সরবরাহ হয়। করোনারি ধমনীতন্ত্র ডান ও বাম **করোনারি ধমনীর** দ্বারা গঠিত। উভয় ধমনী মহাধমনী থেকে উৎপন্ন হয়ে হৃৎ-পেশীতে জালক উৎপন্ন দ্বারা রক্ত সরবরাহ করে। জালকগুলি মিলিত হয়ে হৃৎ-শিরার দ্বারা ডান নিলয়ে রক্ত বহন করে। কোনও কারণে করোনারি ধমনীর শাখা বা জালকের আভ্যন্তরিক গহ্বর জমাট রক্ত দ্বারা বন্ধ হয়ে গেলে রক্তচাপ বেড়ে ধমনী বা জালক ফেটে যেতে পারে এবং হৃদ্‌যন্ত্রে রক্ত সরবরাহ বন্ধ হয়ে মানুষ মারা যায়। এই অবস্থাকে **করোনারি থ্রম্বসিস** (Coronary thrombosis) বলে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

চলন ও গমন
(Movement & locomotion)

জীব ও জড়ের বিভিন্ন প্রভেদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে যে, জীববস্তুর চলন ক্ষমতা আছে জড়ের তা নেই। জীবনের ভৌত-ভিত্তিস্বরূপ প্রোটোপ্লাজম বিভিন্ন প্রকার বাইরের উত্তেজনা, যথা—তাপ, আলো, বিদ্যুৎ, অভিকর্ষ ও রাসায়নিক পদার্থ সংস্পর্শে সংবেদনশীল হয়। এই উত্তেজনায় জীব বা জীবের কোনও অংশ প্রোটোপ্লাজমের এই সংবেদনশীলতা দ্বারা পরিচালিত হয়ে বিশেষ সুবিধাজনক স্থানে সরে যায়। বাইরের উত্তেজনায় উদ্ভিদ বা প্রাণীর সাড়া দেওয়ার ক্ষমতাকে **উত্তেজিত্ব** বলে এবং এর ফলে তাদের নড়ন-চড়নকে **চলন** (Movement) বলে। জীবজগতে চলনের প্রধান উদ্দেশ্যগুলি যথাক্রমে—আত্মরক্ষা, খাদ্য সংগ্রহ, সঙ্গী নির্বাচন এবং বংশ বিস্তার।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু (১৮৫৮-১৯৩৭) প্রথম বাঙ্গালী বিজ্ঞানী যিনি বহুগবেষণার জন্য বিদেশে দেশের মুখোজ্জ্বল করেছিলেন। তিনি বিনাতারে বার্তা প্রেরণের যন্ত্র আবিষ্কারে মার্কনির পূর্বগামী তা প্রমাণিত হয়েছে। পরবর্তীকালে 'অব্যক্ত জীবন', 'জড় ও জীবের সাড়া' এবং উদ্ভিদবিষয়ক তাঁর বিভিন্ন গবেষণা বিখ্যাত হয়ে আছে। তিনি গবেষণা করে প্রমাণ করেন যে, উদ্ভিদেরাও প্রাণীদের মত বিভিন্ন প্রকার উত্তেজনা, যথা—তাপ, শৈত্য, রাসায়নিক বস্তু এবং আঘাতে সাড়া দেয়, ফলে উদ্ভিদের চলন ঘটে। তিনি স্ব-উদ্ভাবিত **রেজোনাণ্ট রেকর্ডার** ও **ক্রেসকোগ্রাফ** যন্ত্রের সাহায্যে উদ্ভিদের বিভিন্ন উত্তেজনায় প্রতিক্রিয়া এবং বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ধারণ করেন। ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় তাঁর প্রতিষ্ঠিত **'বসুবিজ্ঞান মন্দির'** গবেষণার ক্ষেত্রে জাতীয় গবেষণাগারগুলির মধ্যে বর্তমানে অগ্রগণ্য।

উদ্ভিদের চলন ঃ

অধিকাংশ উদ্ভিদ তাদের মূলের সাহায্যে মাটির সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং ঐ স্থানের মাটি ও বায়ুর মধ্য হতে তাদের প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহ করে জীবন ধারণ করে। এজন্য অধিকাংশ উদ্ভিদ নিশ্চল থাকে যদিও তাদের দেহের বিভিন্ন অংশ বহু-ভাবে প্রভাবিত হয়ে চলনক্রিয়ার দ্বারা সঞ্চালিত হয়। নিম্নশ্রেণীর অনেক উদ্ভিদ কিন্তু একস্থান থেকে অন্যস্থানে গমন করতে পারে। (১) নিম্নশ্রেণীর অনেক উদ্ভিদের প্রয়োজনে একস্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়াকে **সামগ্রিক চলন** বা **গমন** (Locomotion) এবং (২) উন্নত শ্রেণীর উদ্ভিদের সামগ্রিক চলন না হয়ে তাদের

মূল, কাণ্ড, শাখা-প্রশাখা বা পাতার আংশিক স্থানান্তরিত হওয়াকে **আংশিক চলন** বা **বক্রচলন** বলে।

উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রকার চলন ঃ

(১) **গমন বা সামগ্রিক চলন** (Movement of locomotion)

(ক) **স্বতশ্চলন** (Autonomous or Spontaneous movements) ঃ যে উদ্ভিদ বাইরের কোনও সর্তের উপর নির্ভর না করে নিজে থেকেই একস্থান থেকে অন্য স্থানে যায়, তাকে স্বতশ্চলন বলে। **ক্ল্যামাইডোমোনাস, ভলভক্স** ইত্যাদি শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদ চুলের ন্যায় সূক্ষ্ম সিলিয়ার (Cilia) সাহায্যে জলের মধ্যে ভেসে বেড়ায়। **মিক্সোমাইসেটিস** নামক নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ অ্যামিবা নামক প্রাণীর ন্যায় ক্ষণপদ বিস্তার করে গমন করে।

(খ) **আবিষ্ট চলন** (Tactic movements) : উদ্ভিদ বিভিন্ন প্রকার উদ্দীপক, যথা—জল, আলো, উষ্ণতা, রাসায়নিক পদার্থ, অভিকর্ষ ও স্পর্শ ইত্যাদির প্রভাবে যে চলনক্রিয়া করে তাকে **আবিষ্ট চলন** বা **ট্যাক্সিজম** (Taxism) বলে। অধিকাংশ এককোষী শৈবালের আলোর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত চলনকে **ফটোট্যাক্সিস** (Phototaxis) এবং উষ্ণতার প্রভাবে চলনকে **থারমোট্যাক্সিস** (Tharmotaxis) বলে। মস এবং ফার্ণ গাছের স্ত্রী-ধানীর রাসায়নিক বস্তুর প্রভাবে তাদের শুক্রাণুর চলনকে **কেমোট্যাক্সিস** (Chemotaxis) বলে।

আলোকাভিমুখী গমনের পরীক্ষা ঃ একটি চারকোণা কাচের জারের মধ্যে জলে কিছু পরিমাণ ক্ল্যামাইডোমোনাস ও ভলভক্স ইত্যাদি রাখা হল। পরে একদিক খোলা একটি বাক্সের মধ্যে জারটি রাখলে কিছু পরে বাক্সের যে দিকটি খোলা থাকায় আলো প্রবেশ করে সেইদিকে উক্ত শৈবালগুলি অবস্থান করছে দেখা যায়। জারটি পুনরায় অন্যদিকে ঘুরিয়ে রাখলে আবার শৈবালগুলি আলোকিত অংশে জমা হয়েছে দেখা যাবে। এর কারণ ঐ শৈবালগুলি সালোকসংশ্লেষের জন্য আলো দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আলোকিত অঞ্চলে গমন করেছে।

(২) **আংশিক বা বক্রচলন ঃ** যে সব উদ্ভিদ মাটির সাথে মূল দ্বারা যুক্ত তারা স্থানান্তরে যেতে পারে না তাদের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চলনক্রিয়া করতে পারে, এই প্রকার চলনকে আংশিক বা **বক্রচলন** বলে। বক্রচলনেও উদ্দীপক ব্যতীত **স্বতশ্চলন** ও **অবিষ্ট চলন** হয়।

(ক) **স্বতঃস্ফূর্ত বক্রচলন ঃ** এই প্রকার চলন আবার দুইভাবে ঘটে। **প্রথম প্রক্রিয়াটিতে** উদ্ভিদ কোষের মধ্যে অধিক জল গ্রহণের ফলে রসস্ফীতি ঘটে যে চলন

হয় তাকে **রসস্ফীতিজনিত চলন** (Turgor movement) বলে। উদাহরণ—টেলিগ্রাফ গাছের (বন-চাঁড়াল) পাতা। **দ্বিতীয় প্রকার** চলনে উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির সময় উদ্ভিদ দেহের কোনও অংশের বৃদ্ধি অসমান হলে সেই স্থানের বক্রচলন হয়, এই প্রকার চলনকে **বৃদ্ধিজ চলন** বলে। বৃদ্ধিজ চলনে যে সকল উদ্ভিদের কাণ্ড নরম এবং অন্য কোনও বস্তুকে আশ্রয় করে উপরের দিকে উঠতে পারে (এদের বল্লীজাতীয় উদ্ভিদ বলে। তাদের দেহের উভয় দিক পর্যায়ক্রমে বাড়তে থাকায় উদ্ভিদকাণ্ড এঁকে-বেঁকে আশ্রয়ের চারদিকে জড়িয়ে ধরে, এই চলাকে **নুটেশান** (Nutation) বলে। আবার অনেক উদ্ভিদের একদিকেই কেবল বাড়তে থাকলে উদ্ভিদটি সর্পিলভাবে চলে, একে **সারকামনুটেশান** (Circumnutation) বলে। কলা, কচু ও ফার্ণ জাতীয় উদ্ভিদের পাতার নিচের পৃষ্ঠের কোষগুলি উপরের পৃষ্ঠের কোষ অপেক্ষা দ্রুত বাড়তে থাকায় পাতাগুলি পাকিয়ে থাকে পরে উপরের পৃষ্ঠের কোষ দ্রুত বাড়লে পাতার ফলক সমান্তরাল হয়। এই প্রকার চলনের প্রথম পর্যায়কে **হাইপোন্যাস্টি** (Hyponasty) এবং পরবর্তী পর্যায়কে **এপিন্যাস্টি** (Epinasty) বলে।



২৮নং চিত্র ॥ বন-চাঁড়াল পাতার রসস্ফীতিজনিত চলনের দৃশ্য।

(খ) **আবিষ্ট বক্রচলন :** আলো, জল, উষ্ণতা, অভিকর্ষ, স্পর্শ ও রাসায়নিক পদার্থের প্রভাবে উদ্ভিদ বা উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যে চলন হয় তাহাকে **আবিষ্ট বক্রচলন** বলে। বক্রচলন উদ্দীপকের **গতিপথ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলে তাকে ট্রোপিক চলন** (Tropic movement) বলে এবং **বিভিন্ন প্রকার উদ্দীপক অনুযায়ী যে চলন হয় তাকে ব্যাপ্তিচলন** বা **ন্যাস্টিক চলন** (Nastic movement) বলে।

(১) **ট্রোপিক চলন :** এই প্রকার চলনেও উদ্দীপক অনুযায়ী উদ্ভিদের অঙ্গে বিভিন্ন প্রকার চলন হয়। নিম্নে বিভিন্ন প্রকার ট্রোপিক চলনের বর্ণনা করা হল।

(ক) **আলোকবৃত্তি** বা **ফটোট্রোপিজম** (Phototropism) : উদ্ভিদের অঙ্গ আলোর দ্বারা আবিষ্ট হয়ে আলোর গতিপথের দিকে বা বিপরীত দিকে ধাবিত হয়, এই প্রকার চলনকে **আলোকবৃত্তি** বলে। আলোকবৃত্তি চলনে সূর্যালোক উদ্দীপকরূপে কাজ করায় কাণ্ডের বর্ধনশীল অঞ্চল সূর্যালোকের গতিপথের দিকে এবং

মূল বিপরীত বা অন্ধকারের দিকে ধাবিত হয়। এজন্য কাণ্ডের বর্ধনশীল অংশকে **আলোক অনুকূলবর্তী** এবং মূলকে **আলোক প্রতিকূলবর্তী** বলা হয়। তীব্র আলোক অনেক সময় উদ্ভিদকাণ্ডকে আলোক প্রতিকূলবর্তী করে।

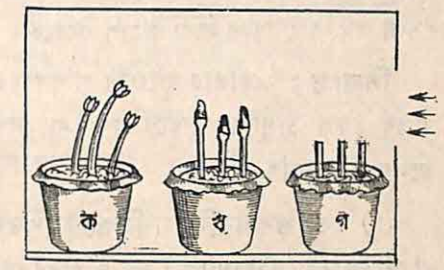
আলোকবৃত্তির পরীক্ষা ঃ

উদ্ভিদের প্রাথমিক কাণ্ডই আলোকের অনুকূলে ধাবিত হয় ঃ

পরীক্ষা ঃ একটি টব কিছু পরিমাণ মাটির দ্বারা ভর্তি করে কয়েকটি অঙ্কুরিত ছোলা লাগিয়ে জল দিলে কয়েকদিন পরে ছোট ছোট গাছ বেরোবে। অন্ধকার ঘরে একটিমাত্র জানলা খোলা রেখে টুলের উপর এই টবটি রাখতে হবে।

নিরীক্ষা ঃ কয়েকদিন পরে দেখা যাবে যে, চারা ছোলাগাছগুলির কাণ্ড জানলার যে দিক দিয়ে আলো আসছে সেই দিকে বেঁকে গেছে।

সিদ্ধান্ত ঃ এই পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কাণ্ড আলোক অনুকূলবর্তী অঙ্গ, সেইজন্য আলোক উৎসের দিকে ধাবিত হয়েছে।



২৯নং চিত্র ॥ (ক) উদ্ভিদ কাণ্ডের বর্ধনশীল অগ্রভাগে চলনের পরীক্ষা—স্বাভাবিক অবস্থা, (খ) অগ্র-ভাগ রাংতায় মোড়া থাকায় এবং (গ) কেটে দেওয়ায় কোন চলন হয় না।

উদ্ভিদ কাণ্ডের বর্ধনশীল অগ্রভাগে আলোকবৃত্তি দ্বারা চলন ঘটে ঃ এই পরীক্ষায় কয়েকটি অঙ্কুরিত ভুট্টা চারাযুক্ত তিনটি মাটির পাত্রের প্রয়োজন। প্রথম পাত্রে চারাগাছগুলি স্বাভাবিক অবস্থায়, দ্বিতীয় পাত্রে কাণ্ডের অগ্রবর্তী অঞ্চলকে সিগারেটের রাংতায় ঢাকতে এবং তৃতীয় পাত্রের চারাগুলির অগ্রবর্তী অঞ্চলটি ব্লেডের সাহায্যে কেটে দিতে হবে।

এখন এই পাত্রগুলি একটি একদিক খোলা বাক্সের মধ্যে কয়েকদিন রাখতে হবে। পরে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, বাক্সের যেদিক থেকে আলো প্রবেশ করছে সেইদিকে প্রথম পাত্রের চারাগাছগুলির অগ্রভাগ বেঁকে গেছে কিন্তু দ্বিতীয় বা তৃতীয় পাত্রের চারা-গাছগুলির অগ্রভাগ যথাস্থানে আছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কাণ্ডের অগ্রবর্তী বর্ধনশীল অঞ্চল আলোর প্রভাবে চলনক্রিয়া ঘটে। কাণ্ডের অগ্রবর্তী বর্ধনশীল অঞ্চলে **অক্সিন** নামে হরমোন (উত্তেজক রস) আলোক অনুকূলবর্তিতায় সাহায্য করে।

(খ) **জলবৃত্তি বা হাইড্রোট্রোপিজম** (Hydrotropism) : উদ্ভিদের অঙ্গের কোন অংশ জল দ্বারা প্রভাবিত হয়ে জলের দিকে ধাবিত হলে সেই প্রকার

চলনকে জলবৃত্তি বলে। উদ্ভিদের মূল সাধারণত জলের দিকে ধাবিত হয় বলে মূলকে **জল-অনুকূলবর্তী** এবং কাণ্ড জলের বিপরীতে ধাবিত হয় বলে কাণ্ডকে **জল প্রতিকূলবর্তী** বলে।

পরীক্ষা : কাঠের গুঁড়ো ভর্তি একটি চালুনির উপরে কয়েকটি ছোলাবীজ রেখে জল দিয়ে, চালুনিটি এই অবস্থায় কয়েক দিন ঝুলিয়ে রাখা হল। মাঝে মাঝে কাঠের গুঁড়োর উপর জল দেওয়া হতে লাগল।

নিরীক্ষা : কয়েকদিন পরে দেখা গেল যে, চালুনির ছিদ্রের মধ্য দিয়ে অঙ্কুরিত ছোলার মূল বেরিয়ে এসেছে। পরে এই মূলগুলি বেঁকে আবার চালুনির ছিদ্র দিয়ে ভেজা কাঠের গুঁড়োর মধ্যে প্রবেশ করেছে।

সিদ্ধান্ত : ছোলার মূলগুলি অভিকর্ষের জন্য প্রথমে চালুনির ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে আসে কিন্তু চালুনির বাইরে জল না থাকায় পুনরায় ভেতরে কাঠের গুঁড়োর মধ্যে জলের জন্য প্রবেশ করে।

(গ) **অভিকর্ষবৃত্তি** বা **জিওট্রোপিজম** (Geotropism) : পৃথিবীর আকর্ষণ বা অভিকর্ষের (Gravity) জন্য উদ্ভিদের যে চলন তাকে অভিকর্ষবৃত্তি চলন বলে। উদ্ভিদের মূল অভিকর্ষের দিকে ধাবিত হয় বলে, মূলকে **অনুকূল-অভিকর্ষী** (Positively geotropic) এবং কাণ্ড অভিকর্ষের বিপরীত দিকে ধাবিত হয় বলে **প্রতিকূল-অভিকর্ষী** (Negatively geotropic) বলে। অভিকর্ষবৃত্তি আলোক-বৃত্তির মত অক্সিন নামক হরমোনের উপর নির্ভরশীল এবং মূল ও কাণ্ডের অগ্রবর্তী অঞ্চলের পরেই অবস্থিত।

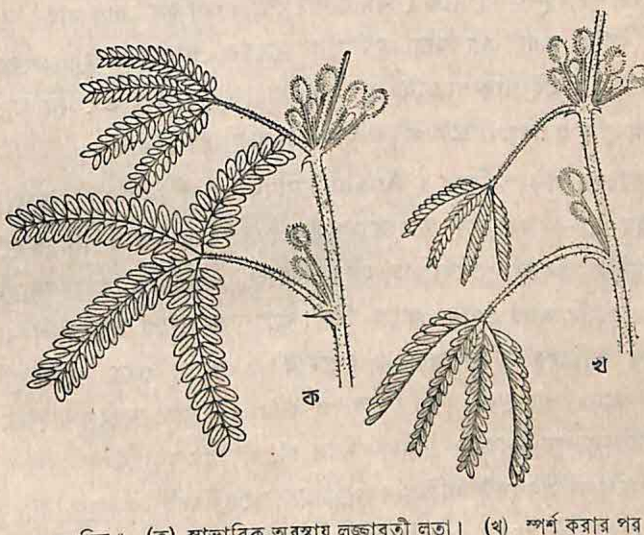
পরীক্ষা : ক্লাইনোস্ট্যাট (Clinostat) নামক যন্ত্রের সাহায্যে অভিকর্ষের পরীক্ষা করা হয়। এই যন্ত্রে একটি দণ্ডের একপাশে একটি বড় থালার মত অংশ থাকে এবং এই অংশে একটি সতেজ চারাগাছ টবসুদ্ধ আটকানো হয়। অপর প্রান্তে একটি নিয়ামক স্প্রীং লাগান ঘড়ির মত যন্ত্র থাকে যার দ্বারা থালা ও টবসুদ্ধ চারাগাছকে ঘণ্টায় চারবার ঘোরানো যায়। ক্লাইনোস্ট্যাট যন্ত্রটিকে মাটির উপরে অনুভূমিকভাবে রেখে স্প্রীংটি চালু করা হল এবং চাকতিসহ টব ও গাছটি ঘুরতে লাগল। এইভাবে কয়েদিন রাখা হল।

নিরীক্ষা : দেখা যাবে যে, গাছটি মাটির সাথে সমান্তরালভাবে বাড়ছে। যন্ত্রটি বন্ধ করে কয়েকদিন আগের অবস্থায় রাখলে চারাগাছের কাণ্ডটি ক্লাইনোস্ট্যাট যন্ত্রের সমকোণে বেঁকে গেছে দেখা যায়।

সিদ্ধান্তঃ যন্ত্রটি ঘোরার সময় অভিকর্ষের আকর্ষণ চারাগাছটির চারদিকে কার্যকরী হওয়ায় চারাগাছটি জমির সাথে সমান্তরালে বাড়ে। যন্ত্রটি বন্ধ রাখলে কাণ্ড প্রতিকূল অভিকর্ষী বলের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ভূমির সাথে সমকোণে বাড়ে এবং উপরের দিকে বেঁকে যায়।

(২) **ব্যাপ্তি চলন** বা **ন্যাস্টিক চলন** (Nastic movement) : উদ্ভিদের এই প্রকার বক্রচলন বিভিন্ন প্রকার উদ্দীপকের গতিপথের দ্বারা নির্ধারিত হয় না। কিন্তু উদ্দীপক যে-কোনও অঞ্চল থেকে আসুক না কেন তা উদ্ভিদের অঙ্গের সকল অংশকে সমানভাবে প্রভাবিত করে এবং তারা সকলে একদিকে চলে। উদ্দীপকের বিভিন্নতা অনুযায়ী ব্যাপ্তি চলন কয়েক প্রকারের, নিম্নে তাদের বর্ণনা দেওয়া হল—

(ক) **সিসমোন্যাস্টি** (Seismonasty) : এইপ্রকার চলন উদ্ভিদের কোনও অঙ্গে স্পর্শ বা আঘাত দ্বারা ঘটে। উদাহরণ—লজ্জাবতীর পাতায় হাত দিয়ে স্পর্শ করলে বা কোন কিছুর দ্বারা আঘাত করলে পাতাগুলি তৎক্ষণাৎ মুড়ে একত্রিত হয়।



৩০নং চিত্র ॥ (ক) স্বাভাবিক অবস্থায় লজ্জাবতী লতা। (খ) স্পর্শ করার পর লজ্জাবতী লতার পাতাগুলি জুড়ে গেছে।

(খ) **ফটোন্যাস্টি** (Photonasty) : আলোকের হ্রাস-বৃদ্ধির দ্বারা প্রভাবিত যে চলন তাকে **ফটোন্যাস্টি** বলে। আলোকের বৃদ্ধি বা তীব্রতা অনুযায়ী উদ্ভিদের ফুল ফোটানোর জন্য দলমণ্ডলের চলনই ফটোন্যাষ্টি। উদাহরণঃ সকাল বা সন্ধ্যার

সময় কম আলোর দ্বারা পদ্ম, শালুক ও কৃষ্ণকলির ফুল এবং বেলা দশটার সময় তীব্র আলোয় দুপুরে চণ্ডীর ফুল ফোটা ইত্যাদি।

(গ) **থারমোন্যাস্টি** (Thermonasty): তাপের হ্রাস ও বৃদ্ধির উপর এই প্রকার চলন ঘটে। দিনের বেলা তাপ বাড়বার সময় অনেক ফুল ফোটে এবং তাপ কমতে থাকলে ফুলের দলগুলি গুটিয়ে যায়। বেশীর ভাগ শীম্ব জাতীয় উদ্ভিদ (Leguminous) এবং আমরুল শাক ইত্যাদির পাতা বেশী তাপে ও অল্প তাপে গুটিয়ে যায় এবং একটি নির্দিষ্ট মাত্রার তাপে খোলা থাকে।

উদ্ভিদের বৃদ্ধিজ চলনে হরমোনের প্রভাব—নিম্নশ্রেণীর এককোষী বা বহুকোষী উদ্ভিদের সামগ্রিক চলন ব্যতীত উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদের বক্রচলন তার বর্ধনশীল কাণ্ড ও মূলের উপর নির্ভরশীল। উদ্ভিদের বৃদ্ধির সাথে বহু শারীরবৃত্তীয় জটিল ব্যাপার জড়িত। এই ব্যাপারগুলির মধ্যে গঠনমূলক ও ধ্বংসমূলক বিপাকীয় ক্রিয়া কাজ করে। গঠনমূলক বিপাকে (উপচিতি) বিভিন্ন প্রকার পুষ্টিসাধক বস্তু ও প্রোটোপ্লাজম উৎপন্ন হয় এবং ধ্বংসমূলক বিপাকে (অপচিতি) সেই সকল বস্তু ভেঙ্গে যায়। শ্বাসকার্য ধ্বংসমূলক বিপাক এবং এর দ্বারা বর্ধনশীল অংশের কোষের মধ্যে খাদ্যবস্তুর জারণে শক্তি উৎপন্ন হয়। এই শক্তি কোষ বিভাজন দ্বারা নূতন কোষ ও কোষ প্রাচীর সৃষ্টি এবং কোষের বৃদ্ধি ও রসস্ফীতিতে প্রযুক্ত হয়, ফলে উদ্ভিদের বৃদ্ধি ঘটে।

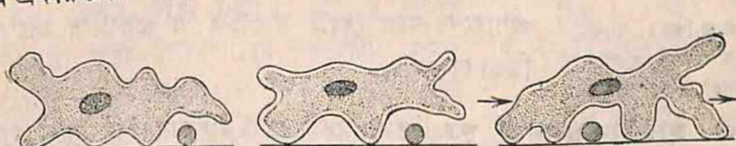
মূল ও কাণ্ডের বৃদ্ধি **অক্সিন** (Auxin) নামক রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। অক্সিন নামক হরমোন কাণ্ডের অগ্রবর্তী মুকুলের কাছে উৎপন্ন হয়ে নিচের দিকের বর্ধনশীল অঞ্চলে পরিবাহিত হয়। জীবের একটি অংশে কোন রাসায়নিক বস্তু উৎপন্ন হয়ে যদি অপর কোন অংশে ক্রিয়া করে তবে তাকে **হরমোন** বলে এবং অক্সিন হচ্ছে উদ্ভিদের বৃদ্ধির সহায়ক হরমোন। কাণ্ডের চেয়ে মূলের বৃদ্ধিতে অল্প পরিমাণ অক্সিনের প্রয়োজন হয়। মূল ও কাণ্ডের সকল অঞ্চলে যদি সমপরিমাণে অক্সিন সরবরাহ হয় তাহলে উদ্ভিদটি সরল আকারের হয়। কিন্তু উদ্ভিদের কোনও অঙ্গের একদিকে অক্সিন বেশী পরিমাণে সরবরাহ হলে, সেই অঞ্চলে বৃদ্ধির পরিমাণ অন্যদিকের চেয়ে বেশী হয়ে বক্র আকার ধারণ করে। আলো ও অভিকর্ষের দ্বারা উদ্দীপ্ত হয়ে উদ্ভিদের মূল বা কাণ্ডে এই প্রকার বক্র বৃদ্ধি ঘটে।

যদি একটি চারাগাছকে অনুভূমিক (মাটির সাথে সমান্তরাল)-ভাবে রাখা হয় যাতে অভিকর্ষ বল ক্রিয়া করতে থাকে, তাহলে কিছুক্ষণ পরে চারাগাছটির নীচের দিকে বেশী অক্সিন জমা হবে। এর ফলে কাণ্ডের নিচের দিকে বৃদ্ধির হার বাড়বে

এবং মূলের বৃদ্ধির হার কমবে। এইজন্য কাণ্ড বেঁকে অভিকর্ষতলের প্রতিকূলে উঠবে (প্রতিকূল-অভিকর্ষী) এবং মূল অভিকর্ষের অনুকূলে মাটির দিকে বাড়তে থাকবে। এইভাবে যদি গাছের একদিক আলোর দিকে থাকে তার বিপরীত দিকে অক্সিন জমে কাণ্ডের বৃদ্ধি ঘটবে এবং উদ্ভিদ আলোর দিকে বক্র চলন দ্বারা প্রসারিত হবে।

প্রাণীদের চলন ও গমন

প্রাণীদের চলন উদ্ভিদের চলন হ'তে স্বতন্ত্র, যদিও নিম্নশ্রেণীর কয়েকটি উদ্ভিদের সাথে নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর সাদৃশ্য আছে। **মিক্সোমাইসেটিস** নামক উদ্ভিদের মত **অ্যামিবা** নামক আদ্যপ্রাণীর চলন একইপ্রকার। ক্ল্যামাইডোমোনাস নামক এককোষী উদ্ভিদের যেমন সুতোর মত ফ্ল্যাজেলা আছে ইউগ্লিনা নামক এককোষা প্রাণীরও ফ্ল্যাজেলা আছে এবং উভয়েই ফ্ল্যাজেলা সঞ্চালনের দ্বারা একস্থান থেকে অন্যস্থানে গমন করে। কোন জীবের একস্থান থেকে অন্যস্থানে নিজের দেহ চালনা করার ক্ষমতাকে **গমন** (Locomotion) বলে। গমন হচ্ছে প্রাণীদের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য এবং এই প্রক্রিয়ার জন্য প্রাণীদের বিভিন্ন অঙ্গ থাকে, যথা—পা, ডানা, ফ্ল্যাজেলা, সিলিয়া ইত্যাদি। তবে কয়েকটি প্রাণীর গমন হয় না। যথা—স্পঞ্জ, প্রবাল। প্রাণীদের বিভিন্ন প্রকার চলন ও গমনের বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হল—



৩১নং চিত্র॥ অ্যামিবার চলনের বিভিন্ন পর্যায়—(ক) ক্ষণপদ সৃষ্টি, (খ) সম্মুখের বাধার উপর দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা এবং (গ) বাধা অতিক্রমের দৃশ্য।

(১) **অ্যামিবয়েড চলন:** অ্যামিবা নামক আদ্যপ্রাণীর দেহের পাতলা কোষপর্দা প্রসারণশীল হওয়ায় একদিকে স্ফীত হয়ে আঙুলের আকার ধারণ করে, একে **ক্ষণপদ** বলে। এই প্রকার ক্ষণপদের সাহায্যে অ্যামিবা ক্রমশঃ এগিয়ে যায় এবং আরেকটি ক্ষণপদ সাথে সাথে উৎপন্ন করে। এইভাবে একস্থান থেকে অন্যস্থানে গমন করে। আবার দুটি ক্ষণপদের সাহায্যে খাদ্যবস্তুকে ঘিরে খাদ্যগহ্বর সৃষ্টি করে। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের **শ্বেত রক্তকণিকাও** অ্যামিবার মত **ক্ষণপদ** সৃষ্টি করে একস্থান থেকে অন্যস্থানে গমন ও বহিরাগত রোগের জীবাণুকে ক্ষণপদের সাহায্যে ধ্বংস করে।

(২) **ফ্ল্যাজেলার দ্বারা চলন :** ইউগ্লিনা নামক এককোষী প্রাণীর দেহের একস্থান থেকে লম্বা সুতোর মত ফ্ল্যাজেলা উৎপন্ন হয়ে তার আন্দোলনের দ্বারা একস্থান থেকে অন্যস্থানে প্রাণী গমন করে। এই প্রকার চলনকে ফ্ল্যাজেলেটেড চলন বলে।



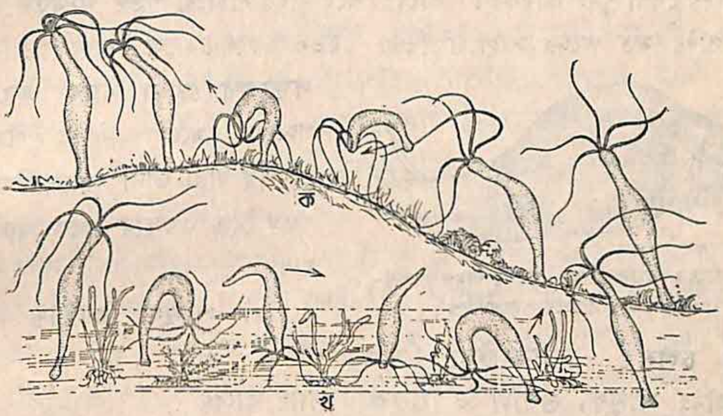
৩২নং চিত্র ॥ প্যারামেসিয়ামের সিলিয়ার সাহায্যে চলনের দৃশ্য।

(৩) **সিলিয়ার দ্বারা চলন :** প্যারামেসিয়াম, ভর্টিসেলা ইত্যাদি এককোষী প্রাণীদের চলন তাদের সারাদেহে আবৃত অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চুলের মত প্রোটোপ্লাজমীয় সিলিয়ার দ্বারা সংঘটিত হয়। বহু সিলিয়ার একত্রিত সঞ্চালনের ফলে প্রাণীগুলি জলের মধ্যে সহজেই একস্থান থেকে হতে অন্যস্থানে গমন করে। এই প্রকার চলনকে সিলিয়েটেড চলন বলে।

(৪) **মায়োনিম সূত্রের সাহায্যে চলন :** এককোষী **মনোসিস্টিস** নামক কেঁচোর শুক্রথলির অভ্যন্তরের পরজীবী প্রাণী এবং **ভর্টিসেলা** নামক প্রাণীদের দেহের অভ্যন্তরে মায়োনিম নামক পেশীসূত্রের সংকোচন ও প্রসারণের ফলে দেহটি সংকুচিত ও প্রসারিত হয়ে চলন ক্রিয়া চালায়।

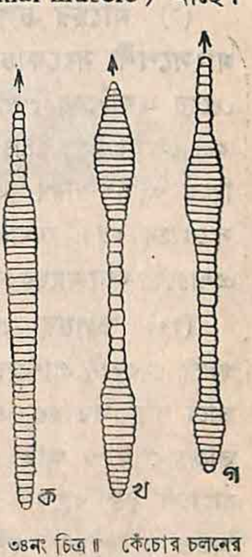
(৫) **হাইড্রার চলন :** ক্ষুদ্র একনালীদেহী প্রাণী হাইড্রার দেহের বহিঃকোষস্তর ও অন্তঃকোষস্তরে 'T' আকারের **এপিথেলিও মাসকিউলার** কোষের মধ্যে পেশীবহুল সংকোচক সূত্রগুলি এবং কর্ষিকার মধ্যে নিমাটোসিস্ট কোষগুলির সাহায্যে চলনক্রিয়া করে। হাইড্রা চলনকালে যে দিকে যায়, সেই দিকের এপিথেলিও মাসকিউলার কোষের মধ্যে পেশীসূত্র সংকোচনের ফলে দেহটি সেদিকে ঝুঁকে পড়ে এবং মাটির সাথে কর্ষিকাগুলি স্পর্শ করে। হাইড্রা তার দেহের নিম্ন অংশটি উঠিয়ে কর্ষিকার কাছে নিয়ে আসে এবং দেহের নিম্ন অংশটি মাটির সাথে বা অন্য কিছুর সাথে লাগিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। এই প্রকার চলনকে **লুপিং** বলে। অনেক সময় কর্ষিকা মাটির সাথে লাগিয়ে নিম্ন অংশটি উপরদিকে ঘুরিয়ে গন্তব্যস্থলের দিকে মাটির সাথে লাগিয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে। এই চলনকে **ডিগবাজি** বা **সমারসল্ট** (Somersault) বলে।

(৬) **কেঁচোর চলন ঃ** কেঁচোর দেহের প্রাচীরে **বৃত্তাকার পেশী** (Circular



৩৩নং চিত্র ॥ হাইড্রার চলন—(ক) লুপিং পদ্ধতি এবং (খ) ডিগবাজি পদ্ধতি।

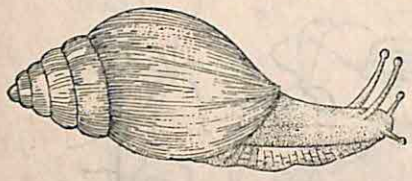
muscle) ও অভ্যন্তরে **অনুদৈর্ঘ্য পেশী** (Longitudinal muscle) আছে। বাইরের বৃত্তাকার পেশীর সংকোচনের ফলে দেহের অভ্যন্তরে তরল বস্তুর উপরে চাপ সৃষ্টি হয় এবং কেঁচোর দেহ লম্বা হয়। একইভাবে অভ্যন্তরে **অনুদৈর্ঘ্য পেশীর সংকোচনের ফলে দেহের দৈর্ঘ্য কমে যায়।** কেঁচোর দেহের বহিঃত্বকের মধ্যে S-আকারের কাইটিন নামক রাসায়নিক বস্তুর দ্বারা তৈরী **সিটা** আছে, এগুলি চলনে সাহায্য করে। চলনের সময় মাথার দিকের কয়েকটি দেহখণ্ডকের বৃত্তাকার পেশী সংকোচনের ফলে দেহটি লম্বা হয়ে এগিয়ে যায়, এই সময় অনুদৈর্ঘ্য পেশী প্রসারিত থাকে। এর পরেই ঐ স্থানের অনুদৈর্ঘ্য পেশীর এবং পরবর্তী খণ্ডকের বৃত্তাকার পেশীর সংকোচন হয়, আবার অনুদৈর্ঘ্য পেশী প্রসারিত হয়। এইভাবে পর পর খণ্ডকে সংকোচন ও প্রসারণ চলতে থাকায় এবং কাঁটার মত বহু সিটা মাটিতে আটকিয়ে কেঁচো একস্থান থেকে অন্যস্থানে গমন করে।



৩৪নং চিত্র ॥ কেঁচোর চলনের বিভিন্ন পর্যায়ের দৃশ্য।

(৭) **পতঙ্গের চলন ঃ** পতঙ্গের পাগুলি ভারবহনকারী **যান্ত্রিক লীভারের** (Lever) মত কাজ করে। এদের পাগুলি বাইরে কুত্তিকাবরণীতে ঢাকা থাকে এবং

পেশী সংকোচনের ফলে সীমাবদ্ধ চলনক্রিয়া চালায়। ক্ষুদ্র আকারের প্রাণী হলেও পতঙ্গদের পেশী খুবই কার্যকর। পায়ের শেষে নখের সাহায্যে পতঙ্গ অসমতল অঞ্চলে এবং গদির মত অঙ্গের সাহায্যে ভিজা সমতল অঞ্চলে চলাচল করতে পারে। বহু **পতঙ্গের ডানা** থাকে এবং বক্ষ-গহ্বরের মধ্যে বিভিন্ন **উড্ডয়ন পেশীর** দ্বারা ডানা আন্দোলিত হলে পতঙ্গ উড়ে একস্থান থেকে অন্য স্থানে যায়।



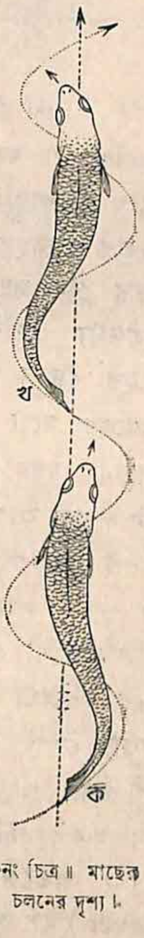
৩৫নং চিত্র ॥ অ্যাকাটিনার (স্থলচর শামুক) পেশী-বহুল পদের সাহায্যে চলনের দৃশ্য।

(৮) **শামুক জাতীয় প্রাণীদের চলন:** **অ্যাকাটিনা** (স্থলচর শামুক) ও জলাজমির **শামুক, গুগলি** ও **ঝিনুক** ইত্যাদি তাদের অঙ্কীয়দেশের প্রশস্ত পেশীবহুল পদের সাহায্যে একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাতায়াত করতে পারে।

(৯) **মাছের চলন:** মাছের চলন তার দেহের **মাংসপেশী সংকোচনের ফলে হয়।** প্রথমে মাছের দেহের একদিকের পেশীর সংকোচনের ফলে সেই দিক বক্র হয়ে লেজের উপর হঠাৎ চাপের সৃষ্টি করে এবং মাছ সামনের দিকে এগিয়ে যায়। একইভাবে মাছের অন্যদিকের পেশীর সংকোচন হয়। ক্রমাগত পেশীর এই প্রকার সংকোচন ও প্রসারণের ফলে মাছের চলনক্রিয়া ঘটে।

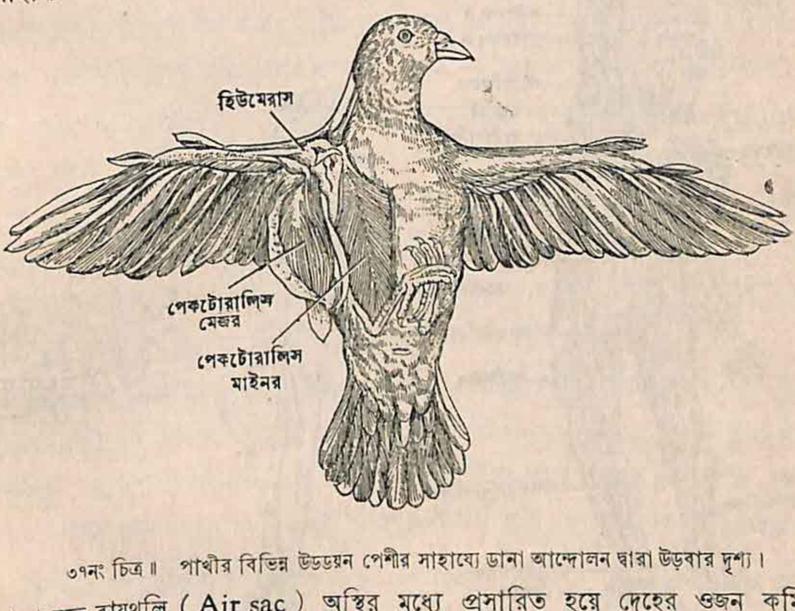
(১০) **স্থলচর প্রাণীর চলন:** বিভিন্ন প্রকার স্থলচর মেরুদণ্ডী প্রাণীদের চলনের জন্য তাদের পা বিশেষ-ভাবে পরিবর্তিত হয় এবং যে সকল অঙ্গের চলন হয় তাদের পেশী ও অস্থি কণ্ডরার টেনডনের (Tendon) সাহায্যে যুক্ত থাকে। স্থলচর প্রাণীর পশ্চাদপদই গমনাঙ্গ, সেজন্য পশ্চাদপদের গঠন মজবুত এবং দৈর্ঘ্যে অপেক্ষাকৃত বড় হয়।

(ক) **ব্যাঙের** পশ্চাদপদের উরুদেশের পেশী এবং পায়ের হাঁটুর নিচের পেশী শক্তিশালী হয়, পায়ের আঙুল-গুলি লম্বায় বড় এবং আঙুলের মধ্যে চর্মের সাহায্যে



৩৬নং চিত্র ॥ মাছের চলনের দৃশ্য।

হাঁসের পায়ের পাতার মত জোড়া থাকে। এই প্রকার অঙ্গকে **লিপ্তপাদ** বলে। ব্যাঙ এই প্রকার পায়ের সাহায্যে ভিজা বা কাদা মাটিতে এবং জলের মধ্যে স্বচ্ছন্দ গতিতে চলাচল করে। (খ) **সরীসৃপ** প্রাণীদের মধ্যে **সাপের পা নেই,** তারা বুকের কাছের **পেশী ও আঁশের** সাহায্যে অসমতল ভূমির উপর দিয়ে চলতে এবং টিকটিকি তার পায়ের তলায় **চোষকের** সাহায্যে দেওয়াল বেয়ে উঠতে পারে। (গ) **পাখীদের** উড়বার জন্য **অগ্রপদ ডানায়** রূপান্তরিত হয়। ডানার পালক অত্যন্ত হালকা এবং পালকগুলি পরস্পর এরূপে সাজানো যে, ডানা মেলে ধরলে বা আন্দোলিত করলে বাতাসের উপর দিয়ে স্বচ্ছন্দে উড়ে বা ভেসে যেতে পারে। ডানা দুটির আন্দোলন **উড্ডয়ন পেশীসমূহের** (Flight muscles) দ্বারা ঘটে। উড্ডয়ন পেশীর মধ্যে পেকটোরালিস মেজর নামক পেশী পাখীর ডানা নীচের দিকে এবং পেকটোরালিস মাইনর উপরের দিকে তুলতে সাহায্য করে। ফলে ডানা আন্দোলিত হয়ে পাখী উড়তে পারে। পাখীদের ফুসফুসের



৩৭নং চিত্র ॥ পাখীর বিভিন্ন উড্ডয়ন পেশীর সাহায্যে ডানা আন্দোলন দ্বারা উড়বার দৃশ্য।

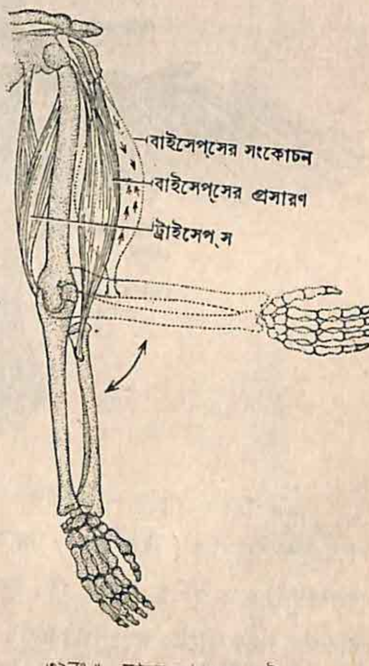
সাথে যুক্ত বায়ুথলি (Air sac) অস্থির মধ্যে প্রসারিত হয়ে দেহের ওজন কমিয়ে দেওয়ায় উড়তে সুবিধা হয়। (ঘ) **স্তন্যপায়ীদের** মধ্যে যারা দ্রুত ছুটতে পারে তারা দৌড়ানর সময় পায়ের আঙুলের উপর ভর দেয়, সমগ্র পায়ের পাতার উপর দেয় না। এই সব আঙুলের মধ্যে খর্বাকার আঙুলগুলি মাটিতে ঠেকাতে পারে না বলে চলাফেরার পক্ষে অনুপযুক্ত। গিনিপিগ ও খরগোসের চারটি, হরিণের দুটি এবং ঘোড়ার একটি

করে আঙুল পশ্চাদপদে থাকায় গিনিপিগ ও খরগোস অপেক্ষা হরিণ ও ঘোড়া দ্রত ছুটতে পারে।

প্রাণীদের চলন বা গমনে পেশীর কাজঃ অ্যামিবা ব্যতীত অন্যান্য নিম্নশ্রেণীর প্রাণীরা যথা, মনোসিষ্টিস্, ভর্টিসেলা, হাইড্রা ইত্যাদির কোষের সাইটো-প্লাজমের মধ্যে অবস্থিত সূক্ষ্ম মাইয়োনিম তন্তুর সংকোচন ও প্রসারণের ফলে চলন-ক্রিয়া ঘটে। আরও উন্নত শ্রেণীর প্রাণীদের দেহে বিভিন্ন পেশীও একইভাবে চলনে সাহায্য করে। কিন্তু স্থলচর মেরুদণ্ডী প্রাণীদের দেহের বিভিন্ন পেশীর কেবলমাত্র সংকোচন ও প্রসারণের ফলে চলন বা গমন হয় না কারণ চলন ও গমন অঙ্গের মধ্যে যে অন্তঃকঙ্কাল বা অস্থি থাকে তাকেই বিভিন্ন দিকে নাড়াতে পারলে চলন বা গমন হয়। সেইজন্য এই সকল প্রাণীর পেশীর একদিক টেনডনের সাহায্যে



৩৮নং চিত্র ॥ ক্রিকেট বল ছুঁড়বার সময় মানুষের বিভিন্ন পেশীর কার্যের দৃশ্য।



৩৯নং ॥ বাহুর সঞ্চালনে বাইসেপস এবং ট্রাইসেপস পেশীর কার্যের দৃশ্য।

অস্থির সাথে যুক্ত থাকে এবং অস্থিগুলি পরস্পর **"বল এবং সকেট"** (Ball

and Socket) ব্যবস্থার দ্বারা সংযুক্ত থাকে। বিভিন্ন অস্থির ও পেশীর সামঞ্জস্যপূর্ণ সংকোচন ও প্রসারণের ফলে চলন ও গমন ক্রিয়া ঘটে।

মানুষের চলন ও গমনে পেশীর কার্য ঃ মানুষের দেহে তিন প্রকারের পেশী আছে—যথা, অস্থির সঙ্গে যুক্ত কঙ্কাল পেশী (Skeletal muscle), হৃদ্‌যন্ত্রে অবস্থিত হার্দ পেশী (Cardiac muscle) এবং বিভিন্ন দেহযন্ত্রের আবরণীতে মসৃণ পেশী (Smooth muscle) থাকে। কিন্তু চলন বা গমনে কঙ্কাল পেশীর কাজই প্রধান।

মানুষের কঙ্কাল তরুণাস্থি ও অস্থির দ্বারা গঠিত। এই অস্থিগুলি পরস্পর সংযুক্ত থেকে কঙ্কালতন্ত্র উৎপন্ন করে এবং যোগকলা দ্বারা তৈরী সন্ধিবন্ধনী বা লিগামেণ্ট (Ligaments) দ্বারা সংযুক্ত থাকে। কঙ্কালের বিভিন্ন অংশের সঞ্চালন সেই স্থানের অস্থির সাথে সংযুক্ত বিভিন্ন পেশীর সংকোচন ও প্রসারণের দ্বারা সংঘটিত হয়। উদাহরণ-স্বরূপ বাহুর সঞ্চালন ক্রিয়ার বর্ণনা করলে পেশী ও কঙ্কালের কার্যকলাপ অনেকটা বুঝতে পারা যাবে। হাতের উর্ধ্ব বাহুর হিউমেরাস নামক অস্থি নিম্ন বাহুর রেডিয়াস ও আলনা নামক দুটি অস্থির দ্বিতীয়টির সাথে দরজার কব্জার মত সংযুক্ত থাকে। বাইসেপস নামক পেশী একপ্রান্তে হিউমেরাসের সাথে যুক্ত হয়ে অন্যপ্রান্তে রেডিয়াসের সাথে যুক্ত হয়। কনুই থেকে হাতের উত্তোলন বাইসেপস নামক ভাঁজকারক (Flexor) পেশীর সংকোচনের ফলে ঘটে কিন্তু ট্রাইসেপস নামক প্রসারক (Extensor) পেশীর কাজের ফলে কনুই আবার সোজা হয়। একইভাবে দেহের বিভিন্ন অংশের পেশীর সংকোচন ও প্রসারণের ফলে কঙ্কাল সঞ্চালিত হয়। কব্জার মত অস্থিসন্ধির অস্থিগুলি একটি নির্দিষ্ট পথে সঞ্চালিত হয়, অন্য কোনও দিকে হয় না।

গমনে ভারসাম্য রক্ষা ঃ মানুষ দুটি পায়ের সাহায্যে গমনাগমন করে এবং দুটি পা দেহকঙ্কালের পশ্চাৎ অংশের উভয় দিকে উপস্থিত থেকে বল ও সকেট পদ্ধতিতে সঞ্চালিত হয়, অপরদিকে দুটি হাত দেহের উভয় দিক থেকে দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে। সম্পূর্ণ গমনক্রিয়া কঙ্কাল পেশী ও স্নায়ুতন্ত্রের সম্মিলিত কাজের ফলে ঘটে।

পেশীর সংকোচন ঃ বহু ঐচ্ছিক পেশী অত্যন্ত দ্রুততার সাথে সংকুচিত হয়, যথা—১০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগীর পায়ের পেশী ১১ সেকেণ্ডে প্রায় ৩৩ বার সংকুচিত হয়। এর ফলে যে অক্সিজেন ক্ষয় হয় তা পূরণের জন্য দ্রুত শ্বাসক্রিয়া চলতে থাকে। পেশীর মধ্যে সমগ্র অক্সিজেন ব্যয় হয়ে কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয়, এর ফলে পেশীর গ্লাইকোজেনের পরিমাণ কমে যায় এবং ল্যাকটিক অ্যাসিড ও তাপ উৎপন্ন হয়।

ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের (Electron microscope) সাহায্যে গবেষণার দ্বারা জানা গেছে যে, পেশীকোষের সাইটোপ্লাজমের মধ্যে বহু সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মাইয়োফাইব্রিল (Myofibril) নামক সূত্র আছে এবং প্রতিটি মাইয়োফাইব্রিল দুই প্রকারের প্রোটিন তন্তুর দ্বারা গঠিত। এদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত স্থূলতন্তুকে **মাইয়োসিন** (Mysoin) এবং সরুগুলিকে **অ্যাকটিন** (Actin) বলে। অ্যাকটিন মাইয়োসিনের উভয় দিকে আলমারির **চলনশীল** (Sliding) পাল্লার মত এবং উভয় দিকের অ্যাকটিন মাইয়োসিনের মধ্যের অঞ্চলে বিযুক্ত থাকে। পেশীকোষ সংকোচনের সময় উভয় দিকের অ্যাকটিন চলমান হয়ে মাইয়োসিনের মধ্যে যুক্ত হয়। প্রসারণের সময় উভয় দিকের অ্যাকটিন বিযুক্ত হয়ে পূর্বাবস্থা ফিরে পায়।

ক্লান্তি (Fatigue) : পেশীর সংকোচনের সময় যে শক্তি ব্যয়িত হয় তা গ্লুকোজ দহনের ফলে পাওয়া যায়। ক্রমাগত সংকোচন-প্রসারণের ফলে পেশীর গ্লাইকোজেন (Glycogen) ও A. T. P. (অ্যাডেনোসিন্ ট্রাই-ফসফেট) নিঃশেষ হয় এবং অধিক ল্যাকটিক অ্যাসিড জমে যায়, এই অবস্থায় পেশীর সংকোচন হয় না। এই অবস্থাকে **ক্লান্তি** (Fatigue) বলে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলে ল্যাকটিক অ্যাসিড রক্তে মিশে যায় এবং পেশীর রক্ত থেকে গ্লুকোজ সরবরাহ হয়ে পেশীর কর্মক্ষমতা ফিরে আসে।

পেশী-সংকোচনে নার্ভ বা স্নায়ুর কাজ : কঙ্কাল পেশীর (Skeletal muscle) তন্তুগুলি একত্রে একটি আজ্ঞাবাহী নিউরন (Motor neurone) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। স্নায়ুর উত্তেজনা নার্ভ সূত্র দ্বারা পরিবাহিত হওয়ার সময় নার্ভ সূত্রে রাসায়নিক ও বৈদ্যুতিক পরিবর্তনের ফলে পেশীর সংকোচন ঘটে। অল্প পরিমাণ বা মাঝারি উত্তেজনায় পেশীর সংকোচন কম বা বেশী হয় কিন্তু উত্তেজনার পরিমাণ অত্যধিক হলে বা ক্রমাগত চলতে থাকলে পেশীর সংকোচন সৃষ্টি হয় কিন্তু প্রসারণ ঘটে না। এই অবস্থাকে "টিটেনাস" (Tetanus) বা ধনুষ্টংকার বলে। পেশীর সংকোচন বা প্রসারণ সেই পেশীর নার্ভদ্বারা ঘটে এবং কোনও কারণে সেই নার্ভ নষ্ট হলে বা কার্যকরী না থাকলে পেশীর সংকোচন ও প্রসারণ হয় না—এই অবস্থাকে **পক্ষাঘাত** বা **প্যারালিসিস** (Paralysis) বলে।

——

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রেচন
(Excretion)

জীব তাদের পরিবেশ থেকে শক্তি উৎপাদক বস্তু সংগ্রহ করে দেহের মধ্যে প্রেরণ করে। অবশেষে সেগুলি কোষের মধ্যে শোষিত হয়ে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় পরিবর্তিত হয়। এই সকল ঘটনা বিপাকক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত। এই প্রকার বিপাকক্রিয়ায় সকল প্রকার জীবের কোষের মধ্যে বহু অনাবশ্যক বর্জ্যপদার্থের সৃষ্টি হয়। এইসব বর্জ্যপদার্থের মধ্যে অনেক বস্তু শুধুমাত্র অনাবশ্যকই নয় অধিক পরিমাণে দেহে থাকলে মারাত্মক ক্ষতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। এজন্য এইসব ক্ষতিকর বস্তু দেহ থেকে বহিষ্করণ করাও জীবের প্রাত্যহিক জৈবিক ক্রিয়ার অন্যতম কার্য।

বিপাকক্রিয়ায় বিভিন্ন বর্জ্যপদার্থের মধ্যে **কার্বন ডাই-অক্সাইড, অ্যামোনিয়া ও জলের** পরিমাণই অধিক। তবে এই সকল পদার্থকে কেবলমাত্র বর্জ্যপদার্থ বললে হবে না, কারণ অল্প পরিমাণে এইসব পদার্থও জৈবিক কার্যে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, কার্বন ডাই-অক্সাইড শ্বসনের হার নিয়ন্ত্রণে এবং অ্যামোনিয়া যদিও খুবই বিষাক্ত পদার্থ কিন্তু অ্যামাইনো অ্যাসিড বিপাকের জৈববিক্রিয়ার প্রতিক্রিয়ারূপে কার্য করে। তবুও কোষের মধ্যে এই সকল পদার্থ প্রয়োজনের অধিক সঞ্চিত হওয়াই ক্ষতিকর।

সুতরাং **বিপাকক্রিয়ায় উৎপন্ন বিভিন্ন অপ্রয়োজনীয় বর্জ্যবস্তুর পরিবেশের মধ্যে প্রত্যাবর্তনকে রেচন (Excretion) বলে।** রেচন ক্রিয়ায় নিযুক্ত দেহের বিভিন্ন যন্ত্রকে **রেচনযন্ত্র** (Excretory organ) এবং এইসব যন্ত্র দ্বারা গঠিত তন্ত্রকে **রেচনতন্ত্র** (Excretory system) বলে।

জীবের বিভিন্ন রেচন পদার্থ ঃ (১) **কার্বন ডাই-অক্সাইড ঃ** শ্বাসক্রিয়ায় উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্সাইড জীবদেহ থেকে রেচিত হয়ে বায়ুর সাথে মিশে যায়। যদি কোনও কারণে এই কার্বন ডাই-অক্সাইড দেহ থেকে বেরোতে না পারে তাহলে দেহের অম্লত্ব বেড়ে বিপজ্জনক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

(২) **অ্যামোনিয়া, ইউরিয়া এবং ইউরিক অ্যাসিড ঃ** খাদ্যের মধ্যে প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের পরিপাকের ফলে যে সকল অ্যামাইনো অ্যাসিড উৎপন্ন হয় তার সবকটি জীবের দেহ গঠনে প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজনাতিরিক্ত অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলি বিপাকক্রিয়ায় অ্যামোনিয়া, ইউরিয়া ইত্যাদি উৎপন্ন করে।

উদ্ভিদের রেচন

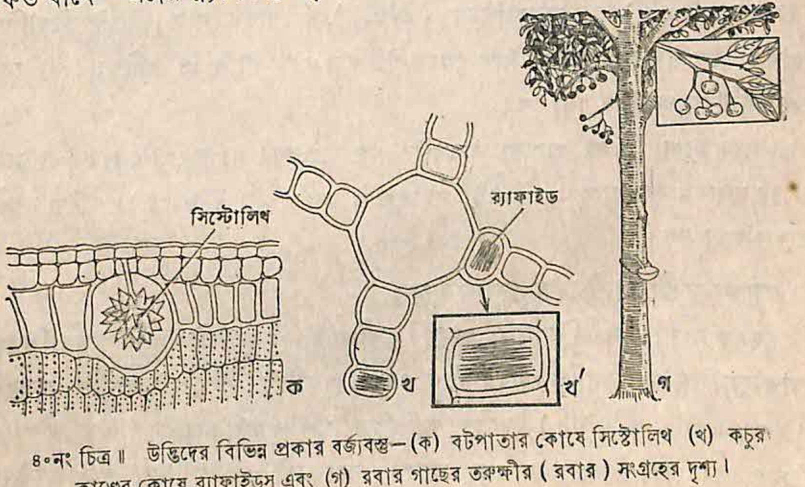
উদ্ভিদের রেচনক্রিয়ায় বিভিন্ন বর্জ্যপদার্থ প্রাণীদের মত কোনও বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে না। কারণ সমভারযুক্ত উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে উদ্ভিদের ধ্বংসমূলক বিপাক বা অপচিতির (Catabolism) হার অনেক কম। যার ফলে তাদের দেহের মধ্যে অত্যন্ত ধীরে ধীরে বিপাকীয় বর্জ্যপদার্থ সঞ্চিত হতে থাকে।

উদ্ভিদের রেচনযন্ত্র ঃ প্রাণীদের মত **উদ্ভিদের কোনও নির্দিষ্ট রেচনযন্ত্র বা রেচনতন্ত্র নেই,** তবে উদ্ভিদদেহের বিভিন্ন অংশে উৎপন্ন রেচন পদার্থগুলি অন্য কোনও স্থানে পরিবাহিত না হয়ে সক্রিয় প্রোটোপ্লাজম থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় সঞ্চিত থাকে। অবশেষে এইসব বর্জ্যবস্তু উদ্ভিদের পাতা, ফল, বীজ বা উদ্ভিদের বল্কলের সাথে পরিত্যক্ত হয়। নতুবা এই সব বর্জ্যবস্তুর বিষক্রিয়ায় উদ্ভিদের সজীব কোষগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারত।

উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রকার বর্জ্যবস্তু ঃ যদিও বর্জ্যপদার্থগুলি উদ্ভিদের জৈবিক-ক্রিয়ার পক্ষে ক্ষতিকর কিন্তু মানুষের পক্ষে এর অনেকগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রকার বর্জ্যপদার্থের মধ্যে কয়েকটির বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে ঃ

(ক) **উপক্ষার ঃ** এগুলি নাইট্রোজেন-ঘটিত এবং প্রোটিনের বিয়োজন (Decomposition)-এর ফলে উৎপন্ন হয়। এই পদার্থগুলি জলে অদ্রাব্য কিন্তু কোহলে দ্রবণীয় এবং মূল, কাণ্ড, বল্কল, পাতা এবং বীজে থাকে। এদের স্বাদ অত্যন্ত তিক্ত এবং কয়েকটি অত্যন্ত বিষাক্ত। এই বস্তুগুলি থেকে বহু ঔষধ তৈরী হয়। উদাহরণ ঃ সিনকোনা গাছের ছালে **'কুইনিন',** নাক্স ভমিকা গাছের বীজে **'স্ট্রীকনাইন',** কোকো থেকে **'কোকেন',** চা ও কফি বীজ থেকে **'ক্যাফিইন',** তামাক থেকে **'নিকোটিন',** ধুতুরা ফলের **'ধতুরিন'** এবং সর্পগন্ধার মূল থেকে **'সার্পেনটিনন'** ইত্যাদি। (খ) **ট্যানিন ঃ** এই জাতীয় পদার্থ শ্বেতসার জাতীয় বস্তুর বিয়োজনের ফলে উৎপন্ন হয়ে উদ্ভিদের কোষগহ্বরের মধ্যে কোষ রসে, কোষ প্রাচীরে, বল্কলে বা কাষ্ঠল অংশ থাকে। বিশেষতঃ অপক্ক ফলে অধিক পরিমাণে থাকে। ট্যানিন প্রাণীর চামড়ার প্রোটিনের সাথে যুক্ত হয়ে চামড়াকে শক্ত ও পাকা করে। পেশীসংকোচকরূপে ঔষধে এবং লেখার কালি উৎপাদনে ট্যানিন ব্যবহৃত হয়। বাবলা ও জাম গাছের ছাল ও ফলে এই পদার্থ প্রচুর পরিমাণে থাকে। (গ) **তরুক্ষীর বা ল্যাটেকস্ ঃ** বিভিন্ন প্রকার গুপ্তবীজী উদ্ভিদের বিশেষ প্রকার ল্যাটেকস্ বাহিকার মধ্যে তরল দুধের মত এই বস্তু থাকে। রবার উৎপন্নকারক উদ্ভিদের এই পদার্থ থেকেই

বাণিজ্যিক রবার প্রস্তুত করা হয়। টাটকা পেঁপে কাটলে যে তরুক্ষীর বেরোয় তাকে **'প্যাপায়েন'** বলে এবং এই পদার্থে প্রোটিন জীর্ণকারক উৎসেচক থাকে। (ঘ) **রজন ঃ** এই পদার্থ উদ্ভিদের বিশেষ প্রকার রজন নালীতে সঞ্চিত থাকে। এই পদার্থ জলে অদ্রবণীয় কিন্তু ইথার বা কোহলে দ্রবীভূত হয় এবং বার্ণিশ বা রঙ-শিল্পে জলনিরোধকরূপে ব্যবহৃত হয়। **চাঁচ গালাও** এই পদার্থ দ্বারা তৈরী হয়। (ঙ) **গঁদ ঃ** উদ্ভিদের সেলুলোজ দ্বারা গঠিত কোষ প্রাচীরের বিয়োজনের ফলে উৎপন্ন হয়। বাবলা জাতীয় গাছের ত্বক কিছু পরিমাণ কেটে দিলে এই পদার্থ বেরোতে থাকে। বিভিন্ন প্রকার আঠা এই পদার্থ থেকে তৈরী হয়, আরবী গঁদ এই জাতীয় পদার্থ। (চ) **বিভিন্ন প্রকার প্রয়োজনীয় তেল ঃ** ইউক্যালিপটাস্ গাছের পাতা, কমলা লেবুর খোসা ও বিভিন্ন উদ্ভিদের বল্কল ও বীজ ইত্যাদি থেকে পাতনক্রিয়া দ্বারা নিষ্কাশন করা হয়। এই পদার্থগুলি বিভিন্ন গন্ধ দ্রব্য প্রস্তুতে লাগে। (ছ) **বিভিন্ন খনিজের কেলাস ঃ** উদ্ভিদের মূল দ্বারা গৃহীত বিভিন্ন খনিজ উদ্ভিদ কোষে অদ্রবণীয় কেলাসরূপে সঞ্চিত থাকে। যদিও উদ্ভিদ বিভিন্ন প্রকার লবণ সমাবেশের তারতম্য সহ্য করতে পারে, তবুও কোষের মধ্যে তরল অবস্থায় এই সকল বস্তু উদ্ভিদের পক্ষে ক্ষতিকারক। অনেক কচু ও ওল গাছের কাণ্ডের মধ্যে **ক্যালসিয়াম অক্সালেট** (Calcium oxalate) অতি সূক্ষ্ম ছুঁচের আকারে একক বা গুচ্ছাকারে সঞ্চিত থাকে—এদের **র‍্যাফাইডস্** (Raphides) বলে। সেইজন্য ওল বা কচু খেলে



৪০নং চিত্র॥ উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রকার বর্জ্যবস্তু—(ক) বটপাতার কোষে সিস্টোলিথ (খ) কচুর কাণ্ডের কোষে র‍্যাফাইডস্ এবং (গ) রবার গাছের তরুক্ষীর (রবার) সংগ্রহের দৃশ্য।

এই সকল পদার্থ গলার মধ্যে ফুটে কুটকুট করে। বট পাতার ঊর্ধ্বত্বকের কোষের অভ্যন্তরে আঙুর গুচ্ছের আকারে **ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের** কেলাস জমা

থাকে, এদের **সিস্টোলিথ্** (Cystolith) বলে। (জ) **ইথাইলিন** (Ethylene) নামক গ্যাস উদ্ভিদের ফল ও পাতা থেকে উৎপন্ন হয়। এই গ্যাস দ্বারা ফলের কাঁচা রঙ পরিবর্তিত হয়ে পাকা রঙ হয় এবং ফল ও পাতা ঝরানোয় সাহায্য করে। ইথাইলিন গ্যাসও উদ্ভিদের বর্জ্যপদার্থ।

প্রাণীদের রেচন

প্রাণীদের কোষের প্রোটোপ্লাজমের ক্রিয়া অতি সূক্ষ্ম ভৌত রাসায়নিক ভারসাম্যের উপর নির্ভরশীল এবং এই ভারসাম্য রেচনক্রিয়ার দ্বারা রক্ষিত হয়। **প্রাণীরা উদ্ভিদ অপেক্ষা অধিক ক্রিয়াশীল হওয়ায় অধিক শক্তির প্রয়োজনে অন্তঃকোষীয় শ্বাসক্রিয়ায় অধিক বর্জ্যপদার্থ উৎপন্ন করে।** অতিরিক্ত জল, গ্যাস, জৈব বস্তু, বিভিন্ন লবণ ইত্যাদি বিভিন্ন রেচন পদার্থ দেহ থেকে বর্জিত হয় এবং প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি দেহের মধ্যে সঞ্চিত থাকে। রেচনক্রিয়া প্রধানত নাইট্রোজেন-ঘটিত বর্জ্য-বস্তু ত্যাগের সাথে যুক্ত থাকে। পরিপাক ক্রিয়ায় প্রোটিন অ্যামাইনো অ্যাসিডে ভেঙে দেহের মধ্যে শোষিত হয় এবং কিছু পরিমাণ অ্যামাইনো অ্যাসিড কোষের মধ্যে নূতন প্রোটিন সৃষ্টির কাজ করে। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের দেহে অতিরিক্ত অ্যামাইনো অ্যাসিড যকৃতের মধ্যে বাহিত হওয়ার পর উৎসেচকের সাহায্যে বিজারিত হয়ে বৃক্কের মাধ্যমে বিভিন্ন বর্জ্যবস্তুরূপে বহিষ্কৃত হয়। এই প্রক্রিয়াকে **ডিঅ্যামিনেসন** (Deamination) বা অ্যামাইনের (NH_3) বিয়োজন বলে। এই বিজারিত পদার্থগুলিকে উভচর ও স্তন্যপায়ীদের ক্ষেত্রে ইউরিয়া এবং পাখি ও সরীসৃপ প্রাণীদের ক্ষেত্রে ইউরিক অ্যাসিড বলা হয়।

খাদ্যের মধ্যে বিভিন্ন অপাচ্য অদ্রবণীয় বস্তু কোষের মধ্যে শোষিত হয় না বলে তাদের বর্জ্যবস্তু বলা যাবে না। এই পদার্থগুলি মলরূপে (Faeces) পৌষ্টিক নালী হতে বহিষ্কৃত হয়।

অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের রেচন যন্ত্র ঃ

দেহের ব্যাপন ক্রিয়ার দ্বারা রেচন ঃ এককোষী প্রাণী অ্যামিবা, **প্যারামেসিয়াম** ইত্যাদির দেহের মধ্যে এক বা একাধিক **সংকোচনশীল গহ্বর** (Contractile vacuole) দেহের অতিরিক্ত জল ও বর্জ্য বস্তু গ্রহণ ও মাঝে মাঝে বহিষ্কৃত করে দেহের জলসাম্য রক্ষা করে। বহুকোষী একনালীদেহী প্রাণী **হাইড্রা** ও **স্পঞ্জ** জাতীয় প্রাণীদের কোষ থেকে ব্যাপনক্রিয়ায় বিভিন্ন বর্জ্যবস্তু জলের মধ্যে পরিত্যক্ত হয়।

বিভিন্ন যন্ত্রের দ্বারা রেচন ঃ বহুকোষী ও অপেক্ষাকৃত বৃহৎ প্রাণীদের পক্ষে কেবল মাত্র ব্যাপনক্রিয়ার দ্বারা বর্জ্যবস্তুগুলি দূরীকরণ করা যায় না, অতি অল্পমাত্রায় কোষ থেকে বহিষ্কৃত হয়। এর ফলে কোষের মধ্যে বর্জ্যবস্তু সঞ্চিত হয়ে ক্রমে বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি করে। এই কারণে বিভিন্ন প্রকার উন্নত প্রাণীরা বিশেষ যন্ত্রের মাধ্যমে রেচনক্রিয়া পরিচালিত করে। এই যন্ত্রগুলিকে রেচন যন্ত্র বলে।

(১) **ফ্লেম সেল্ (Flame cell) বা অগ্নিশিখার আকারবিশিষ্ট কোষ ঃ চ্যাপ্টা কৃমি জাতীয় প্রাণীর** রেচনযন্ত্র বহু জটিল সূক্ষ্ম নালীর দ্বারা গঠিত। এই নালীগুলির প্রান্তে বহু সূক্ষ্ম রোমের আকারের সিলিয়া থাকায় এবং এদের সম্মিলিত সঞ্চালনের ফলে কোষটিকে প্রদীপ শিখার মত দেখায়। এই কোষগুলিকে ফ্লেম সেল্ বলে। এদের সিলিয়াগুলির সঞ্চালনের ফলে যে প্রবাহের সৃষ্টি হয় তার দ্বারা দেহের মধ্যে বর্জ্য-পদার্থ নালীর মধ্যে আনীত হয়ে **রেচন নিঃসারক** ছিদ্র (Excretory pore)



৪১নং চিত্র ॥ প্রাণীদের বিভিন্ন প্রকার রেচনযন্ত্র—(ক) অ্যামিবার সংকোচনশীল গহ্বর, (খ) হাইড্রার দেহকোষ দ্বারা ব্যাপন, (গ) চ্যাপ্টা কৃমির ফ্লেম কোষ, (গ) একটি ফ্লেম কোষের আভ্যন্তরিক গঠন, (ঘ, ঘ´) কেঁচোর নেফ্রিডিয়াম, (ঙ) চিংড়ির রেচনতন্ত্র এবং (চ) আরশোলার ম্যালপিঘিয়ান টিউবিউল ও (চ´) ম্যালপিঘিয়ান টিউবিউলের বর্ধিত আকারের দৃশ্য।

দ্বারা নিষ্কাশিত হয়। (২) **নেফ্রিডিয়াম ঃ** কেঁচোর রেচনকার্য একপ্রকার নলাকার যন্ত্র, যার একটি দিক দেহের মধ্যে উন্মুক্ত এবং অপর প্রান্ত দেহের বাইরে ক্ষুদ্র ছিদ্র দ্বারা বর্জ্যপদার্থ নিষ্কাশন করে। এই প্রকার যন্ত্রকে **নেফ্রিডিয়াম** (Nephridium) এবং বহু নেফ্রিডিয়াম সমষ্টিকে **নেফ্রিডিয়া** (Nephridia) বলে। নেফ্রিডিয়াম দেহগহ্বরে তরল রস থেকে বর্জ্যবস্তু—**ইউরিয়া** পরিস্রাবণ দ্বারা বর্জন করে। প্রতিটি নেফ্রি-ডিয়ামের দেহের অভ্যন্তরে মুক্ত অংশটি একটি ফানেলের আকারের হয়। নেফ্রিডিয়ামের ফানেলের চারিধারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চুলের মত সিলিয়া থাকে, এই অংশকে **নেফ্রোস্টোম**

(Nephrostome) বলে। নেফ্রিডিয়ামের নলাকার দেহের সর্বত্র রক্তবাহী নালী-থেকে বর্জ্যপদার্থ নলের মধ্যে প্রবেশ করে এবং কেঁচোর দেহত্বকে যুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র—**নেফ্রিডিয়োপোর** দ্বারা নিষ্কাশিত হয়। (৩) **ম্যালপিঘিয়ান টিউবিউল**ঃ পতঙ্গ শ্রেণীর প্রাণী আরশোলা, গঙ্গাফড়িং ও অন্যান্য কয়েকটি সন্ধিপদ প্রাণীদের **ম্যালপিঘিয়ান টিউবিউল** (Malpighian tubule) নামে বহু সুতোর মত কুণ্ডলাকার নালিকা আছে এগুলি আরেক প্রকার রেচনযন্ত্র। এই যন্ত্র পৌষ্টিকনালীর সাথে সংযুক্ত থেকে সিলোম বা দেহগহ্বরের রস হতে বর্জ্যপদার্থ গ্রহণ করে অন্ত্রের মধ্যে নিষ্কাশন করে। (৪) **গ্রীন গ্ল্যাণ্ড** (Green gland) বা **সবুজ গ্রন্থি**ঃ **চিংড়ি** বা অন্যান্য শ্রেণীর প্রাণীদের রেচন একজোড়া গ্রীন গ্ল্যাণ্ডের দ্বারা পরিচালিত হয়। এই গ্রন্থি দুটি শিরোবক্ষের অগ্রবর্তী অঞ্চলে প্রতিটি শুঙ্গের গোড়ার স্ফীত অংশের মধ্যে থাকে।

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের রেচনযন্ত্রঃ

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের প্রধান রেচনযন্ত্রকে **বৃক্ক** (Kidney) বলে। বৃক্ক ব্যতীত **চর্ম, যকৃৎ, ফুসফুস, লালাগ্রন্থি** ইত্যাদির দ্বারাও রেচনকার্য সমাধা হয়।

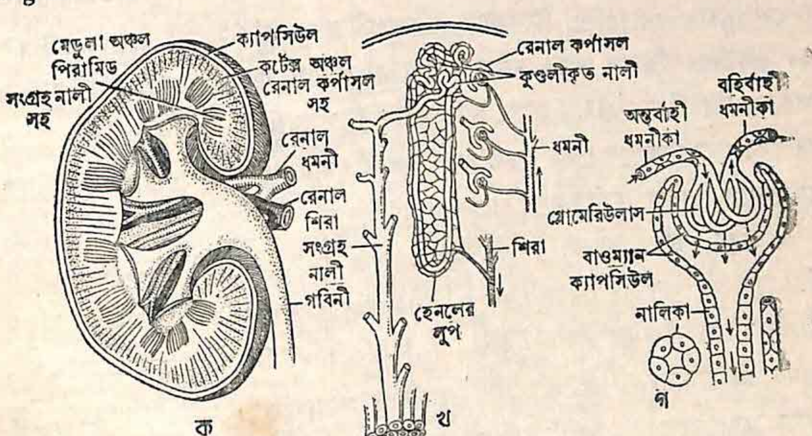
(ক) **বৃক্ক** (Kidney)ঃ এই প্রকার রেচনযন্ত্র মেরুদণ্ডী প্রাণীদের দেহের অভ্যন্তরে পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত এবং সাধারণতঃ একজোড়া থাকে। **মৎস্য** এবং **স্যালামাণ্ডারের** দেহের অভ্যন্তরে বৃক্ক প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রসারিত, কিন্তু **ব্যাঙ, সরীসৃপ, পক্ষী** ও **স্তন্যপায়ীদের** বৃক্ক আকারে সুসংবদ্ধ ও অপেক্ষাকৃত ছোট হয়। প্রতিটি বৃক্কের উভয়দিক থেকে একটি করে মোট দুটি সরু নালী উৎপন্ন হয়, এদের **গবিণী** বা **ইউরেটার** বলে। গবিণী বৃক্কে উৎপন্ন বিভিন্ন বর্জ্যবস্তু দেহের পশ্চাৎ অঞ্চলে বহন করে। ব্যাঙ, সরীসৃপ, পাখী ইত্যাদি প্রাণীর **ক্লোয়েকার** অভ্যন্তরে গবিণী মুক্ত হয় এবং বর্জ্যপদার্থ ক্লোয়েকার মাধ্যমে বেরিয়ে যায়। সরীসৃপ ও পাখীদের বর্জ্যবস্তু বা মূত্র অর্ধতরল **ইউরিক অ্যাসিডরূপে** মলের সাথে বেরিয়ে যায়, এই পদার্থকে **গুয়ানো** (Guano) বলে। গুয়ানো অত্যন্ত শক্তিশালী সার এবং বিদেশে চাষ-আবাদে ব্যবহার করা হয়। অধিকাংশ স্তন্যপায়ী প্রাণীদের গবিণী **মূত্রস্থলীর** (Urinary bladder) সাথে যুক্ত হয় এবং মূত্র মূত্রস্থলীতে সাময়িক সঞ্চিত থাকে। পরে একটি মধ্যবর্তী **মূত্রনালীর** (Urethra) দ্বারা নিষ্কাশিত হয়।

মানুষের বৃক্ক এক জোড়া এবং শিম বীজের মত আকার-বিশিষ্ট হয়। বৃক্ক মানুষের উদরগহ্বরের পশ্চাৎ অংশে মেরুদণ্ডের উভয় দিকে অবস্থিত। বৃক্কের রঙ

বাদামী বা কালচে লাল, লম্বায় প্রায় ১০ সে. মি. এবং প্রস্থে ৬·৫ সে. মি.। বৃক্কের পাতলা প্রস্থচ্ছেদ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে পরীক্ষা করলে নিম্নলিখিত অংশগুলি দেখা যায়—

(১) **কর্টেক্স (Cortex):** বাইরের স্তর এবং এই স্তরে প্রায় দশলক্ষ রেচন একক বা **নেফ্রন (Nephron)** থাকে। প্রতিটি নেফ্রন দুটি অংশে বিভক্ত। যথা— (ক) **ম্যালপিঘিয়ান কর্পাসল** বা **রেনাল কর্পাসল** (Malpighian or Renal corpuscle) ও (খ) **রেনাল টিউবিউল** (Renal tubule দ্বারা গঠিত।

প্রতিটি নেফ্রনের প্রথম অংশকে **ম্যালপিঘিয়ান কর্পাসল** বা **রেনাল কর্পাসল** বলে। এই অংশ এক স্তর কোষবিশিষ্ট দুটি আবরণীর দ্বারা গঠিত গোলাকার **বাওম্যান ক্যাপসিউল** (Bowman capsule) এর মধ্যে অন্তর্বাহী ধমনিকার জালকগুলিকে ঘিরে রাখে। একসাথে সংযুক্ত জালকগুলিকে **গ্লোমেরিউলাস** (Glomerulus) বলে। এই জালকগুলি পুনর্বার সংযুক্ত হয়ে **বহির্বাহী ধমনিকার** সৃষ্টি করে এবং বহির্বাহী ধমনিকা বাওম্যান ক্যাপসিউল থেকে বহির্গত হয়। দ্বিতীয় অংশ অতিক্ষুদ্র নলাকার **রেনাল টিউবিউল** বাওম্যান ক্যাপসিউল থেকে বেরিয়ে **সংগ্রহনালীর** (Collecting tubule) সাথে যুক্ত থাকে। বাওম্যান ক্যাপসিউলের পরবর্তী রেনাল টিউবিউল



৪২নং চিত্র ॥ মানুষের রেচনযন্ত্রের আভ্যন্তরিক গঠন—(ক) বৃক্কের প্রস্থচ্ছেদ ; (খ) নেফ্রনের গঠন ও (গ) মালপিঘিয়ান কর্পাসল।

কুণ্ডলাকার, পরে সরল হয়ে বৃক্কের মধ্যে প্রসারিত হয়—এই অংশকে **ডিসেণ্ডিং টিউবিউল** (Descending tubule) এবং পুনর্বার কর্টেক্সের মধ্যে প্রসারিত অংশটিকে

অ্যাসেণ্ডিং টিউবিউল (Ascending tuble) বলে। ডিসেণ্ডিং এবং অ্যাসেণ্ডিং টিউবিউলকে অপেক্ষাকৃত সরু **হেনলের লুপ** (Henley's loop) সংযুক্ত করে এবং অ্যাসেণ্ডিং টিউবিউলের পরের অংশটিও কুণ্ডলাকার হয়। সমগ্র রেনাল টিউবিউল বহু কৈশিক নালী দ্বারা আবৃত হয়। একটি রেনাল টিউবিউল দৈর্ঘ্যে প্রায় ৫০-৬০ মিলিমিটার এবং দুটি বৃক্কে প্রায় ২০ লক্ষ রেনাল টিউবিউল আছে, এগুলি একত্রে যুক্ত করলে প্রায় ৭৫ কিলোমিটার দীর্ঘ হবে। (২) **মেডালা** (Medulla) **:** মেডালা বৃক্কের অভ্যন্তরের অংশ। এখানে বিভিন্ন নেফ্রনের রেনাল টিউবিউল একত্রে যুক্ত হয়ে যে সংগ্রহনালীর সৃষ্টি করে সেগুলি বৃক্কের অভ্যন্তরের দিকে প্রসারিত বহু স্ফীতাকার পিরামিডের মধ্যে উন্মুক্ত হয়।

বৃক্কের কার্য : (১) মূত্র উৎপাদন : রক্তের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার বর্জ্য এবং প্রয়োজনীয় বস্তু রেনাল ধমনীর শাখা—অন্তর্বাহী ধমনিকার দ্বারা বৃক্কের মধ্যে আসে এবং বিভিন্ন বস্তু পরিস্রাবণের পর বহির্বাহী ধমনিকার দ্বারা বহির্গত হয়। গ্লোমেরিউলাসের **অন্তর্বাহী ধমনিকা** Afferent Arteriole) থেকে রক্তের প্রোটিন জাতীয় বস্তু ব্যতীত অন্যান্য বস্তুগুলির **পরিস্রাবণ** (Filtration) দ্বারা গ্লোমেরিউলাস থেকে বাওম্যান ক্যাপসিউলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। এই প্রকার পরিস্রাবণ রক্তের চাপ বৃদ্ধির দ্বারা ঘটে। এই সকল পরিস্রুত বস্তুর মধ্যে অনেকগুলি বিভিন্ন মাত্রায় নির্বাচনের মাধ্যমে পুনর্বার অ্যাসেণ্ডিং টিউবিউল ও পরবর্তী কুণ্ডলাকার অংশের মাধ্যমে শোষিত হয়। বিভিন্ন পরিস্রুত বস্তুর মধ্যে **সমগ্র গ্লুকোজ,** বহুল পরিমাণে বিভিন্ন অজৈব বস্তুর আয়ন (Na^+, Cl^-, Ca^{++}, K^+ ইত্যাদি), অ্যামাইনো অ্যাসিড, ভিটামিন ও জল পুনর্বার শোষিত হয়। এই সকল বস্তু বহির্বাহী ধমনিকার জালকের মাধ্যমে শোষিত হয়ে রেনাল পোর্টাল শিরার দ্বারা বাহিত হয়।

প্রতিদিন উভয় বৃক্কের গ্লোমেরিউলাসগুলির মাধ্যমে প্রায় ১৭০ লিটার জল পরিস্রাবণ হয় এবং এর মধ্যে ১৬৮·৫ লিটার পুনর্বার শোষিত হয়। অবশিষ্ট জল ও সোডিয়াম ক্লোরাইড এবং সম্পূর্ণ ইউরিয়া, অ্যামোনিয়া, পটাসিয়াম ক্লোরাইড, সালফেট, ফসফেট, ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম ইত্যাদিসহ **মূত্ররূপে** (Urine) সংগ্রহনালীর মাধ্যমে বৃক্কের গহ্বরের মধ্যে নিষ্কাশিত হয়। (২) **জলসাম্য নিয়ন্ত্রণ :** দেহের মধ্যে অতিরিক্ত জল বৃক্কের মাধ্যমে নির্গত হয়ে দেহের জলসাম্য নিয়ন্ত্রণ করে। (৩) **অম্লত্ব ও ক্ষারত্বের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ :** রক্তের গুণ কিছুটা ক্ষারীয় কিন্তু মূত্র আম্লিক, যদিও মূত্র রক্তের পরিস্রাবণের ফলে উৎপন্ন হয়। রক্তের মধ্যে জৈবিক প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন প্রকার অম্ল মিশে থাকে, যথা—কার্বন ডাই-অক্সাইড দেহের

মধ্যে জলের সঙ্গে মিশে কার্বনিক অ্যাসিড এবং পেশী সংকোচনের ফলে ল্যাকটিক অ্যাসিড ইত্যাদি। এই বস্তুগুলি দেহের পক্ষে ক্ষতিকারক হওয়ায় মূত্রের সাথে বেরিয়ে যায়। বৃক্ক এই নিষ্কাশনের দ্বারা **দেহের অম্লত্ব ও ক্ষারত্বের নির্দিষ্ট ভারসাম্য বজায় রাখে।** (৪) **রোগ নির্ণয়ে সাহায্য ঃ** বৃক্কের স্বাভাবিক কাজের দ্বারা শরীর সুস্থ থাকে কিন্তু কোনও প্রকার বিশৃঙ্খলতা বা রোগ হলে দেহের মধ্যে অত্যন্ত ক্ষতিকারক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বৃক্কের আভ্যন্তরিক গহ্বরে অনেক সময় অক্সালেট জাতীয় লবণ কেলাসিত হয়ে **বৃক্ক-পাথরে** (Kidney stone) পরিণত হয় এবং শল্যচিকিৎসা দ্বারা বহিষ্কৃত না করলে রোগী অত্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করে। মূত্রে **অ্যালবুমেন, অতিরিক্ত গ্লুকোজ, অ্যাসিটোন, পুঁজ, রক্ত, পিত্তকণিকা** ইত্যাদি দেখা গেলে শরীরের কি রোগ তা নির্ণয় করা যায়।

(খ) **ফুসফুস ঃ** ফুসফুস যদিও শ্বাসযন্ত্র কিন্তু এর মাধ্যমে **কার্বন ডাই-অক্সাইড, জল, কিটোন বডি** ইত্যাদি অপ্রয়োজনীয় বা **বর্জ্যবস্তুরূপে** পরিত্যক্ত হয়। প্রতিদিন ফুসফুসের দ্বারা প্রায় ২৪০ সি. সি. জল বাষ্পরূপে বহিষ্কৃত হয়।

(গ) **যকৃৎ ঃ** এই যন্ত্রের মাধ্যমে সামান্য পরিমাণ জল ও লোহিত রক্তকণিকার হিমোগ্লোবিন ভেঙে **পিত্ত-লবণরূপে** (Bile pigments) অন্ত্রের মধ্যে বর্জিত হয়ে মলের সাথে বেরিয়ে যায়।

(ঘ) **চর্ম ঃ** চর্মের মধ্যে যে ঘর্মগ্রন্থিগুলি থাকে তাদের দ্বারা জল, লবণ ও অ্যামোনিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন বর্জ্যবস্তু ঘর্মরূপে বেরিয়ে যায়। গ্রীষ্মের অত্যধিক গরমে অতিরিক্ত ঘর্ম বেরোলে তার সাথে যে পরিমাণ লবণ বেরিয়ে যায় তা পূরাণর জন্য লবণ ও ভিটামিন C খাদ্যের সাথে খেয়ে দেহের অভাব পূরণ করা উচিত। **ঘর্ম যদিও রেচন পদার্থ তবুও এর প্রধান কাজ হচ্ছে দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ।**

বিপাকীয় বর্জ্যবস্তুগুলির নিষ্কাশনের পর পরিণতি ঃ উদ্ভিদদেহের বর্জ্যবস্তু, যথা—কার্বন ডাই-অক্সাইড দিনের বেলা সালোকসংশ্লেষ দ্বারা শ্বেতসার এবং অ্যামোনিয়া অ্যামাইনো অ্যাসিডে পরিণত হয়ে প্রোটিন উৎপাদন করে। কিন্তু রাত্রিবেলা সালোকসংশ্লেষ না হওয়ায় কার্বন ডাই-অক্সাইড বায়ুতে বেরিয়ে যায়। উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রকার বর্জ্যবস্তু যথাক্রমে বিভিন্ন **উপক্ষার, ট্যানিন, ল্যাটেক্স, রজন** ইত্যাদিও মানুষের বিভিন্ন উপকারে লাগে।

প্রাণীরা রেচনক্রিয়ায় যে **অ্যামোনিয়া, ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড, ক্যালসিয়াম, কার্বন ডাই-অক্সাইড** ইত্যাদি বর্জন করে সেগুলি পুনরায় জীবের

প্রয়োজনে লাগে। কেঁচো, শামুক, উভচর, সরীসৃপ, পক্ষী ও স্তন্যপায়ীরা বর্জ্য-পদার্থের মধ্যে ইউরিয়া ত্যাগ করে উদ্ভিদের প্রয়োজনে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে।

গরু, মহিষ, ঘোড়া ও মানুষের মলমূত্র ইত্যাদি বর্জ্যপদার্থগুলিকে মাটির মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন আণুবীক্ষণিক জীব—যথা ব্যাক্‌টিরিয়া, ছত্রাক ইত্যাদি বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় সরল ও তরল জৈব বস্তুতে পরিণত করে। এই বস্তুগুলি মাটির উর্বরতা বাড়িয়ে জৈব সারের প্রয়োজনীয়তা মিটায়। উদ্ভিদ বা প্রাণী জীবনধারণের জন্যে যে সব দ্রব্য মাটি বা বায়ু থেকে গ্রহণ করে সেগুলি আবার মাটি ও বায়ুতে ফিরে আসে এবং পুনরায় জীবের প্রয়োজনে লাগে। সুতরাং **একের বর্জ্যবস্তু অন্যের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়, কোনও বস্তুই বিনষ্ট হয় না। কেবলমাত্র প্রকৃতিতে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তিত হয়।**

———

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মাটি, জীবাণু ও ভাইরাস
(Soil, Microbes & Virus)

মাটি

আমরা উদ্ভিদ জগতের উপর শ্বাসকার্যে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন ও পুষ্টিসাধনের জন্য নির্ভর করি। আবার উদ্ভিদ তাদের প্রয়োজনীয় বস্তুর জন্য মাটির উপর নির্ভর করে। সবুজ উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার খনিজ পদার্থ, জল এবং মূলের শ্বাসকার্যের জন্য অক্সিজেন মাটি সরবরাহ করে। এই সব পদার্থের সুষম উপস্থিতি এবং মাটির ভৌত অবস্থার উপর উদ্ভিদের বৃদ্ধি নির্ভরশীল। উদ্ভিদ ব্যতীত মাটিতে বিভিন্ন প্রকার এককোষী থেকে বহুকোষী প্রাণী আশ্রয় গ্রহণ করে। এইসব প্রাণীর মধ্যে আমরা ও আমাদের চোখের সম্মুখে অন্যান্য যে সব প্রাণী আছে সেগুলি ব্যতীত মাটির গর্তের মধ্যে বা মাটির সাথে মিশে আরও অসংখ্য প্রাণী থাকে।

বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীদের বর্জ্যপদার্থে ও মৃত জীবদেহে ব্যাকটিরিয়া ও অন্যান্য জীবাণু দ্বারা পচনক্রিয়া ঘটে, এর ফলে মাটি ও পরিবেশ থেকে গৃহীত জীবদেহের উপাদানগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে মাটি ও পরিবেশের সাথে মিশে যায়। এই বিক্রিয়ায় মাটি জীবাণুগুলিকে ধারণ করে প্রকারান্তরে সাহায্য করে। মাটির মধ্যে অহরহ পরিবর্তন চলছে ; কারণ জল, বায়ু, খনিজ ও হিউমাস (প্রাণী ও উদ্ভিদের পচনজাত পদার্থ) ইত্যাদি মাটির মধ্যে সর্বদা একপ্রকার থাকে না, এজন্য সকলপ্রকার মাটিও এক নয়। সদা-সর্বদা মাটির এই প্রকার ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তনে মাটিকে সদাচঞ্চল চিরগতিশীল বস্তু বলে মনে হয়।

মাটিতে বিভিন্নপ্রকার পদার্থের উপস্থিতির তারতম্য অনুযায়ী জীবজগতের পরিবর্তন হয়। এমন কি মাটির কোনও স্থানে জলাজমিতে যে জল জমে তাও মাটি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সেস্থানের জীবের উপর প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং **জীবজগতের ও জীবের অস্তিত্বরক্ষায় মাটির অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।**

মাটির সংজ্ঞা ঃ ক্ষয়প্রাপ্ত আদিশিলার দ্বারা উৎপন্ন বিভিন্ন আকারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকা ও বিভিন্ন প্রকারের জীব ও জৈব পদার্থ, অজৈব

লবণ, জল এবং গ্যাস দ্বারা গঠিত অত্যন্ত গতিশীল জটিল মিশ্র পদার্থকে মাটি বলে।

মাটির উৎপত্তিঃ মাটির উৎপত্তি অত্যন্ত গতিশীল প্রক্রিয়া এবং এই প্রক্রিয়া কয়েকটি উপপ্রক্রিয়ার সম্মিলিত কার্যের ফলে হয়। যথা—(১) আদিশিলা যা থেকে মাটির প্রধান উপাদান গঠিত সেগুলিকে **পাললিক শিলা** (Sedimentary rocks) এবং **আগ্নেয় শিলা** (Igneous rocks) বলে। এই শিলাগুলি বহুপ্রকার রাসায়নিক ও প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হয়ে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বিভিন্ন খনিজ পদার্থে বিভক্ত হয়। (২) আণুবীক্ষণিক সজীব বস্তুরা মৃত উদ্ভিদ ও প্রাণী দেহ বা তাদের দেহের কোন অংশ বা কোনও প্রকার রেচনজাত পদার্থ থেকে হিউমাস উৎপন্ন করে। (৩) এই পদার্থগুলির মধ্যে মাটির মধ্যে বাসকারী বিভিন্ন জীব এবং গরু, ঘোড়া মানুষ ইত্যাদি প্রাণীর বিভিন্ন কার্যের ফলে মিশ্রণ ঘটে। এই প্রকার মিশ্রিত বস্তুই মাটি। বিভিন্ন স্থানের মাটি সেই স্থানের খনিজ, জল ও সজীব বস্তুর উপস্থিতি অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকারের হয়।

মাটির বিভিন্ন স্তরের পার্শ্বচিত্র (Soil profile)ঃ কোনও স্থানের মাটি খাড়াভাবে কাটলে উপর থেকে নীচে কয়েকটি সমান্তরাল স্তর দেখা যায়। এই সমান্তরাল স্তরগুলিকে পাশ থেকে দেখলে যে চিত্র দেখা যায় তাকেই **মাটির পার্শ্বচিত্র** (Soil profile) বলে। মাটির **উপরের স্তর** (Top soil) মৃত প্রাণী ও উদ্ভিদের পচনজাত জৈব পদার্থ এবং কাদা ও বালি দ্বারা গঠিত কালো দো-আঁশ মাটি যুক্ত। এই স্তরের গঠনের উপর চাষ-আবাদ নির্ভর করে। কারণ মাটির মধ্যে পচা জৈব বস্তু মাটিকে আলগা করে বায়ু ও জলচলাচলে সাহায্য করে। পরবর্তী **অন্তর্মৃত্তিকা স্তর** (Sub-soil) বালিমিশ্রিত কাদা দ্বারা গঠিত এবং এই স্তরে বিভিন্ন প্রকার অজৈব পুষ্টিসাধক বস্তু সঞ্চিত থাকে। এই স্তরের রঙ উপরের স্তর অপেক্ষা কিছু হালকা। পরবর্তী তৃতীয় স্তরটি প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ক্ষয়প্রাপ্ত আদিশিলা দ্বারা গঠিত। এই স্তরকে **ক্ষয়প্রাপ্ত আদি-শিলাস্তর** (Weathered parent rock) বলে এবং এই শিলাস্তরের প্রকৃতি অনুযায়ী মাটির প্রকৃতি নির্ভর করে। একেবারে অভ্যন্তরের স্তরটিকে **আদি-শিলাস্তর** (Parent rock) বলে, এটি বেলেপাথরের দ্বারা গঠিত। এই স্তরের আদিশিলার পরিবর্তনে উপরের স্তর গঠিত হয়।

মাটির বিভিন্ন উপাদানঃ মাটি শিলাচূর্ণ, খনিজ লবণ, পচনক্রিয়ার দ্বারা উদ্ভিদ বা প্রাণীজাত বিভিন্ন জৈব পদার্থ, আণুবীক্ষণিক জীব এবং মাটির অভ্যন্তরে

বহুভাগে বিভক্ত ছিদ্রের মধ্যের জল ও বায়ু ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার উপাদানের মিশ্রণে গঠিত।

মাটির গঠন ঃ মাটির বিভিন্ন উপাদান প্রধানত তিন অবস্থায় থাকে—যথা, কঠিন, তরল ও বায়বীয়। কঠিন পদার্থ জৈব ও অজৈব উভয় বস্তুর দ্বারা গঠিত হয় এবং এদের মধ্যে অজৈব পদার্থগুলি বিভিন্ন প্রকার খনিজ পদার্থের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ দ্বারা গঠিত। খনিজ পদার্থের এই সকল অংশের আকার ও আয়তন অনুযায়ী **বালি** (২-০·০৩ মিঃ মিঃ), **পলি** (০·০২-০·০০২ মিঃ মিঃ) এবং **কাদা** (০·০০২ মিঃ মিঃ বা কম) বলে। এইসব পদার্থের উপস্থিতির তারতম্য অনুযায়ী মাটিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়।

মাটির শ্রেণীবিভাগ ঃ (ক) **দো-আঁশ মাটি** (Loamy soil) **:** এই মাটিতে শতকরা ৪০ ভাগ বালি, ৪০ ভাগ পলি ও ২০ ভাগ কাদা থাকে। এগুলি ব্যতীত কিছু পরিমাণ চুন ও লোহজাত খনিজ ও জৈব পদার্থ বর্তমান। বালির ভাগ বেশী হওয়ায় এই মাটির জলধারণের ও বায়ুচলাচলের ক্ষমতা অধিক। এই প্রকার মাটি কৃষিকার্যের জন্য বেশী উপযোগী। বিভিন্ন প্রকার শাকসব্জী, তরিতরকারি, ধান, গম, আলু ইত্যাদি ভাল জন্মায়। (খ) **বেলে মাটি** (Sandy soil) **:** এই জাতীয় মাটিতে শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ বালি এবং কাদার পরিমাণ প্রায় ১০ ভাগ। বালির পরিমাণ বেশী হওয়ায় মাটি অত্যন্ত সচ্ছিদ্র এবং জলধারণের ক্ষমতা কম। বৃষ্টির বা সেচের জল অল্প সময়ের মধ্যে মাটির অভ্যন্তরে চলে যাওয়ায় চাষের পক্ষে অসুবিধা হয়, তবে সর্বদা জল সরবরাহ করলে চাষ-আবাদ করা যায়। বিশেষত এই মাটি তরমুজ, কুমড়া, বাদাম ইত্যাদি চাষের পক্ষে উপযুক্ত। (গ) **এঁটেল মাটি** (Clayey soil) **:** এই প্রকার মাটিতে কাদার পরিমাণ শতকরা প্রায় ৭০-৮০ ভাগ, জৈব পদার্থ ও কিছু পরিমাণ বালি থাকায় জলধারণ ক্ষমতা বেশী। মাটির মধ্যে ছিদ্রের পরিমাণ অত্যন্ত কম হওয়ায় জল চুঁইয়ে মাটির মধ্যে যেতে বা বায়ুচলাচল করতে পারে না। এই প্রকার মাটি ধান, গম, ভুট্টা ইত্যাদির পক্ষে উপযুক্ত। (ঘ) **পলিমাটি** (Silty soil) **:** নদীর ঘোলা জল জোয়ারের সময় বা বন্যা হওয়ার ফলে উঁচু জমির উপর উঠলে জল থেকে যে তলানি জমিতে থিতিয়ে পড়ে তাকে পলি বলে। এই মাটি সচ্ছিদ্র হওয়ায় জলধারণ ও বায়ুচলাচলের সুবিধা থাকায় চাষের পক্ষে খুবই উপযুক্ত। এই প্রকার মাটিতে ধান, ভুট্টা, তরিতরকারি প্রচুর ফলে। (ঙ) **লালমাটি** (Red soil) **:** এই প্রকার মাটির রঙ লাল। কারণ এই প্রকার

মাটিতে লৌহ ও অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি খনিজ-লবণ অধিক পরিমাণে থাকে, তবে জৈব পদার্থের পরিমাণ কম হওয়ায় চাষের আগে জৈব পদার্থ মিশিয়ে দিতে হয়। এই প্রকার মাটি চীনাবাদাম ও কার্পাস ইত্যাদি চাষের পক্ষে উপযুক্ত। (চ) **চুনামাটি** (Lime soil): এই প্রকার মাটির মধ্যে কাদা ও বালির সাথে শতকরা প্রায় ১০ ভাগ চুন থাকে। এই প্রকার মাটির জলধারণ ক্ষমতা যথেষ্ট হওয়া সত্ত্বেও ক্ষারধর্মী হওয়ায় চাষের পক্ষে অনুপযুক্ত। তবে অধিক পরিমাণ জৈব সার প্রয়োগে চাষের উপযুক্ত হয়। এই প্রকার মাটিতে গোলাপ গাছ ভাল হয়। (ছ) **বোদ মাটি বা হিউমাস** (Peat or Humus soil): এই প্রকার মাটিতে প্রচুর জৈব পদার্থ (জীবজন্তুর মৃতদেহ, মলমূত্র ও উদ্ভিদ ইত্যাদির পচনের ফলে উৎপন্ন) থাকায় মাটির বর্ণ কালো হয়। এই মাটির জলধারণ ক্ষমতা অধিক, তবে মাটিকে চাষের উপযুক্ত করতে হলে বালি মেশাতে হয়। এই প্রকার মাটিতে চায়ের চাষ ভাল হয়। (জ) **লোনা মাটি** (Saline soil): সমুদ্রের নিকটবর্তী অঞ্চলে এবং যে সব জমিতে সমুদ্রের জল জোয়ারের সময় উঠে আসে সেই জমিতে লবণের আধিক্য বাড়ে। কম লবণাক্ত মাটিতে নারকেল, সুপারী, ধান ও পাট ইত্যাদির চাষ হলেও অধিক লবণাক্ত মাটিতে গেঁওয়া, গরান, সুঁদুরী বা ঝাউ জাতীয় উদ্ভিদ ব্যতীত অন্য কোনও চাষ হয় না। জলে লবণের আধিক্যের জন্য উদ্ভিদের জৈবিক ক্রিয়ার পক্ষে অনুপযুক্ত, এইজন্য এই প্রকার মাটিকে **"শারীরবৃত্তীয় শুষ্কমাটি"** (Physiologically dry soil) বলে।

মাটির উর্বরা শক্তিঃ উর্বরতা কাকে বলেঃ উদ্ভিদের সুষমবৃদ্ধি ও ফসল উৎপাদনের ক্ষমতাকে উর্বরতা বলে। মাটির মধ্যে বিভিন্ন প্রকার মৌল ও জৈব উপাদানের উপস্থিতি, জলধারণ ক্ষমতা, বায়ুচলাচলের সুবিধা, অম্লত্ব বা ক্ষারত্ব ও তাপের পরিমাণের উপর উর্বরতা শক্তি নির্ভরশীল।

NPK ও অন্যান্য খনিজ পদার্থঃ উদ্ভিদের পুষ্টির জন্য পনেরটি মৌলিক পদার্থের প্রয়োজন, সেগুলির মধ্যে কার্বন ব্যতীত বাকি পদার্থগুলি উদ্ভিদ মূলের সাহায্যে মাটি থেকে খনিজ লবণরূপে গ্রহণ করে। এই পদার্থগুলির মধ্যে কয়েকটি অধিক পরিমাণে প্রয়োজন (Macro nutrients), আবার কয়েকটি অল্প পরিমাণে প্রয়োজন (Micro nutrients) হয়। এই সকল মৌলিক পদার্থের মধ্যে **নাইট্রোজেন** (N), **ফসফরাস** (P) **এবং পটাসিয়ামের** (K) প্রয়োজনীয়তা উদ্ভিদের পুষ্টির পক্ষে অত্যধিক, কিন্তু এসকল পদার্থ মাটির মধ্যে নির্দিষ্ট মাত্রায় থাকে।

চাষ-আবাদের ফলে মাটি থেকে এসকল পদার্থের সঞ্চয়ের পরিমাণ কমতে থাকে। অধিক ফসল উৎপাদনের জন্য জমিতে এসকল পদার্থযুক্ত রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা হয়। মাটিতে কোনও অত্যাবশ্যক পদার্থের অভাব হলে মাটি চাষের পক্ষে অনুর্বরা হয়ে পড়ে।

বায়ু ও জল ঃ মাটির অভ্যন্তরে বায়ু ও জল জমির উর্বরতার পক্ষে অত্যাবশ্যক কারণ উদ্ভিদের মূল মাটির মধ্যে বায়ু গ্রহণ করে শ্বাসকার্য চালায়। মূলকর্তৃক পরিত্যক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড ব্যাপনক্রিয়ার দ্বারা মাটি থেকে বেরিয়ে যায় এবং তার পরিবর্তে অক্সিজেন মাটিতে প্রবেশ করে। মাটির মধ্যে ছিদ্রতার উপর এই প্রকার বায়ুচলাচল নির্ভর করে। চাষের কাজে জল অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কারণ বিভিন্ন প্রকার খনিজ লবণ জলে দ্রবণীয় হয়ে মূল কর্তৃক গৃহীত হয়। সালোকসংশ্লেষে প্রয়োজনীয় জল ও মাটি থেকে মূল দ্বারা শোষিত হয়। সেচের বা বৃষ্টির ফলে মাটি জলে ভরে যায় তার মধ্যে একটি বৃহৎ অংশ নদী-নালায় বা ছিদ্র দ্বারা মাটির অভ্যন্তরে চলে যায়। এই জলকে **মহাকর্ষীয় জল** বা **গ্র্যাভিটেশন্যাল জল** (Gravitational water) বলে। এই প্রকার জল মাটির উপরের উর্বর অংশকে ধুয়ে **ভূমিক্ষয়** (Soil erosion) দ্বারা চাষের ক্ষতি করে। মাটির অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নালিকার মধ্যে যে জল সঞ্চিত থেকে উদ্ভিদের মূল দ্বারা গৃহীত হয় তাকে **ক্যাপিলারি জল** (Capillary water) বলে। এইজন্য দো-আঁশ ও পলি মাটিতে অধিক পরিমাণে ক্যাপিলারি জল থাকায় এই প্রকারের মাটি চাষের পক্ষে উপযুক্ত।

অম্লত্ব ও ক্ষারত্ব ঃ মাটির অম্লত্ব ও ক্ষারত্বের পরিমাণ ফসল উৎপাদনের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ অধিকাংশ উদ্ভিদ মাটির **প্রশমিত** (Neutral) অবস্থায় অধিক বাড়তে পারে। লেবু জাতীয় উদ্ভিদ কিন্তু অম্লযুক্ত মাটিতে অধিক ফসল উৎপাদন করে। এইজন্য চাষের কাজে অম্লযুক্ত মাটিতে (বোদমাটি) চুন প্রয়োগ করে প্রশমিত করা হয়।

জৈব সার ঃ মাটির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য যদিও বর্তমানে বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা হচ্ছে তবুও জৈব সার প্রয়োগ করলে মাটি আলগা হয়ে বায়ুচলাচল সহজ করে এবং জলধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। জৈব সার মাটির বড় রকমের রাসায়নিক পরিবর্তন এনে উদ্ভিদের ক্ষতি করে না বরং পচন দ্বারা ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে মাটির উর্বরতা রক্ষা করে।

মাটির উর্বরতা শক্তি রক্ষা ঃ বিভিন্ন প্রকার জীবাণু মাটিতে নাইট্রোজেন

সংযোগ বা বন্ধন ক্রিয়ার দ্বারা মাটির উর্বরতা রক্ষা করে ; বন্যা ও অতিবৃষ্টির ফলে পলি জমে এবং মৃত প্রাণী বা উদ্ভিদ দেহের পচনক্রিয়া দ্বারা জমির উর্বরতা রক্ষিত হয়। সুতরাং আবহমানকাল থেকে চাষ-আবাদের ফলে জমিতে যে পরিমাণ উর্বরতার ক্ষয় হয় তা আবার রক্ষিত হয়।

জীবাণুপুঞ্জ (Microbes) : যুগান্তকারী আবিষ্কারগুলির মধ্যে অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার অন্যতম। কারণ আমাদের চোখের সম্মুখে বিরাট বৈচিত্র্যময় জগৎ তার বিচিত্র উদ্ভিদ ও প্রাণী দ্বারা গঠিত জানা থাকলেও আমাদের দৃষ্টিশক্তির বাইরে যে অতি ক্ষুদ্রকায় প্রাণী বা উদ্ভিদ আছে অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া তা জানা যেত না।

অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারকদের অন্যতম বিজ্ঞানী **লিউভেনহোক** (Antony Van Leeuwenhoek) ১৬৭৫ খ্রীস্টাব্দে ব্যাকটিরিয়া, আদ্যপ্রাণী এবং মানুষের শুক্রাণু তাঁর নিজের তৈরী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আবিষ্কার করেন। ১৬৮১ খ্রীস্টাব্দে তিনি নিজের মলের মধ্যে একপ্রকার আদ্যপ্রাণীর সন্ধান পান, বর্তমানে যার নাম হয়েছে জিয়ার্ডিয়া। **লুই পাস্তুর** (Louis Pasteur) ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দে প্রমাণ করেন যে, বায়ুর মধ্যে ভাসমান ব্যাকটিরিয়াই মাংসের ঝোলের পচনক্রিয়া করে।

মাইক্রোবস্ বা জীবাণু কাকে বলে : যে সকল জীব অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া খালি চোখে দেখা যায় না তাদেরই সাধারণ অর্থে মাইক্রোবস্ বা জীবাণু বলে। এই অর্থে ব্যাকটিরিয়া বা তাদের মত জীব, ছত্রাক এবং আদ্যপ্রাণী ইত্যাদিকেও জীবাণু বলে। এই সকল অদৃশ্য জীব জলে, স্থলে এবং অন্তরীক্ষে সর্বত্রই আছে। এদের আকার ও প্রকার, জীবনধারণ প্রণালী, উপকারিতা ও ক্ষতিকর ক্রিয়া এবং বংশবিস্তার বহু বিচিত্র ধরনের হয়।

(ক) ব্যাকটিরিয়া (Bacteria)

আকার ও গঠন : এই জীবাণুগুলির দেহের গঠন অত্যন্ত সরল এবং কোষীয় পদার্থদ্বারা গঠিত জীবের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রাকার। এদের দেহ দৈর্ঘ্যে প্রায় ৮ মিলিমাইক্রন এবং প্রস্থে ৩·৫ মিলিমাইক্রন (এক মাইক্রন = $\frac{1}{1000}$ মিলিমিটার, এক মিলিমাইক্রন = $\frac{1}{10,000}$ মাইক্রন বা $\frac{1}{10,000,000}$ মিলিমিটার)। প্রতি ব্যাকটিরিয়া কোষ শক্ত আবরণীতে ঢাকা এবং আবরণীর মধ্যে প্রোটোপ্লাজম থাকে। কোষের প্রোটোপ্লাজমে আদি-কেন্দ্রিক নিউক্লিয়াস থাকে। **ব্যাকটিরিয়া কোষের মধ্যে বংশগতির বাহক**

ডি-অক্সি রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড (D.N.A.) থাকলেও মাইটোকনড্রিয়া ও গলজিবডি থাকে না।

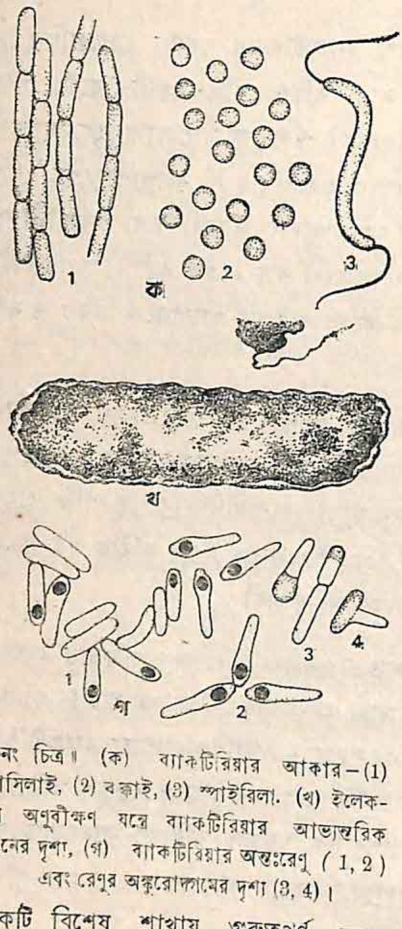
ব্যাকটিরিয়ার পুষ্টিসাধন ঃ অনেক ব্যাকটিরিয়ার কোষে ক্লোরোফিল না থাকায় সালোকসংশ্লেষ করতে পারে না। যদিও নীল-বেগুনী বর্ণের গন্ধক ব্যাকটিরিয়া (Purple sulphur bacteria) ও **সবুজ সালোকসংশ্লেষকারী ব্যাকটিরিয়া** (Green photosynthetic bacteria) সালোকসংশ্লেষ দ্বারা খাদ্য প্রস্তুত করে। অন্যান্য ব্যাকটিরিয়ার মধ্যে অনেকে **মৃতজীবী** বা **পরজীবী**রূপে মৃতদেহের পচন দ্বারা বা অন্য জীবের দেহের মধ্যে খাদ্য সংগ্রহ করে। ব্যাকটিরিয়া তাদের দেহ থেকে উৎসেচক নিঃসরণ করে দেহের বাইরের খাদ্যবস্তুকে তরল ও সরল করে ব্যাপনক্রিয়ায় দেহের মধ্যে শোষণ করে।

শ্বসন ঃ অনেক ব্যাকটিরিয়া অক্সিজেন দ্বারা শ্বসনকার্য চালায়, তাদের **বায়ুজীবী** বলে। আবার অনেক ব্যাকটিরিয়া আছে যাদের শ্বাসকার্য অক্সিজেন ব্যতীত চলে, তাদের **অবায়ুজীবী** বলে। অবায়ুজীবীরা অক্সিজেন ছাড়াই রাসায়নিক ক্রিয়ায় শক্তি উৎপন্ন করে। যথা—**ল্যাকটো ব্যাসিলাস** (Lacto bacillus) দুধ জমিয়ে দই উৎপন্ন করে, টিটেনাস বা তড়কা রোগের ব্যাকটিরিয়াও অবায়ুজীবী।

বংশবৃদ্ধি ঃ ব্যাকটিরিয়া অত্যন্ত দ্রুততার সাথে দ্বিবিভাজন প্রক্রিয়ায় বংশবৃদ্ধি করে। অনেক সময় প্রতি ১৫-২০ মিনিট অন্তর একপ্রকার দ্বিবিভাজন ঘটে। এর ফলে একটিমাত্র ব্যাকটিরিয়া থেকে ১২ ঘণ্টার মধ্যে সতেরো লক্ষাধিক অপত্য ব্যাকটিরিয়ার সৃষ্টি হতে পারে। এই প্রকার বংশবৃদ্ধির জন্য বিশেষ প্রকার খাদ্য ও অনুকূল পরিবেশের প্রয়োজন হয়। কিন্তু ব্যাকটিরিয়ার দ্রুত বংশবৃদ্ধির অনুকূল পরিবেশ সাধারণত সৃষ্টি হয় না, কারণ নিজেদের দেহজাত বর্জ্যপদার্থে নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়, না হলে পৃথিবী শুধুমাত্র ব্যাকটিরিয়াতেই ভরে যেত।

প্রতিকূল পরিবেশে ব্যাকটিরিয়ার দেহের প্রাচীরের মধ্যে গোলাকার বা ডিম্বাকার অন্তঃরেণু বা এণ্ডোস্পোর উৎপন্ন করে। বিভিন্ন প্রকার ব্যাসিলাস এবং ঝাকমকে অন্তঃরেণু দেখা যায়। মাতৃব্যাকটিরিয়া কোষ ও তার শ্রেণীর ব্যাকটিরিয়ায় এই প্রকার অন্তঃরেণু দেখা যায়। মাতৃব্যাকটিরিয়া কোষ ও তার অন্তঃরেণুসহ সমগ্র বস্তুটিকে **রেণুস্থলী** বলে। অন্তঃরেণুর প্রোটোপ্লাজম তার চারদিকে দৃঢ় প্রাচীর সৃষ্টি করে, পরে মাতৃকোষ বা রেণুস্থলীর প্রাচীর গলে রেণুকে মুক্ত করে ; এই প্রকার রেণু বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশে যথা—অত্যধিক তাপ, জলীয় বাষ্পের অভাব বা রাসায়নিক বস্তুর সংস্পর্শেও সহনক্ষম থাকে।

ব্যাকটিরিয়ার শ্রেণীবিভাগঃ ব্যাকটিরিয়া কোষের আকার অনুযায়ী প্রধানতঃ তিন প্রকারের হয়। যথা –(১) **গোলাকার** (Spherical)—এদের কক্কাস্ (Coccus) এবং বহুবচনে কক্কাই বলে। (২) **দণ্ডের বা লাঠির আকার**—এদের ব্যাসিলাস্ (Bacillus) বলে। এবং (৩) **পাকানো সর্পিলাকার**—এদের স্পাইরিলাম (Spirillum) বলে। কক্কাস বা ব্যাসিলাসের অনেক-গুলি কোষ একত্রে সংযুক্ত হয়ে দলবদ্ধ (Colony)-ভাবে সুতোর আকারে (Filament) অবস্থান করে। বহু ব্যাসিলাস ও স্পাইরিলামের আবার দেহের উভয় প্রান্তে এক বা একাধিক সূক্ষ্ম চুলের মত সিলিয়াও থাকে।



৪৩নং চিত্র। (ক) ব্যাকটিরিয়ার আকার–(1) ব্যাসিলাই, (2) কক্কাই, (3) স্পাইরিলা. (খ) ইলেক-ট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ব্যাকটিরিয়ার আভ্যন্তরিক গঠনের দৃশ্য, (গ) ব্যাকটিরিয়ার অন্তঃরেণু (1, 2) এবং রেণুর অঙ্কুরোদ্গমের দৃশ্য (3, 4)।

ব্যাকটিরিয়াকে উদ্ভিদ বলে কেন? ব্যাকটিরিয়া শেওলা বা অ্যালজী জাতীয় উদ্ভিদের মত অতি প্রাচীন। তাদের দেহকোষ সরল প্রকৃতির হলেও তাদের ১৫০ কোটি বৎসরের আগেকার জীবাশ্ম পৃথিবীর মৃত্তিকার স্তরে সঞ্চিত আছে। যুগ যুগ ধরে এবং বর্তমানকালেও তাদের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন জীববিজ্ঞানের একটি বিশেষ শাখায় গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করছে। অনেকে ব্যাকটিরিয়াকে প্রাণী বলে মনে করে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা এদের মধ্যে বহু উদ্ভিদ-বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতির জন্য উদ্ভিদ জগতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। বৈশিষ্ট্যগুলি যথাক্রমে – (১) বহু ব্যাক-টিরিয়াতে ক্লোরোফিলের উপস্থিতি, (২) সেলুলোজ দ্বারা গঠিত কোষপ্রাচীর, (৩) উদ্ভিদের মত ভিটামিন সংশ্লেষ এবং (৪) জনন প্রক্রিয়া।

উদ্ভিদের পুষ্টিসাধন ও ব্যাকটিরিয়াঃ অনেক প্রকার ব্যাকটিরিয়া উদ্ভিদের পুষ্টিসাধনে নাইট্রোজেন সরবরাহে অংশগ্রহণ দ্বারা সহযোগিতা করে, আবার অনেকে বায়ুর মধ্যে মাটির জৈব বস্তুর নাইট্রোজেন মুক্তি দ্বারা ক্ষতিও করে। (ক) **উপকারী**

ব্যাকটিরিয়া নাইট্রোজেন-সংযোগ (Nitrification) ও নাইট্রোজেন-বন্ধন (Nitrogen-fixation) করে। (১) **নাইট্রোজেন-সংযোগ** বিভিন্ন নাইট্রোজেন সংযোগকাররী ব্যাকটিরিয়া। যথা—**নাইট্রোসোমোনাস** বা **নাইট্রোকক্কাস** মাটির মধ্যে অ্যামোনিয়া জাতীয় লবণকে প্রথমে জারণ করে নাইট্রাইটে পরিণত করে। পরে **নাইট্রোব্যাকটার** নামক আরেক প্রকার ব্যাকটিরিয়া নাইট্রাইটকে জারণক্রিয়ার দ্বারা নাইট্রেটে পরিণত করে। উদ্ভিদ নাইট্রেট জাতীয় লবণ গ্রহণ করে দেহে প্রোটিন উৎপন্ন করে।

(২) **বায়ুর নাইট্রোজেন সংযুক্তিকরণ** (Nitrogen-fixation): এই প্রকার জৈবিক ক্রিয়ায় বায়ুর নাইট্রোজেন ব্যাকটিরিয়ার দ্বারা নাইট্রোজেন-ঘটিত জৈব যৌগে পরিবর্তিত হয়। এই সকল ব্যাকটিরিয়ার মৃত্যু হলে তাদের দেহের প্রোটিন বস্তুকে অন্য জাতের ব্যাকটিরিয়া বিয়োজন দ্বারা অ্যামোনিয়াতে পরিণত করে। বায়ুর নাইট্রোজেন সংযুক্তিকরণ মাটির মধ্যে স্বাধীন **অ্যাজাটো-ব্যাকটার** ও **শীম্ব জাতীয়** মূলের মধ্যে অবস্থানকারী **রাইজোবিয়াম** নামক ব্যাকটিরিয়ার দ্বারা সংঘটিত হয়। রাইজোবিয়াম শীম্বজাতীয় উদ্ভিদের মূলে অর্বুদ উৎপাদন ও নাইট্রোজেন সংযুক্তিকরণ করে শীম্বজাতীয় উদ্ভিদকে কিছু পরিমাণ সরবরাহ করে। শীম্বজাতীয় উদ্ভিদ শর্করা উৎপাদন করে ব্যাকটিরিয়ার পুষ্টিসাধনে সাহায্য করে। এই প্রকার সহযোগিতামূলক একত্র অবস্থানকে **অন্যোন্যজীবীত্ব** (Symbiosis) বলে। বায়ুর নাইট্রোজেন এইভাবে চাষ-আবাদে মাটির উর্বরাশক্তি বাড়িয়ে প্রচুর ফসল ফলায়।

(খ) ক্ষতিকারক ব্যাকটিরিয়া ও **নাইট্রোজেন বিযুক্তিকরণ** (Denitrification): **ব্যাকটিরিয়াম ডিনাইট্রিফিক্যান** নামক ব্যাকটিরিয়া মাটির মধ্যের নাইট্রেট জাতীয় লবণকে বিশ্লেষণ করে নাইট্রোজেন গ্যাস মুক্ত করে, ফলে মাটির মধ্যে প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন সারের অভাব ঘটে এবং উদ্ভিদের পুষ্টি সাধিত হয় না।

মানুষের উপকারী ব্যাকটিরিয়া: (১) মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি বিভিন্ন প্রকার নাইট্রোজেন সংযোগ ও সংযুক্তকারী ব্যাকটিরিয়ার দ্বারা ঘটে। এইভাবে আবহমান-কাল ধরে জমির উর্বরতা রক্ষিত হয়। বর্তমানে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে কৃত্রিম উপায়ে শীম্ব জাতীয় উদ্ভিদের মূলের ব্যাকটিরিয়া উৎপাদন করে ফসল উৎপাদনের চেষ্টা হচ্ছে। (২) মৃত প্রাণী ও উদ্ভিদ দেহকে পচনক্রিয়ার দ্বারা প্রকৃতি থেকে গৃহীত বিভিন্ন বস্তুর মুক্তি ঘটিয়ে প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করে। ব্যাকটিরিয়া জীবদেহের পচন না

ঘটালে মৃত জীবদেহে পৃথিবী ভরে যেত। (৩) পনির, দই ও ভিনিগার উৎপাদন বিভিন্ন ব্যাকটিরিয়ার দ্বারা হয়। (৪) বিভিন্ন প্রকার জীবাণু-প্রতিরোধী বা অ্যান্টিবায়োটিক ঔষধ যথা,—**টাইরোথ্রিসিন্, সাবটিলিন, ব্যাকট্রাসিন** ইত্যাদি ব্যাকটিরিয়া থেকে উৎপন্ন হয়। **কোন জীবিত বস্তুর দেহজাত বস্তু থেকে প্রস্তুত ঔষধ যদি অন্য কোন জীববস্তুকে ধ্বংস করে তবে সেই ঔষধকে অ্যান্টিবায়োটিক (Antibiotic) বা জীবাণু-প্রতিরোধী পদার্থ বলে।** (৫) মানুষের অন্ত্রের মধ্যে একপ্রকার ব্যাকটিরিয়া ভিটামিন K উৎপন্ন করে এবং ভিটামিন K অন্ত্রের দ্বারা শোধিত হয়ে রক্তের তঞ্চনে সাহায্য করে।

ক্ষতিকারক রোগসৃষ্টিকারী ব্যাকটিরিয়া ঃ

বিভিন্ন প্রকার রোগসৃষ্টিকারী ব্যাকটিরিয়া মানুষের পক্ষে ক্ষতিকারক। কারণ তারা যে শুধুমাত্র মানুষের দেহে রোগ উৎপন্ন করে তাই নয়, বিভিন্ন গৃহপালিত পশু-পক্ষী এবং ফসলেরও ক্ষতি করে। মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর দেহে ব্যাকটিরিয়া বিষাক্ত পদার্থ বা টক্সিন্ উৎপন্ন করে। মানুষের বিভিন্ন রোগ যথা—**ডিপ্‌থেরিয়া, যক্ষ্মা, টিটেনাস, টাইফয়েড, গনোরিয়া, হুপিং কফ, স্কারলেট জ্বর, কুষ্ঠ ও কলেরা** ইত্যাদি ব্যাকটিরিয়ার আক্রমণে উৎপন্ন হয়।

মুরগি, শুকর ও গরুর যক্ষ্মা, ঘোড়া ও গাধার গ্লানডর (Glander) নামক সংক্রামক রোগ ইত্যাদিও ব্যাকটিরিয়া উৎপন্ন করে। উদ্ভিদের ফল, ফুল, পাতা ও কাণ্ড শুকিয়ে যাওয়া (Wilting) রোগ জাইলেমবাহিকার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ব্যাকটিরিয়ার একত্রে থাকার ফলে জল সংবহন বন্ধ হওয়ায় ঘটে। পাতায় দাগ ও কাণ্ডের গায়ে ফোঁড়ার মত স্ফীতি ও টিউমার বিভিন্ন ব্যাকটিরিয়ার আক্রমণে ঘটে।

(খ) অন্যান্য আণুবীক্ষণিক জীব ঃ

ব্যাকটিরিয়ার সঙ্গে কোষের আকার, আয়তন ও অন্যান্য বহু বিষয়ে সাদৃশ্য থাকায় আরও কয়েক প্রকার আণুবীক্ষণিক জীবকে ব্যাকটিরিয়ার সাথে যুক্ত করা হয়। এগুলি হচ্ছে **স্পাইরোকিটিস্** (Spirochetes), **মাইকোপ্লাজম** (Mycoplasm) ও **রিকেটসিয়া** (Rickettsia) ইত্যাদি।

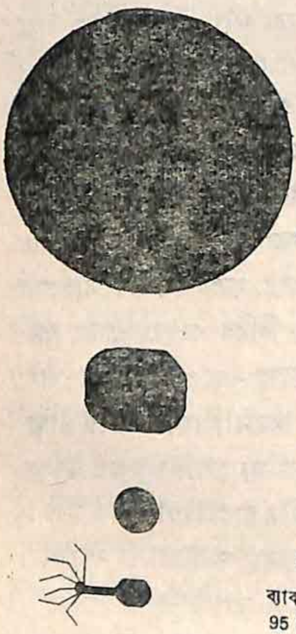
(১) **স্পাইরোকিটিসের** আকার লম্বা, পাতলা ও সর্পিল হয়। এদের আয়তন প্রায় ৫০০ মিলি মাইক্রন। তবে ব্যাকটিরিয়ার মত এদের দেহের বাইরে শক্ত কোষপ্রাচীর নেই। বহু স্পাইরোকিটিস্ ক্ষতিকারক নয়। এরা জলে, মাটিতে অথবা প্রাণীর দেহে বাস করে। কিন্তু একপ্রকার স্পাইরোকিটিস মানুষের **সিফিলিস** (Syphillis) নামক রোগ উৎপন্ন করে।

(২) **মাইকোপ্লাজম** নামক জীবাণুরও কোন কোষ প্রাচীর নেই। অনেকে স্বাধীন আবার অনেকে পরজীবী। এরা আমাদের জানা সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র জীব। কারণ এদের আকার প্রায় ০.১ মিলিমাইক্রন, এজন্য ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতীত এদের দেখা যায় না। এরা একপ্রকার নিউমোনিয়া রোগ উৎপন্ন করে। (৩) **রিকেটসিয়া** নামক জীবাণু মাইকোপ্লাজমের মত এত ক্ষুদ্র যে, এদের ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখতে পাওয়া যায় না। এদের প্রায় সকলেই বাধ্যতামূলক পরজীবী। কারণ এরা কেবলমাত্র জীবিত কোষের মধ্যেই বৃদ্ধি ও জননক্রিয়া করতে পারে। বহুক্ষেত্রে তারা নির্দোষভাবে থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে ক্ষতিকর রোগ সৃষ্টি করে। টাইফাস্ নামক দেহের উকুন দ্বারা সংক্রামিত জ্বর এক প্রকার রিকেটসিয়া দ্বারা সংঘটিত হয়। (৪) **অ্যাকটিনোমাইসেটিস্** (Actinomycetes) এক প্রকার ছত্রাক ও ব্যাকটিরিয়ার মত জীব এবং দেহের জৈব রাসায়নিক গঠন, কোষ ও নিউক্লিয়সংগঠন এক প্রকারের হওয়ায় উভয়ের সাথে সম্বন্ধযুক্ত। এই প্রকার আণুবীক্ষণিক জীব থেকে অমূল্য অ্যান্টিবায়োটিক ঔষধ, যথা, টেরামাইসিন, অরোমাইসিন এবং স্ট্রেপ্টোমাইসিন ইত্যাদি উৎপন্ন করে জীবদেহে বিভিন্ন প্রকার রোগ বিস্তার বন্ধ করা যায়। (৫) **বিভিন্ন প্রকার আত্মপ্রাণী** (Protozoa) **:** আণুবীক্ষণিক এককোষী জীব এবং ব্যাকটিরিয়াদের অপেক্ষা এদের দেহ অনেক বেশী সুগঠিত। পৃথিবীতে অসংখ্য আত্মপ্রাণী আছে, এদের মধ্যে অনেকে মানুষের বা অন্যান্য প্রাণীর কোনও ক্ষতি করে না। আবার অনেকে বিভিন্ন প্রকার রোগ সৃষ্টি করে। **এণ্টামিবা হিস্টোলাইটিকা** নাক আত্মপ্রাণী মানুষের অন্ত্রে পরজীবীরূপে বাস করে ক্ষতিকর **রক্ত আমাশয়** রোগ উৎপন্ন করে। **প্ল্যাসমোডিয়াম ভাইভাক্স** নামক পরজীবী আত্মপ্রাণী মানুষের দেহের রক্তের মধ্যে থেকে **ম্যালেরিয়া** জ্বর উৎপন্ন করে। এই রোগের সংক্রমণ অ্যানোফিলিস জাতের মশকীর দ্বারা বিস্তার লাভ করে। **লিসম্যানিয়া ডনোভানি** ও **ট্রাইপ্যানোজোমা** নামক আত্মপ্রাণীরা যথাক্রমে মানুষের **কালাজ্বর, নিদ্রারোগ** (Sleeping sickness) ইত্যাদি উৎপন্ন করে।

ভাইরাস (Virus) : বর্তমানে আমরা বিভিন্ন প্রকার রোগসৃষ্টিকারী জড় ও জীবের মধ্যবর্তী অতি-আণুবীক্ষণিক (যা সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের দৃষ্টিগ্রাহ্য নয়) একপ্রকার বস্তু বা ভাইরাসদের জানি। ভাইরাসের আবিষ্কার অত্যন্ত তাৎপর্যময়। বিখ্যাত ফরাসী জীবাণু বিজ্ঞানী **লুই পাস্তুর** গোরু-মহিষের অতিসংক্রামক প্লুরোনিউমোনিয়া নামক রোগ সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যায় না এই প্রকার জীবাণু আক্রমণের ফল বলে ধারণা করেন। প্রায় একই সময়ে রুশ বিজ্ঞানী **ডিমিট্রি**

আয়ানোভস্কি (১৮৯২ খ্রীস্টাব্দ) মোজাইক রোগগ্রস্ত তামাক পাতা পেষণ করে সেই দ্রবণ ব্যাকটিরিয়া পরিস্রাবণ অযোগ্য অনুজ্জ্বল চীনামাটি ফিল্টারের মাধ্যমে ব্যাকটিরিয়াযুক্ত পরিস্রুত বের করেন। এই তরল পদার্থ নীরোগ তামাক পাতায় দিলে তামাক পাতায় মোজাইক রোগের আক্রমণ হয় লক্ষ্য করেন, তিনিও পাস্তুরের মত ব্যাকটিরিয়া অপেক্ষা অতিক্ষুদ্র জীবাণুর অস্তিত্বের ধারণা করেন। পরবর্তীকালে (১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে) হল্যাণ্ডবাসী বিজ্ঞানী **বাইজেরিঙ্ক** এই রোগসৃষ্টিকারী বস্তুটির ভাইরাস নামকরণ করেন। তামাক পাতায় মোজাইক রোগসৃষ্টিকারী ভাইরাসের নাম টোব্যাকো মোজাইক ভাইরাস সংক্ষেপে T. M. V.

ভাইরাসের গঠন ঃ অধিকাংশ ভাইরাসের আকার এত ক্ষুদ্র যে, তারা পরিস্রাবণের যোগ্য এবং সহজেই ফিল্টারের ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে যায়। সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে এদের দেখা যায় না (বসন্তের ভাইরাস ছাড়া) কেবলমাত্র ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেই দেখা যায়। ভাইরাসের আয়তন এত ক্ষুদ্র যে, মিলিমাইক্রন মাপের দ্বারা প্রকাশ করা হয়।



৪৪নং চিত্র॥ সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র ব্যাকটিরিয়া (সেরা-সয়া) ও বিভিন্ন ভাইরাসের তুলনামূলক আকারের দৃশ্য।

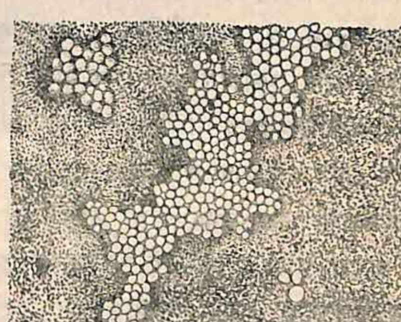
ভাইরাসের আকার বিভিন্ন প্রকার—যথা, গোলাকার, ডিম্বাকার, বহু-ভুজাকার, অনেকের আবার দণ্ডাকার বা সুতোর মত হয়। ব্যাকটিরিয়া ধ্বংসকারী ভাইরাস—**ফাজ** ব্যাঙাচির আকৃতির মস্তক ও লেজ যুক্ত হয়।

রাসায়নিক গঠন ঃ ভাইরাসের চারদিকে প্রোটিন আবরণী এবং মধ্যে নিউক্লিক অ্যাসিড থাকে। নিউক্লিক অ্যাসিড DNA (ডি-অক্সি. রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড) বা RNA (রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড) যে

কোনও এক প্রকারের থাকে, উভয়ে একত্রে থাকে না। ব্যাকটেরিয়া ভাইরাসে ডি-অক্সি রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড থাকে।

ভাইরাসের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য : (১) ভাইরাস কেবলমাত্র জীবিত কোষের মধ্যে সক্রিয়তা লাভ করে বংশ বৃদ্ধি করতে পারে এবং প্রত্যেকেই বাধ্যতামূলক পরজীবীরূপে রোগ সৃষ্টি করে। (২) ইহাদের শ্বসন ও বিপাক ক্রিয়া হয় না এবং দেহ কোষ বা প্রোটোপ্লাজম দ্বারা গঠিত নয়। (৩) ভাইরাস আক্রমণের ফলে নির্দিষ্ট কোষে পরিবর্তন ঘটে। জলাতঙ্ক রোগের ফলে মস্তিষ্কের কোষের মধ্যে নির্ণয়যোগ্য বস্তু উৎপন্ন হয়। (৪) ভাইরাস আক্রমণের ফলে যে রোগ দেখা দেয় তার ফলে দেহের মধ্যে 'অর্জিত অনাক্রম্যতা' (Acquired immunity) উৎপন্ন হওয়ায় পুনর্বার ঐ ভাইরাস আক্রমণের সম্ভাবনা দূর হয়। একবার কোন ব্যক্তির বসন্ত রোগ হলে তার আর ঐ রোগ হয় না। যদিও ঠাণ্ডা লেগে একবার সর্দি-কাশি হওয়ার পরেও আবার সর্দি-কাশি হয় কিন্তু এটি একটি ব্যতিক্রম। (৫) অধিকাংশ ভাইরাস-ঘটিত রোগই সংক্রামক। তবে কারও দেহে একটি ভাইরাস আক্রমণ দ্বারা রোগ উৎপন্ন হলে অন্য ভাইরাস আক্রমণ করতে পারে না। ভাইরাস আক্রমণের ফলে দেহের মধ্যে উৎপন্ন **এন্টিফেরন** (Antiferon) নামক বস্তু অন্য ভাইরাসের আক্রমণ রোধ করে।

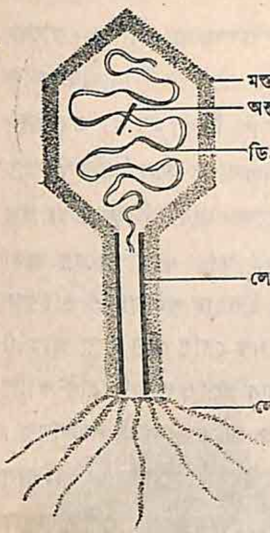
ভাইরাস দ্বারা উৎপন্ন বিভিন্ন রোগ : (ক) মানুষের ইনফ্লুয়েঞ্জা, সর্দি-কাশি, মাম্পস, পলিওমায়েলাইটিস, গুটি ও পানি বসন্ত, জলাতঙ্ক, হাম, ডেঙ্গুজর ও পীতজ্বর ইত্যাদি। (খ) অন্যান্য প্রাণীর রোগ : শূকরের কলেরা (Hog cholera), পা ও মুখের রোগ ইত্যাদি। (গ) উদ্ভিদের রোগ : তামাক পাতা ও টম্যাটো পাতার মোজাইক রোগ, আলু, গম, কপি ও আখ, বীট, টম্যাটো ইত্যাদির ধসা রোগ।



৪৫নং চিত্র ॥ পলিওমায়েলাইটিস রোগসৃষ্টিকারী ভাইরাস।

উপরোক্ত রোগগুলি ব্যতীত ভাইরাস বিভিন্ন প্রাণী ও মানুষের দেহে অত্যন্ত মারাত্মক ধরনের টিউমার সৃষ্টি করে। এমনকি মারাত্মক **কর্কট** রোগের (ক্যানসার) কারণও অনেক সময় ভাইরাস আক্রমণের ফল।

ভাইরাস কি জীব ঃ ভাইরাস জীব না জড় এই প্রশ্ন বহুদিন যাবৎ বিজ্ঞানীদের চিন্তান্বিত করেছে। ভাইরাসের বহু ক্রিয়া জীবের মত আবার বহু ক্রিয়া জড়ের মত। জীবের মত ভাইরাসের দেহ জৈব যৌগ বস্তুর দ্বারা গঠিত। অন্যান্য জীবের মত ভাইরাসের বংশগত বৈশিষ্ট্য নিউক্লিক অ্যাসিড দ্বারা পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে বাহিত হয়। আবার জড়ের মত ভাইরাসের দেহ কোষ দ্বারা গঠিত নয় এবং তারা নিষ্ক্রিয় অবস্থায় বায়ু বা মাটিতে থাকে। জড়ের মত তাদের প্রোটিন কেলাসিত হতে পারে। কিন্তু জীবিত কোষের সংস্পর্শে আসা মাত্র ভাইরাস জীবের মত আচরণ করতে থাকে। তবে ভাইরাস জীবের মত তাদের দেহের বিভাজন দ্বারা বংশ বৃদ্ধি করে না বা দেহের বৃদ্ধিও ঘটাতে পারে না।



৪৬নং চিত্র ॥ ব্যাকটিরিওফাজের অন্তর্গঠনের দৃশ্য।

ভাইরাসের মধ্যে জড় ও জীবের কয়েকটি গুণ বর্তমান থাকায় ভাইরাসকে জীব ও জড়ের মধ্যবর্তী অবস্থা বলে ধরা হয়।

ভাইরাস ও ব্যাকটিরিয়ার পার্থক্য ঃ ভাইরাসের দেহে প্রোটোপ্লাজম, নিউক্লিয়স এবং ক্রোমোজোম থাকে না। কিন্তু ব্যাকটিরিয়াতে এই বস্তুগুলি থাকে।

ব্যাকটিরিওফাজ্ (Bacteriophase) ঃ বহু ব্যাকটিরিয়া উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষের রোগ সৃষ্টি দ্বারা ক্ষতি করে। এই সব ব্যাকটিরিয়া যদি ধ্বংস না হয়, তাহলে অন্যান্য জীবের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব হবে না। প্রকৃতিতে ভারসাম্য রক্ষার এমন সুন্দর ব্যবস্থা আছে যাতে এই অঘটন সাধারণত ঘটবে না। কারণ বহু ব্যাকটিরিয়া আবার ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই সব ভাইরাসকে **ব্যাকটিরিওফাজ** বলে।

———

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বিভিন্ন বিষয়ে পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্রদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সঞ্চয়
(Students should acquire individual experience by experimentation on Various items)

উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে নাইট্রোজেন, ফসফরাস এবং পটাসিয়ামের ভূমিকা

স্বভোজী উদ্ভিদের পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য কয়েকটি অত্যাবশ্যকীয় মৌল উপাদানের প্রয়োজন (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে উদ্ভিদের পুষ্টি দেখ)। এই সব পদার্থের মধ্যে যেগুলি অধিক পরিমাণে প্রয়োজন হয় তাদের অধিক প্রয়োজনীয় মৌল উপাদান বা ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্টস্ (Macro nutrients) এবং অল্প পরিমাণে প্রয়োজন তাদের অল্প প্রয়োজনীয় উপাদান বা মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস্ (Micro nutrients) বলে। এই সব অত্যাবশ্যকীয় মৌল উপাদান উদ্ভিদের কি পরিমাণে লাগে এবং অভাবে উদ্ভিদের মধ্যে কি কি প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তা বিভিন্ন পরিমাণে মৌল উপাদানগুলির মিশ্রণে বা কয়েকটি উপাদান বাদ দিয়ে পরীক্ষা করলে বুঝতে পারা যায়। এই পরীক্ষায় জার্মান বিজ্ঞানী স্যাক (Sach) ও নপ (Knop) বিভিন্ন মৌল উপাদানের মাত্রা যেভাবে নির্দিষ্ট করে দ্রবণের দ্বারা পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন এখানেও সেই পন্থা অবলম্বন করা যায়। যদি বিভিন্ন উপাদান জলে দ্রবীভূত করে তাতে উদ্ভিদ লাগানো যায় সেই পরীক্ষাকে **'জলকৃষ্টি পরীক্ষা'** (Water culture experiment) অথবা মোটাদানার বালি ধুয়ে তাতে মৌল বস্তুগুলির দ্রবণ প্রয়োগদ্বারা পরীক্ষাকে **'বালুকা-কৃষ্টি পরীক্ষা'** (Sand culture experiment) বলে।

পরীক্ষার উদ্দেশ্য ঃ হাতে-কলমে পরীক্ষার দ্বারা অতি সহজে অনেক দুর্বোধ্য বিষয়ও সহজবোধ্য হয়। বিভিন্ন অত্যাবশ্যক মৌল উপাদানের মধ্যে নাইট্রোজেন (N), ফসফরাস (P) এবং পটাসিয়াম (K) যে কি পরিমাণে প্রয়োজনীয় এবং জমিতে এই

উপাদান-ঘটিত রাসায়নিক সার প্রয়োগের আগে এদের অভাব হলে উদ্ভিদে কি প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তা ছাত্রেরা এই পরীক্ষার মাধ্যমে জানতে পারবে। বালুকা-কৃষ্টি পরীক্ষায় উদ্ভিদের মূল সহজে বালির ছিদ্র থেকে অক্সিজেন নিতে বা মূলদ্বারা গাছটিকে ধরে রাখতে পারবে। এইজন্য এখানে বালুকা-কৃষ্টি পরীক্ষার ব্যবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে।

পরীক্ষার জন্য প্রয়োজন ঃ (১) মাঝারি আকারের চারটি মাটির টব এবং টবের তলদেশে ছিদ্র থাকায় টবগুলি পলিথিন কাগজ দিয়ে ঢেকে দিতে হবে, না হলে দ্রবণ বেরিয়ে যাবে। (২) ভাল করে ধোয়া মোটা দানার বালি দিয়ে টব চারটি ভরতে হবে এবং টবগুলিকে যথাক্রমে ক, খ, গ ও ঘ চিহ্নিত করতে হবে। (৩) **নপের ফরমূলা** (Knop's Formula) অনুযায়ী চারটি বিভিন্ন প্রকারের দ্রবণ প্রস্তুত করতে হবে। প্রথম দ্রবণে সব উপাদানগুলি থাকবে এবং পরবর্তী দ্রবণ তিনটিতে যথাক্রমে—নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাসিয়াম লবণ বাদ দিয়ে অন্য লবণ দিতে হবে। (৪) চারটি ছোলা, ধান, টম্যাটো বা নিমের (যে কোনও একপ্রকার) সুস্থ ও সতেজ চারাগাছ যোগাড় করতে হবে।

নপের বিভিন্ন দ্রবণের (Knop's solution) ফরমূলা ঃ

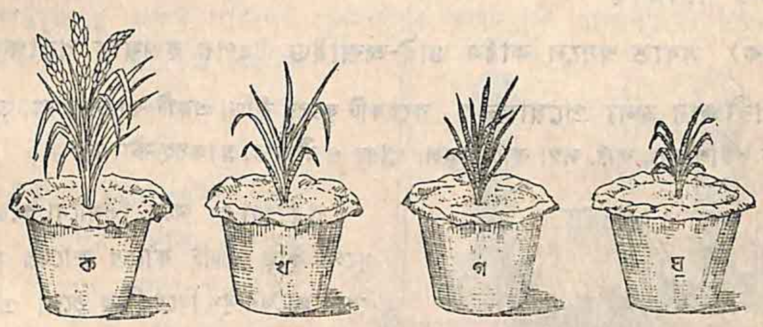
প্রথম দ্রবণ (সব কটি উপাদানযুক্ত) ঃ (১) পটাসিয়াম নাইট্রে (KNO_3) —০·২ গ্রাম ; (২) পটাসিয়াম ডাই-হাইড্রোজেন ফসফেট (KH_2PO_4)—০·২ গ্রাম ; (৩) ক্যালসিয়াম নাইট্রেট [($CaNO_3)_2$]—০·৮ গ্রাম ; (৪) ম্যাগনেসিয়াম সালফেট ($MgSO_4$)—০·২ গ্রাম ; (৫) ফেরিক ফসফেট—সামান্য পরিমাণ ; (৬) পাতিত জল—১০০০ মিলিলিটার।

দ্বিতীয় দ্রবণ—নাইট্রোজেনবিহীন ঃ উপরের প্রথম দ্রবণের মত সব কটি উপাদান থাকবে তবে ১ ও ৩নং-এর পরিবর্তে পটাসিয়াম ক্লোরাইড (KCl)—০·২ গ্রাম ও ক্যালসিয়াম ফসফেট [$(Ca_3PO_4)_2$]—০·৫ গ্রাম দিলে নাইট্রোজেনবিহীন করা যাবে।

তৃতীয় দ্রবণ—ফসফরাসবিহীন ঃ প্রথম দ্রবণের ২ ও ৫নং উপাদানের পরিবর্তে পটাসিয়াম ক্লোরাইড ০·২ গ্রাম এবং ফেরিক ক্লোরাইড সামান্য পরিমাণে দিলে ফসফরাসবিহীন দ্রবণ প্রস্তুত হবে।

চতুর্থ দ্রবণ—পটাসিয়ামবিহীন : প্রথম দ্রবণের ১ ও ২নং উপাদানের পরিবর্তে অ্যামোনিয়াম সালফেট [$(NH_4)_2SO_4$]-০·২ গ্রাম ও ক্যালসিয়াম ফসফেট [$Ca'PO_4)_3$]-০·২ গ্রাম দিতে হবে।

পরীক্ষা : প্রথম থেকে চতুর্থ টবের বালির সঙ্গে যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ নপের দ্রবণ ভালভাবে মেশাতে হবে। পরে ধান, গম, ছোলা, নিম বা অন্য যে-কোনও উদ্ভিদের চারটি একই প্রকারের চারা প্রতি টবে একটি করে লাগাতে হবে।



৪৭নং চিত্র ॥ বালুকা-কৃষ্টি পরীক্ষা—(ক) নপের দ্রবণে ধানগাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি। (খ) নাইট্রোজেনবিহীন দ্রবণ, (গ) ফসফরাসবিহীন দ্রবণ এবং (ঘ) পটাসিয়ামবিহীন দ্রবণে উদ্ভিদের অসম বৃদ্ধির দৃশ্য।

প্রতি সপ্তাহে ২০০ মিলিলিটার পরিমাণ নপের বিভিন্ন দ্রবণ নির্দিষ্ট টবে প্রয়োগ করতে এবং প্রতিদিন পরিমাণ মত জল টবে দিতে হবে। কারণ বালির জলধারণ ক্ষমতা অত্যন্ত কম সেজন্য চারাগুলি শুকিয়ে যেতে পারে।

নিরীক্ষা : প্রতি ১০ দিন অন্তর চারাগুলির বৃদ্ধির হার, পাতার আকার, আয়তন ও বর্ণের পরিবর্তন লক্ষ্য রাখতে হবে। এইভাবে চারাগুলির কয়েক দিন অন্তর যা কিছু পরিবর্তন হচ্ছে, কতদিন বাঁচছে বা শুকিয়ে যাচ্ছে কিনা, Work Book বা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার খাতায় তা লিখে রাখতে হবে।

সিদ্ধান্ত : প্রতিটি টবের চারাগাছগুলির বৃদ্ধি ও অন্যান্য পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, প্রথম টবে (ক) উদ্ভিদের পক্ষে প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন, ফসফেট এবং পটাসিয়াম উপযুক্ত মাত্রায় থাকায় সুষম বৃদ্ধি ঘটেছে। দ্বিতীয় টবে (খ) নাইট্রোজেন না থাকায় উদ্ভিদের বৃদ্ধির হার ও সতেজতার হ্রাস, পাতায় হলদে দাগ ইত্যাদি নাইট্রোজেনের অভাবের ফলে হয়েছে। তৃতীয় টবে (গ) উদ্ভিদটির বৃদ্ধির হার দ্বিতীয় টবের উদ্ভিদ অপেক্ষা কম এবং পাতাগুলির শুকিয়ে যাওয়া ফসফরাস

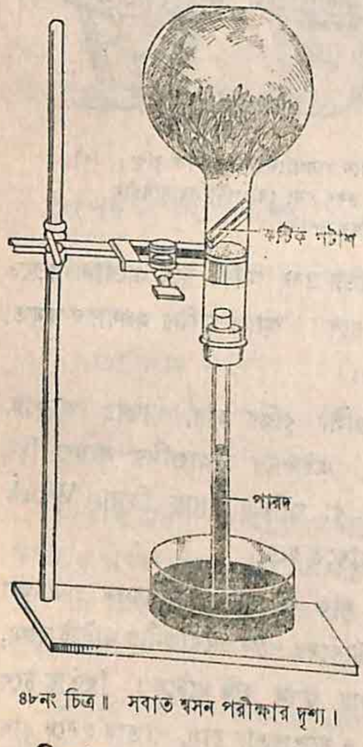
অভাবের ফল। চতুর্থ টবের (ঘ) উদ্ভিদটির বৃদ্ধির হার সর্বাপেক্ষা কম, অগ্রমুকুল না বেড়ে পার্শ্বস্থ মুকুল বাড়ে বলে ঝোপের মত দেখতে হয় এবং পাতায় ফ্যাকাসে হলদে বর্ণের ছাপ ইত্যাদি পটাসিয়াম অভাবের ফল।

শ্বসন ও সালোকসংশ্লেষের পরীক্ষা

শ্বসনের পরীক্ষা ঃ

(ক) সবাত শ্বসনে কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হওয়ার পরীক্ষা ঃ

পরীক্ষার জন্য প্রয়োজন ঃ কয়েকটি ফুলের কুঁড়ি, একটি কাচের ফ্লাস্ক, তুলো, কষ্টিক পটাশ দণ্ড, কর্ক, লম্বা কাচের নল, পারদ ও বীকার, ফ্লাস্কসহ স্ট্যাণ্ড।



৪৮নং চিত্র ॥ সবাত শ্বসন পরীক্ষার দৃশ্য।

পরীক্ষা ঃ জলে ভিজানো কয়েকটি ফুলের কুঁড়ি একটি কাচের ফ্লাস্কের মধ্যে রেখে ফ্লাস্কের মুখ দিয়ে কিছু তুলো প্রবেশ করানো হল। পরে ফ্লাস্কের মুখ দিয়ে একটি কষ্টিক পটাশ দণ্ড প্রবেশ করিয়ে একটি কর্ক ও কর্কের মধ্যে সরু ও লম্বা কাচের নল সংযুক্ত করে ফ্লাস্কের মুখটি বন্ধ করা হল। একটি কাচের বীকার অর্ধেক পারদপূর্ণ করে তার উপরে ফ্লাস্কটি এমন-ভাবে উপুড় করা হল যাতে কাচের নলটি পারদের মধ্যে ডুবে থাকে, এই অবস্থায় ফ্লাস্কটি স্ট্যাণ্ড ও তৎসংলগ্ন ক্ল্যাম্পের সাহায্যে আটকিয়ে রাখা হল।

নিরীক্ষা ঃ কিছু সময় পরে দেখা গেল যে, কাচের সরু নল দিয়ে পারদ ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠছে।

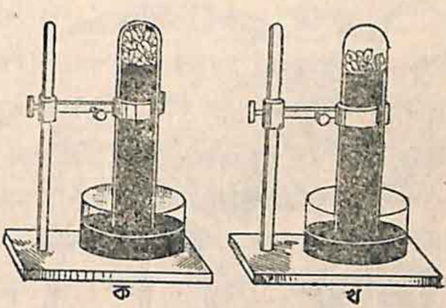
সিদ্ধান্ত ঃ ফ্লাস্কের মধ্যে বায়ু থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে ফুলের কুঁড়ি শ্বাসকার্য চালানোর ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয়। এই কার্বন ডাই-অক্সাইড ফ্লাস্কের

মধ্যে বেরিয়ে এলে কষ্টিক পটাশ শোষণ করায় ফ্লাস্কের ভেতরে শূন্যতার সৃষ্টি হয় এবং বায়ুর চাপ কমে যাওয়ায় পারদ উপরের দিকে উঠতে থাকে।

(খ) অবাত শ্বসনের পরীক্ষা ঃ

পরীক্ষার জন্য প্রয়োজন ঃ কয়েকটি অঙ্কুরিত ছোলাবীজ, একটি টেস্ট টিউব, বীকার, পারদ, ক্ল্যাম্পসহ স্ট্যাণ্ড ও কষ্টিক পটাশ দণ্ড।

পরীক্ষা ঃ একটি পারদপূর্ণ টেস্ট টিউব একটি অর্ধ পারদপূর্ণ বীকারের মধ্যে উপুড় করে রেখে কয়েকটি অঙ্কুরিত ও বাইরের খোসা ছাড়ানো ছোলা বীজ বাঁকানো চিমটার সাহায্যে টেস্ট টিউবের মধ্যে প্রবেশ করান হল। ছাড়ানো ছোলা বীজগুলি পারদ অপেক্ষা তাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব কম হওয়ায় পারদের উপরে ভাসতে থাকবে। ছোলাগুলি এভাবে প্রবেশ করানো হল যাতে একটু বাতাসও ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে। এই অবস্থায় টেস্ট টিউবটি স্ট্যাণ্ড ও ক্ল্যাম্পের সাহায্যে বীকারের সাথে সংযুক্ত করা হল।



৪৯নং চিত্র ॥ অবাত শ্বসনের পরীক্ষা—(ক) প্রথম পর্যায় এবং (খ) দ্বিতীয় পর্যায়ের দৃশ্য।

নিরীক্ষা ঃ কয়েক ঘণ্টা বা একদিন পরে দেখা গেল যে, টেস্ট টিউবের উল্টানো উপর দিকের কিছু অংশ পারদ ও ছোলা বীজসহ নেমে এসেছে। এবার একখণ্ড কষ্টিক পটাশ বাঁকানো চিম্‌টার সাহায্যে টেস্ট টিউবের পারদের মধ্যে প্রবেশ করানো হল, কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল যে, পারদ আবার টেস্ট টিউবের শূন্যস্থানটি পূর্ণ করল।

সিদ্ধান্ত ঃ টেস্ট টিউবের মধ্যে পারদ ছাড়া বায়ু ছিল না। পরে পারদকে নামিয়ে যে বায়ু শূন্য স্থান দখল করল তা কার্বন ডাই-অক্সাইড। কারণ এই বায়ু কষ্টিক পটাশ দ্বারা শোষিত হয়েছে। কার্বন ডাই-অক্সাইড বীজের শ্বাসক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন হলেও, এই শ্বাসক্রিয়ায় অক্সিজেন না থাকায় রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ক্রেবস্‌-চক্র ঘটবে না এবং অন্তর্বর্তী বস্তু যথা, ইথাইল অ্যালকোহল, ল্যাকটিক অ্যাসিড ইত্যাদি উৎপন্ন হবে। অক্সিজেন ব্যতীত শ্বসনকে **অবাত শ্বসন** বা **সন্ধান** (Fermentation) বলে।

সালোকসংশ্লেষ বিষয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা

(ক) সালোকসংশ্লেষ কার্বন ডাই-অক্সাইড ব্যতীত হয় না।

পরীক্ষার জন্য প্রয়োজন ঃ টবে লাগান গাছ, দ্বিখণ্ডিত কর্ক, বোতল, কষ্টিক পটাশ দ্রবণ এবং আয়োডিন দ্রবণ ইত্যাদি।

পরীক্ষা ঃ একটি সবুজ দীর্ঘ পাতাযুক্ত টবে লাগান গাছ কয়েকদিন অন্ধকারে রাখতে হবে, যাতে সালোকসংশ্লেষ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায় এবং শ্বেতসার জাতীয় পদার্থ পাতায় না থাকে। পরীক্ষার দিন ভোরে একটি পাতার অর্ধেক অংশ একটি বোতলের দ্বিখণ্ডিত কর্কের মধ্য দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করান হল এবং বোতলের মধ্যে আগে থেকে কষ্টিক পটাশ দ্রবণ (KOH Solution) দেওয়া ছিল। এবার কর্কটি ভেসলিন দিয়ে বেশ শক্ত করে পাতার মধ্যভাগসহ বোতলের মুখে আটকানো হল যাতে বাইরের বায়ু ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে। এই অবস্থায় সূর্যের আলোয় কয়েক ঘণ্টা রাখা হল, বোতলের মধ্যে কষ্টিক পটাশ দ্রবণ কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করায় বোতলের অভ্যন্তরস্থ পাতার অংশটি কার্বন ডাই-অক্সাইড পাবে না, কিন্তু বোতলের বাইরের অংশটি বায়ু থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড পাবে।



৫০নং চিত্র। কার্বন ডাই-অক্সাইড ব্যতীত সালোকসংশ্লেষ হয় না—পরীক্ষার দৃশ্য।

নিরীক্ষা ঃ বিকেলে পাতাটি বোতল থেকে বের করে গাছ থেকে বিযুক্ত করবার পর গরম অ্যালকোহলে ক্লোরোফিলমুক্ত করে, জলে ধুয়ে আয়োডিন দ্রব দিলে বোতলের অভ্যন্তরের অংশটি হলদে এবং বাইরের অংশটি গাঢ় নীল রঙের হয়েছে দেখা যায়।

সিদ্ধান্ত ঃ বোতলের মধ্যে কষ্টিক পটাশ দ্রবণ কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করায় সূর্যালোক এবং জল থাকা সত্ত্বেও পাতার অর্ধাংশে সালোকসংশ্লেষ হয়নি, বাইরে কার্বন ডাই-অক্সাইড, সূর্যালোক এবং জল থাকায় সালোকসংশ্লেষ হয়েছে। এর দ্বারা

প্রমাণিত হয় যে, **কার্বন ডাই-অক্সাইড সালোকসংশ্লেষে অপরিহার্য বস্তু।** এই পরীক্ষাকে **মোলের অর্ধপত্র পরীক্ষা** (Moll's half-leaf test) বলে।

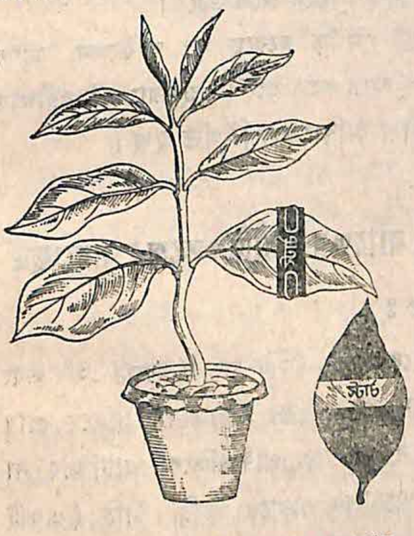
(খ) সালোকসংশ্লেষে সূর্যালোকের প্রয়োজনীয়তার পরীক্ষা।

পরীক্ষার জন্য প্রয়োজন ঃ সমান মাপের তুটি কাল কাগজে ধারালো ছুরির সাহায্যে স্টার্চ কথাটি কেটে লিখতে হবে, টবে লাগানো গাছ, আয়োডিন দ্রবণ ও অ্যালকোহল প্রভৃতি।

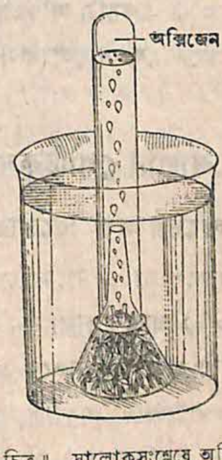
পরীক্ষা ঃ একটি টবে লাগানো গাছ কয়েকদিন অন্ধকার ঘরে রাখবার পর পাতায় শ্বেতসার জাতীয় পদার্থ শূন্য হলে খুব ভোরে ঐ গাছের একটি পাতার উভয় দিক ভালভাবে তুটি কালো কাগজে স্টার্চ কথাটি কেটে লেখাকে ক্লিপের সাহায্যে আটকিয়ে সূর্যালোকে রাখতে হবে। বিকেলে ঐ পাতাটির কালো কাগজের আবরণটি খুলে আগের পরীক্ষার মত অ্যালকোহলে ক্লোরোফিলমুক্ত করে আয়োডিন দ্রবণ প্রয়োগ করতে হবে।

নিরীক্ষা ঃ পাতার যে অংশটি কালো কাগজে ঢাকা ছিল সেই অংশটিতে আকৃতি হলুদ বর্ণ এবং খোলা স্টার্চ কথাটির অংশ ঘন নীলবর্ণ হয়েছে দেখা যাবে।

সিদ্ধান্ত ঃ কালো কাগজ দিয়ে ঢাকা অংশটি সূর্যালোক না পাওয়ায় ঐ অংশটিতে সালোকসংশ্লেষ হয় না বলে শ্বেতসার জাতীয় পদার্থ থাকে না, কিন্তু খোলা স্টার্চ কথার



৫১নং চিত্র ॥ সালোকসংশ্লেষে সূর্যালোকের প্রয়োজনীয়তা এবং শ্বেতসার উৎপন্ন হওয়ার পরীক্ষার দৃশ্য।



৫২নং চিত্র ॥ সালোকসংশ্লেষে অক্সিজেন পরিত্যাগ করে—পরীক্ষার দৃশ্য।

অংশটি সূর্যালোক পাওয়ায় সালোকসংশ্লেষ হয়ে স্টার্চ উৎপন্ন হয়। এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে, **সূর্যালোক ব্যতীত সালোকসংশ্লেষ হয় না।**

(গ) উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন পরিত্যাগ করে।

পরীক্ষার জন্য প্রয়োজন ঃ কিছু জলজ উদ্ভিদ (হাইড্রিলা), জল, সামান্য সোডিয়াম বাই-কার্বনেট, বীকার, ফানেল, টেস্ট টিউব, দিয়াশলাই ইত্যাদি।

পরীক্ষা ঃ একটি বীকারে জল ও জলের মধ্যে কিছু পরিমাণ জলজ উদ্ভিদ (হাইড্রিলা) রাখা হল। জলজ উদ্ভিদগুলির কাটা কাণ্ডের দিক উপরের দিকে করে একটি উপুড় করা কাচের ফানেলের মধ্যে ঢাকা অবস্থায় জলের মধ্যে রাখা হল। জলে কিছু পরিমাণ সোডিয়াম বাই-কার্বনেট মিশাতে হবে, এর দ্বারা জলে অধিক পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড মিশে পরীক্ষার সুবিধা হবে। এবার একটি জলপূর্ণ টেস্ট টিউব ফানেলের নলের উপর এমনভাবে উপুড় করে রাখতে হবে যাতে বাতাস টেস্ট টিউবের মধ্যে প্রবেশ করতে না পারে। এই অবস্থায় বীকারটি সূর্যালোকে রাখা হল।

নিরীক্ষা ঃ সূর্যালোকে বীকারটি রাখবার কিছুক্ষণ পরে জলজ উদ্ভিদের কাটা কাণ্ডগুলি থেকে বুদবুদ বের হয়ে ফানেলের নলের মধ্য দিয়ে টেস্ট টিউবের মধ্যে যাচ্ছে দেখা যাবে। যত বুদবুদ জমবে ততই টেস্ট টিউবের উপুড় করা উপরের অংশের জল নিচের দিকে নামতে থাকবে। অবশেষে টেস্ট টিউবের অধিকাংশ স্থান গ্যাসে ভর্তি হলে বুড়ো আঙুলের সাহায্যে টেস্ট টিউবের মুখটি চেপে ধরে জলের বাইরে এনে তার মধ্যে জলন্ত দিয়াশলাই কাঠি প্রবেশ করান মাত্র দপ্ করে জ্বলে উঠবে।

সিদ্ধান্ত ঃ সালোকসংশ্লেষে যে গ্যাসটি নির্গত হয়েছে তা অক্সিজেন, কারণ জলন্ত কাঠি একমাত্র অক্সিজেনের সংস্পর্শে দপ্ করে জ্বলে ওঠে। সুতরাং এই পরীক্ষায় প্রমাণ হচ্ছে যে, **সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন নির্গত হয়।**

আরশোলার পৌষ্টিকনালী ও কুনো ব্যাঙের পৌষ্টিকতন্ত্রের ব্যবচ্ছেদ

ব্যবচ্ছেদের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ঃ

আরশোলা ও ব্যাঙের পৌষ্টিকতন্ত্র ব্যবচ্ছেদের জন্য একটি বড় (দৈর্ঘ্যে ১২" এবং প্রস্থে ৮") প্রান্ত তোলা টিন বা অ্যালুমিনিয়ামের ট্রে। ট্রের মধ্যে মোম গলিয়ে প্রায় এক ইঞ্চি পুরু করে ঢালতে হবে। কারণ পিনের সাহায্যে প্রাণীগুলিকে আটকিয়ে না রাখলে ব্যবচ্ছেদের অসুবিধা হবে। কয়েকটি আলপিন, ধারালো ছুরি, কাঁচি (একটি বড় এবং একটি ছোট), চিমটা (একটি বড় এবং একটি ছোট) একটি বাঁকানো লম্বা সূঁচ এবং একটি সোজা বড় সূঁচ। একটি কাচের জার, একটু ক্লোরোফরম্, জল, কাগজ, পেন্সিল ও ছবি আঁকার জন্যে সাদা খাতা।

আরশোলার পৌষ্টিক নালীর ব্যবচ্ছেদ ঃ

আরশোলা মারবার পদ্ধতি ঃ জীবিত আরশোলার ব্যবচ্ছেদ অসুবিধাজনক, এই জন্য কয়েকটি বড় আকারের জীবন্ত আরশোলা নিয়ে কাচের জারের মধ্যে রাখতে হবে। পরে তুলোর মধ্যে কিছু পরিমাণ ক্লোরোফরম্ ঢেলে জারের মধ্যে দিয়ে জারের মুখটি বন্ধ করে রাখবার কিছুক্ষণের মধ্যে আরশোলাগুলি মারা যাবে। জারের মধ্যে জল ভর্তি করেও আরশোলাগুলিকে মারতে পারা যায় তবে সময় একটু বেশী লাগবে।

মোম লাগানো ট্রেতে আরশোলা আটকানো ঃ ব্যবচ্ছেদের সুবিধার জন্য পিনের সাহায্যে আরশোলাকে উপুড় করা অবস্থায় দেহের উভয় দিকে পিনের দ্বারা মোমের মধ্যে লাগাতে হয়। আরশোলা অমেরুদণ্ডী পতঙ্গশ্রেণীর প্রাণী, এদের দেহের উপরিভাগে সংবহনতন্ত্র পরে পৌষ্টিকতন্ত্র এবং অঙ্কীয়দেশে স্নায়ুতন্ত্র থাকায় উপরিভাগ কাটলে সকল তন্ত্রই দৃষ্টিগোচর হবে।

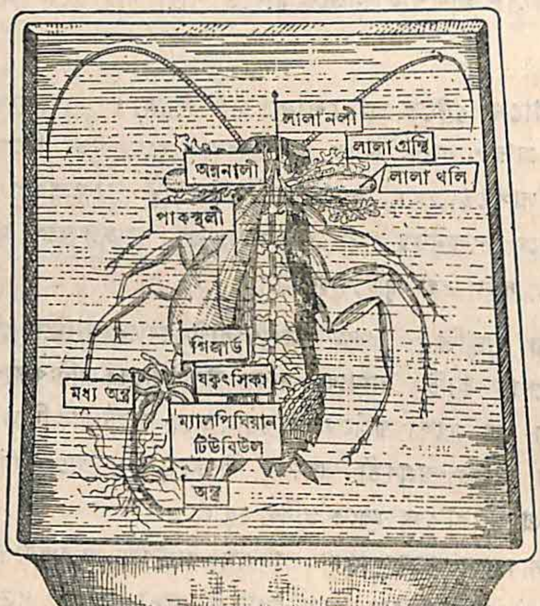
ব্যবচ্ছেদের পদ্ধতি ঃ প্রথমে আরশোলাটি মোমে লাগিয়ে ট্রেটি জলে পূর্ণ করতে হবে। ছোট কাঁচির সাহায্যে দেহের উপরিভাগের বহিঃকঙ্কাল (টারগাম) সাবধানে কাটবার পর দেহের ছদিকে সমান্তরালভাবে কেটে বাদ দিতে হবে। ছোট চিমটার সাহায্যে দেহের অগ্রবর্তী অঞ্চলের ত্রিকোণাকার প্রোনোটামটি ধরে কাঁচির সাহায্যে কাটলে গ্রাসনালী বের করতে সুবিধা হয়।

এবার খুব সাবধানে জলের মধ্যে ভাসমান ফ্যাটবডি ও বায়ুনালীসমূহ চিমটার ও ছোট কাঁচির সাহায্যে কেটে বাদ দিলে পৌষ্টিক নালী বেরিয়ে পড়বে। পৌষ্টিক তন্ত্রের মধ্যে পাকানো পৌষ্টিক নালীর মধ্য অংশ বাঁকানো সূঁচের সাহায্যে সোজা করে অগ্রবর্তী ও পশ্চাদবর্তী অঞ্চলে অনুসরণ করলে পৌষ্টিক নালীর বিভিন্ন অংশ দেখা যাবে। গ্রাসনালী ও মুখের কাছে ধারালো সূঁচের সাহায্যে সাবধানে আবরণটি চিরে দিলে গ্রাসনালী ও মুখবিবর দেখা যাবে।

ব্যবচ্ছেদ যথাযথ দেখাবার পদ্ধতি ঃ পৌষ্টিক নালীর বিভিন্ন অংশ দেখ। সংযুক্ত ফ্যাটবডি ও শ্বাসনালীগুলি ছোট চিমটার সাহায্যে পরিষ্কার করে, বার বার জল পরিবর্তন করলে পৌষ্টিক নালীটি পরিষ্কার হবে। এবার পৌষ্টিক নালীর বিভিন্ন অংশের নাম ছোট করে কাগজ কেটে সরু পেন্সিল দিয়ে লিখে সরু সরু আলপিনের সাহায্যে আটকিয়ে ট্রেটি জল ভর্তি করতে হবে। এই পদ্ধতিকে **'পিনফ্ল্যাগিং'** (Pinflagging) বলে। পরে পরিষ্কার করে ব্যবচ্ছেদের ছবি খাতায় আঁকতে হবে।

কুনো ব্যাঙের পৌষ্টিকতন্ত্রের ব্যবচ্ছেদ প্রণালী ঃ

আরশোলার মত একই উপায়ে কুনো ব্যাঙকে ক্লোরোফর্মের দ্বারা অজ্ঞান করার পরে মোমভর্তি ট্রেতে ব্যাঙটিকে চিৎ করে চারটি পায়ে পিন দিয়ে মোমের সাথে যুক্ত করতে হবে। ব্যাঙ মেরুদণ্ডী, উভচর শ্রেণীর প্রাণী এবং এদের পৃষ্ঠদেশে মেরুদণ্ড এবং পরের পর স্নায়ু, সংবহন ও শেষে পৌষ্টিকতন্ত্র থাকায়, পৃষ্ঠদেশ বরাবর



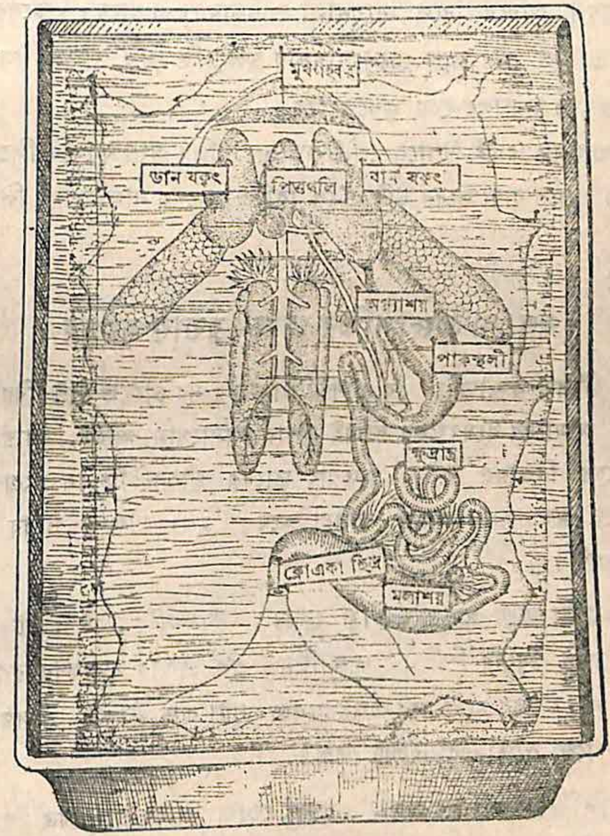
৫৩নং চিত্র ॥ আরশোলার পৌষ্টিকনালীর ব্যবচ্ছেদ এবং বিভিন্ন অংশে পিনক্ল্যাপিং-এর দৃশ্য।

ব্যবচ্ছেদের অসুবিধা হয়, এজন্য অঙ্কদেশ থেকে ব্যবচ্ছেদ করলে পৌষ্টিকতন্ত্র সহজেই বেরোবে।

ব্যবচ্ছেদ প্রণালী ঃ চিৎ করে আটকানো ব্যাঙের অঙ্কদেশের মধ্যরেখা বরাবর বড় কাঁচির ভোঁতা দিকের সাহায্যে সম্মুখের মুখ ও পশ্চাতের পায়ু পর্যন্ত এবং বাঁকিয়ে অগ্র ও পশ্চাদপদের চামড়া কাটতে হবে। পরে চামড়াকে দেহের পেশী থেকে কাঁচি ও চিমটার সাহায্যে ছাড়িয়ে মোমে পিন দিয়ে আটকাতে হবে।

এবার একইভাবে কাঁচি দিয়ে পেশীকে চিরে দেহগহ্বর উন্মুক্ত করতে হবে। পেশীর উভয় দিক পিনের সাহায্যে ট্রের মোমের সাথে যুক্ত করতে হবে।

দেহগহ্বরের অভ্যন্তরে পাকানো পৌষ্টিকনালী পাতলা মেসেনটারী পর্দার সাথে সংলগ্ন থাকে। এই পর্দা কেটে ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদন্ত্র সরল করতে হবে। এবার ক্ষুদ্রান্ত্রের সামনের



৫৪নং ॥ কুনোব্যাঙের পৌষ্টিকতন্ত্রের ব্যবচ্ছেদ এবং বিভিন্ন অংশে পিনস্ক্যাগিং-এর দৃশ্য।

দিকে U-আকারের ডিওডিনাম অঞ্চলে পিত্তনালীর সংযুক্তি অঞ্চল ঠিকভাবে রেখে পাকস্থলীটি বের করে গ্রাসনালী পর্যন্ত এগিয়ে যেতে হবে। পৌষ্টিক নালী পশ্চাৎ অঞ্চলে রেকটাম বা মলাশয় ও অবসারণী হয়ে অবসারণী ছিদ্র দ্বারা বাইরে উন্মুক্ত হয়। একটি পিন বাইরের দিক থেকে অবসারণী ছিদ্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেহগহ্বরের ভেতর থেকে বড় কাঁচির ভোঁতা অংশটি পেলভিক অস্থির সংযুক্ত অঞ্চলের (শ্রোণীচক্র)

মধ্যে প্রবেশ করিয়ে চাপ দিলে দুদিকে বিযুক্ত হয়ে যাবে। এবার পিনটি নাড়লে অবসারণীটি পরিষ্কার করতে সুবিধা হবে। এই সময় মূত্রস্থলী অপসারণ করতে হবে।

মুখগহ্বরের মধ্যে জিহ্বাটি টেনে বার করে আনবার পর বাঁকানো সুঁচের ধরবার জায়গাটি প্রবেশ করিয়ে দিলে গ্রাসনালী পরিষ্কার দেখা যাবে। কয়েক বার নোংরা ও রক্ত মিশ্রিত জল ট্রে থেকে ঢেলে পরিষ্কার জল ভর্তি করে পাতলা আবরণ সরিয়ে পিত্তস্থলী, যকৃৎ ও অগ্ন্যাশয় বের করতে হবে।

আরশোলার মত একই উপায়ে পৌষ্টিকতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ কাগজে লিখে পিনফ্ল্যাগিং করতে হবে। পরে ব্যবচ্ছেদের ছবি এঁকে বিভিন্ন অংশের নাম যথাযথ লিখতে হবে।

মশা বা প্রজাপতির জীবন-বৃত্তান্ত সংগ্রহ

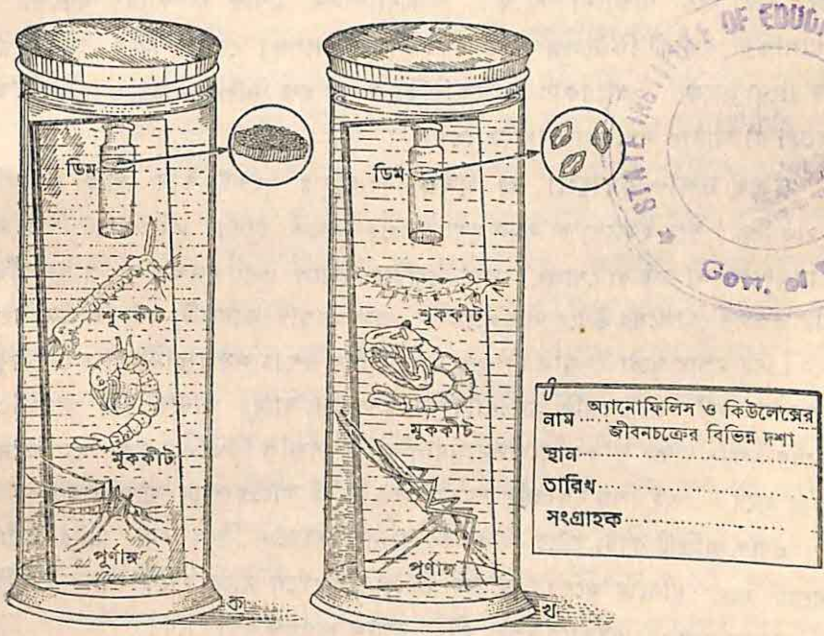
মশার জীবন-বৃত্তান্ত ঃ যে প্রাণীটি আমাদের সব চাইতে বেশী বিরক্ত করে তা হচ্ছে মশা। আমাদের বাসস্থানের সর্বত্রই মশার আনাগোনা আছে, মশার দ্বারা বিভিন্ন প্রকার রোগের বিস্তারও ঘটে। সুতরাং তাদের জীবন-ইতিহাস সংগ্রহ ও সংরক্ষণ শিক্ষা করলে মশা ধ্বংস করতে সুবিধা হবে। মশা সন্ধিপদ পর্বের পতঙ্গশ্রেণীর অতি ক্ষুদ্র প্রাণী।

সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ঃ কয়েকটি ছোট ছোট কাচের জার ও হোমিওপ্যাথি ওষুধের শিশি। ফরমালিন (এক প্রকার সংরক্ষণকারক রাসায়নিক পদার্থ) ও জল, জারের মধ্যে ধরে এরূপ অস্বচ্ছ কাটা কাচ, ছাঁকুনি, কাগজ ও পেন্সিল, অতি মিহি কালো সুতো এবং একটি লেন্স।

মশার বিভিন্ন দশা সংগ্রহ ঃ পুকুর, ডোবা, আবদ্ধ জল সর্বত্র মশা ডিম পাড়ে এবং তাদের বিভিন্ন দশার পরিবর্তন হয়। তবে সহজে মশার জীবন-বৃত্তান্তের বিভিন্ন দশা সংগ্রহ করতে হলে একটি জলভর্তি পাত্র ঈষৎ অন্ধকার স্থানে রাখলে তাতে মশা **ডিম** পাড়বে। ডিম ফুটে পরের পর দশা যথাক্রমে **লার্ভা পিউপায় ও পিউপা ইমাগোয়** ক্রমে ক্রমে রূপান্তরিত হতে থাকবে। এই পরিবর্তিত জলের মধ্যে মশার জীবনের বিভিন্ন দশা সহজেই সংগ্রহ করা যেতে পারে। নীচে বিভিন্ন দশা ও তার সংগ্রহ প্রণালী দেওয়া হল।

প্রথম দশা—ডিম সংগ্রহ ঃ লেন্সের সাহায্যে জলের উপর ভাসমান দুই প্রকারের ডিম দেখা যায়। মাকুর মত দুপাশে ভেলক ও ছাড়া ছাড়া ভাসতে

থাকলে—এই ডিমগুলি অ্যানোফিলিস মশার ডিম। যদি ডিমগুলির নীচের দিক স্ফীত গোলাকার হয় এবং একত্রে ভাসতে থাকে তাহলে ডিমগুলি কিউলেক্স মশার বুঝতে হবে। এই দুই প্রকার ডিম ছাঁকুনির সাহায্যে সংগ্রহ করে দুটি হোমিওপ্যাথি ওষুধের শিশির মধ্যে ফরমালিন মেশানো জলে রেখে ছিপি বন্ধ করতে হবে। উভয় শিশির গায়ে কাগজে কোন্ মশার ডিম তা লিখতে হবে। এই শিশি দুটি আলাদা আলাদা কাটা কাচের গায়ে উপরের দিকে সুতো দিয়ে বাঁধতে হবে।



৫৫নং চিত্র। মশার জীবন-বৃত্তান্তের বিভিন্ন দশার সংরক্ষণ—(ক) কিউলেক্স এবং (খ) অ্যানোফিলিস্ মশা জারের মধ্যে ফরমালিন জলে সংরক্ষণ পদ্ধতির দৃশ্য।

দ্বিতীয় দশা—লার্ভা বা শূককীট সংগ্রহ ঃ এই দশাটি মশার জীবনে দ্বিতীয় অবস্থা। ২।৩ দিন পরে জলভর্তি পাত্রটি পরীক্ষা করলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকার মত জীব জলের মধ্যে ছোটাছুটি করছে দেখা যাবে। এদের আকার লম্বা, দেহ—মস্তক, বক্ষ ও উদরে বিভক্ত। মস্তকটি চ্যাপ্টা, একজোড়া চোয়াল ও ভোজন বুরুশ যুক্ত এবং উভয় দিকে চক্ষু ও শুঁড় থাকে। এইগুলিই মশার জীবন-বৃত্তান্তের দ্বিতীয় দশা, এদের শূককীট বা লার্ভা বলে। অ্যানোফিলিস্ মশার শূক জলের সমান্তরালে এবং কিউলেক্স মশার শূক জল তলের কোনাকুনি ভাসতে থাকে। বিভিন্ন জাতের মশার ক সংগ্রহ করে বিভিন্ন

কাটা কাচের উপর সুতোয় বেঁধে বা 'কুইক ফিক্স' (Quick-fix) নামক আঠায় লাগিয়ে রাখতে হবে। একপ্রকারে মশার ডিম ও শূক এবং পরে পিউপা ও ইমাগো নির্দিষ্ট কাটা কাচে ও ফরমালিনযুক্ত জারে ডুবিয়ে রাখতে হবে।

তৃতীয় দশা—পিউপা বা মূককীট সংগ্রহ ঃ ৭।৮ দিন পরে এই পাত্র ভাল করে দেখলে কমার (,) আকৃতির মত স্বচ্ছ ঢাকনায় আবৃত মূককীট দেখা যাবে। এদের মস্তক ও বক্ষ একত্রে দেহখণ্ড অপেক্ষা অনেক বেশী স্থূল এবং গোলাকার দেহখণ্ড ও উদর সরু হয়ে বাঁকানো থাকে। অ্যানোফিলিস মশার মূককীটের মস্তকের স্থূল গোলাকার অঞ্চলটি কিউলেক্স মশার একই অঞ্চল অপেক্ষা পেটের দিকে অনেক বেশী ঘোরানো থাকে। আগেকার উপায়ে বিভিন্ন মশার জন্য নির্দিষ্ট কাচখণ্ডে মূককীটগুলি সুতো বা আঠার সাহায্যে লাগাতে হবে।

চতুর্থ দশা—ইমাগো বা সমঙ্গ সংগ্রহ ঃ একই স্থান থেকে কয়েকদিন (২।৩ দিন) পরে ইমাগো বা সমঙ্গ মশা সংগ্রহ করতে হবে। এই সময় শিশু মশা তার দেহের আবরণী বা খোলস কেটে বেরিয়ে আসে এবং যতক্ষণ না পাখা শুকিয়ে যায় ততক্ষণ খোলসের উপরে বসে থাকে। এই অবস্থায় কয়েকটি মশা সংগ্রহ করতে হবে। এই মশার মধ্যে যেগুলি দাগযুক্ত এবং দেহের পশ্চাৎ অঞ্চল ভূমির সাথে কোনাকুনি সূক্ষ্মকোণ সৃষ্টি করে সেগুলি অ্যানোফিলিস মশা এবং যাদের ডানায় দাগ থাকে এবং দেহের পশ্চাৎ অঞ্চল ভূমির সাথে সমান্তরাল থাকে সেগুলি কিউলেক্স মশা বলে জানতে পারা যাবে। এই শিশু মশাগুলি সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট কাচের সাথে লাগাতে হবে।

এবার প্রতিটি কাটা কাচে বিভিন্ন দশার নাম কাগজে লিখে আঠা দিয়ে লাগিয়ে জারের মধ্যে রাখতে হবে। জারের জল শুকিয়ে গেলে মাঝে মাঝে ফর্মালিন মিশ্রিত জল ঢালতে হবে। এইভাবে মশার জীবন-বৃত্তান্ত সংরক্ষণ করা যাবে।

***পাঠ্যসূচীতে** মশা অথবা প্রজাপতির জীবন-বৃত্তান্তের যে-কোনও একটি সংরক্ষণ করার কথা বলা হয়েছে। তবে কোন শিক্ষার্থী যদি মশার পরিবর্তে প্রজাপতির জীবন-বৃত্তান্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে চায় তাহলে নিম্নলিখিত উপায়ে করতে পারে।

প্রজাপতির জীবন-বৃত্তান্ত সংগ্রহ ঃ জীবন-বৃত্তান্ত সংগ্রহ করতে হলে মশার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বস্তুগুলির মধ্যে ছাঁকুনির পরিবর্তে প্রজাপতি ধরবার জাল প্রয়োজন হবে।

সংগ্রহ করবার স্থান ঃ আমাদের দেশে বিশেষত পল্লীগ্রামে এবং শহরের পার্কে, ফুলবাগানে বিভিন্ন রঙের সুন্দর সুন্দর প্রজাপতি দেখা যায়। এই প্রাণীও পতঙ্গ

শ্রেণীর, সন্ধিপদ পর্বের প্রাণী। এরা লেবু, কুল, সজিনা ও শিমূল ইত্যাদি গাছে ডিম পাড়ে এবং বিভিন্ন ধরনের প্রজাপতির বিভিন্ন গাছ ডিম পাড়ার জন্য নির্দিষ্ট। বিশেষ প্রকার গাছে ডিম দেখলে কোন্ জাতীয় প্রজাপতি তা সনাক্ত করা যায়।

প্রজাপতির বিভিন্ন দশা ও তার সংরক্ষণ ঃ

(ক) **ডিম ঃ** কুল, লেবু ইত্যাদি গাছের পাতায় প্রজাপতি একত্রে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাদা ডিম পাড়ে এবং ডিমের গায়ের আঠাল রস তাদের পাতার সাথে সংযুক্ত করে রাখে। এইরূপ একটি পাতা বা ডাল একটি কাচের জারে কাটা কাচের উপর বেঁধে ফরমালিনের মধ্যে রাখতে হবে। (খ) **লার্ভা বা শুঁয়াপোকা ঃ** নির্দিষ্ট গাছে কয়েকদিন পরে শুঁয়াপোকা ঘুরতে দেখা যাবে। এরা কচিপাতা খেয়ে বেঁচে থাকে। এদের দেহ—মাথা, বুক ও উদরে বিভক্ত এবং সারা দেহ অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রোঁয়ায় ভর্তি থাকে। দেহের অঙ্কীয়ভাগে ১৩টি পা এবং শেষ দেহখণ্ডে বাঁকানো পদটিকে 'ক্ল্যাসপার' বলে। এই প্রকার কয়েকটি শুঁয়াপোকা সংগ্রহ করে জারের মধ্যে কাটা কাচের গায়ে বেঁধে রাখতে হবে। (গ) **পিউপা বা মূককীট ঃ** কয়েকটি জীবন্ত শূককীট একটি ছিদ্রযুক্ত কাচের জারে বিশেষ গাছের পাতা দিয়ে রাখলে শূককীট ২।৩ সপ্তাহের মধ্যে ঐ পাতাগুলি খেয়ে ক্রমশঃ স্থূল হয়ে নিজেদের দেহনিঃসৃত লালায় নিজেদের আবদ্ধ করবে। এই আবরণীশুদ্ধ শূককীটকে কোকুন বা গুটি বলে। এই কোকুনের মধ্যে শূক পিউপায় পরিবর্তিত হবে। অথবা যে গাছ থেকে শূকগুলি সংগ্রহ করা হয়েছিল সেখান থেকেও গুটি সংগ্রহ করা যায়। (ঘ) **ইমাগো বা পূর্ণাঙ্গ প্রজাপতি ঃ** ৮।১০ দিন পরে গুটি কেটে পূর্ণাঙ্গ প্রজাপতি বেরিয়ে আসে এবং কিছু সময় খোলসের উপর বসে থাকে। এই সময়ও প্রজাপতির ইমাগো সংগ্রহ করা যায়। প্রজাপতির বিচিত্র বর্ণ সংরক্ষণের জন্য ছোট একটি কাগজের সাথে যুক্ত করে পরে কাচের ফ্রেমযুক্ত বাক্সে রাখা যায়। অন্যান্য তিনটি দশা মশার মত কাটা কাচের সাথে আটকিয়ে জারের ফরমালিনযুক্ত জলের মধ্যে রাখতে হবে। বিচিত্র বর্ণের প্রজাপতি জালের দ্বারা ধরে একইভাবে কাগজে আটকিয়ে রাখা যায়।

প্রজাপতির সংগ্রহ করার সময় একটি কাগজে কোন্ জায়গা থেকে প্রজাপতি সংগ্রহ করা হয়েছে, কবে সংগ্রহ করা হয়েছে এবং কোন্ গাছে বাসস্থান সেগুলিও লিখে রাখতে হবে।

শ্বসন ও রক্ত সংবহনে ব্যায়ামের প্রতিক্রিয়া

মানুষের দেহ একটি যন্ত্রবিশেষ। অন্যান্য যন্ত্র যেমন নিয়মিত বা মাঝে মাঝে না চালালে সক্রিয় থাকে না সেরূপ আমাদের দেহের মধ্যে বিভিন্ন পেশী ও যন্ত্রকে সক্রিয়

রাখতে গেলে মাঝে মাঝে ব্যায়ামের প্রয়োজন। ব্যায়াম করলে দেহের বিভিন্ন পেশীর সংকোচন-প্রসারণ ও কার্য-কলাপের ফলে পেশীগুলির সক্রিয়তার জন্য প্রচুর শক্তির প্রয়োজন হয়। ব্যায়ামের ফলে দেহের হৃদ্‌স্পন্দনও শ্বাসকার্য বাড়ে এবং দেহের কোষীয় বিপাক ক্রিয়া দ্রুততর হওয়ায় দেহে প্রচুর তাপ, ঘর্ম ইত্যাদি নির্গত হয়।

ব্যায়ামের প্রকার অনুযায়ী পরিশ্রমও বিভিন্ন মাত্রায় হয়। যেমন, লঘু বা হালকা ব্যায়ামে নিষ্ক্রিয় অবস্থার চেয়ে সামান্য পরিমাপ পরিশ্রমের বৃদ্ধি হয়। মধ্যম প্রকার ব্যায়ামে পরিশ্রমের হার হালকা অপেক্ষা অধিক হয় কিন্তু ভারী বা কঠিন ব্যায়ামে অনেক বেশী পরিশ্রম হয়।

ব্যায়ামের ফলে পেশী সঞ্চালন বেড়ে যায় এবং তার ফলে পেশীর মধ্যে অধিক মাত্রায় সঞ্চিত খাদ্যবস্তুর জারণক্রিয়া ঘটে এবং উৎপন্ন শক্তি ব্যয়িত হয়। এই কার্যে অধিক অক্সিজেন সরবরাহ প্রয়োজন, সেইজন্য ব্যায়ামের প্রথম প্রতিক্রিয়া শ্বাসকার্যে প্রথম অনুভূত হয়, পরে অন্যান্য তন্ত্রের উপর প্রতিক্রিয়া দেখা যায়।

শ্বাসকার্যের উপর প্রতিক্রিয়াঃ ব্যায়ামের সময় পেশীর মধ্যে দ্রুত গ্লুকোজ জারণের জন্য অধিক অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়, এই পরিমাণ অক্সিজেন রক্তের হিমোগ্লোবিনের মাধ্যমে পেশীকোষে সরবরাহ হয়। রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য ফুসফুসের মধ্যে অধিক অক্সিজেনযুক্ত বায়ু গৃহীত হয় এবং রক্তের মধ্যে অধিক মাত্রায় উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্সাইড দূরীভূত হয়। মাঝারি ধরনের ব্যায়ামে শ্বাসক্রিয়ার হার বাড়লেও অল্প সময়ের মধ্যে আবার স্বাভাবিক হয়। **কিন্তু অধিক পরিশ্রমের ব্যায়ামে শ্বাসক্রিয়ার হার এত বেড়ে যায় যে, স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে বেশ সময় লাগে।**

অধিক পরিশ্রমের ব্যায়ামে পেশীর মধ্যে গ্লুকোজ সম্পূর্ণরূপে জারিত হতে না পারায় (অক্সিজেন অভাবহেতু) **ল্যাকটিক অ্যাসিড** উৎপন্ন করে। ল্যাকটিক অ্যাসিড রক্তের সাথে মিশে রক্তের ক্ষারত্ব কমিয়ে অম্লতার সৃষ্টি করে। দেহ এই ল্যাকটিক অ্যাসিড আধিক্য, অতিরিক্ত অক্সিজেন (শ্বাসক্রিয়ার হার বাড়িয়ে) গ্রহণ করে দহনের দ্বারা প্রশমিত করে। এই অতিরিক্ত অক্সিজেনকে **অক্সিজেন ঋণ** (Oxygen debt) বলে। প্রথমে এই অতিরিক্ত অক্সিজেন ল্যাকটিক অ্যাসিড ব্যতীত অন্যান্য বিপাকীয় বস্তুগুলিকে জারণ করার পর ল্যাকটিক অ্যাসিডকে পাইরুভিক অ্যাসিড ও পরে কার্বন ডাই-অক্সাইডে জারিত করে। কার্বন ডাই-অক্সাইড নিশ্বাসবায়ুর সাথে বেরিয়ে যায়। অতিরিক্ত ল্যাকটিক অ্যাসিড যা আর শক্তি উৎপাদনে লাগে না তা

আবার গ্লুকোজে পরিণত হয় এবং গ্লুকোজ গ্লাইকোজেনে পরিবর্তিত হয়ে যকৃৎ বা পেশীতে সঞ্চিত থাকে।

রক্ত সংবহনের উপর প্রতিক্রিয়া ঃ

(১) হৃদ্‌যন্ত্রের সংকোচন ও প্রসারণের হার প্রতি মিনিটে ৭২ বার থেকে ১৪০ বার পর্যন্ত বেড়ে যায়। কারণ রক্তের মধ্যে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি হলে মস্তিষ্কের মধ্যে হৃদ্‌যন্ত্রের সংকোচন-প্রসারণ নিয়ন্ত্রণকারী স্নায়ু উত্তেজিত হয়। এর ফলে রক্ত সংবহন দ্রুত হয়ে ফুসফুসের মধ্যে কার্বন ডাই-অক্সাইড বহিষ্করণ দ্বারা হৃদ্‌যন্ত্রের স্পন্দন স্বাভাবিক করে। (২) শিরার সংকোচনের ফলে উর্ধ্ব ও নিম্নমহাশিরার দ্বারা অধিক রক্ত হৃদ্‌যন্ত্রে প্রবেশ করে। (৩) হৃদ্‌যন্ত্রের দ্রুত স্পন্দন ও রক্তবাহগুলির সংকোচনের ফলে রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়। (৪) দেহের পেশীকলার মধ্যে ধমনিকার জালকগুলির দ্বারা রক্ত সরবরাহ বেড়ে যায় কিন্তু পৌষ্টিকতন্ত্রে রক্ত সঞ্চালন কম হয়। (এজন্য আহারের পর ব্যায়াম করা উচিত নয়)

বাইসাইকেল আরগোমিটার (Bicycle eargometer) ঃ

এই যন্ত্রটি বাইসাইকেলের মত তবে এর পিছনের চাকা থাকে না এবং একটি কাঠের পাটাতনের সাথে সামনের চাকার হুইল ও পেছনের সিটের সাথে দুটি লোহার দণ্ডের দ্বারা যুক্ত থাকে। সামনের চাকায় পুলির মত তারের একপ্রান্তে একটি ওজন লিপিবদ্ধকারক মিটারে (Recording meter) এবং অন্যপ্রান্তে একটি ওজন চাপানো থাকে। এই যন্ত্রের সাহায্যে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে স্থির অবস্থা থেকে পরিশ্রমের পরের অবস্থা পর্যন্ত যে সব শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন হয় সেগুলি গবেষণাগারে লিপিবদ্ধ করা যায়। এই যন্ত্রের মাধ্যমে পেশীসঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করে হৃদ্‌যন্ত্রের স্পন্দনের হার, রক্তের চাপ, হৃদ্‌যন্ত্র থেকে কি পরিমাণ রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে, দেহের তাপমাত্রা এবং অক্সিজেন ব্যবহারের ও কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিত্যাগের পরিমাণ নির্ণীত হয়।

হার্ভার্ডের পরীক্ষা (Harvard's Step Test) ঃ

এই পরীক্ষার দ্বারা যে-কোনও ব্যক্তির শারীরিক পরিশ্রমের ক্ষমতা নির্ণয় করা যায়। ব্যক্তিবিশেষে এই ক্ষমতা ভিন্ন প্রকার। এই পরীক্ষার পূর্বে যে ব্যক্তির সক্ষমতা নির্ণয় করা হবে তাকে কিছুক্ষণ বিশ্রাম অবস্থায় রাখা হয়। এই সময় তার নাড়ীর স্পন্দনের হার (হৃদ্‌যন্ত্রের স্পন্দনের হার), রক্তচাপ ও শ্বাসক্রিয়ার হার নির্ণয় করা হয়। পরে নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে একটি নির্দিষ্ট উচ্চতাবিশিষ্ট টুলের উপর প্রতি মিনিটে ২০ বার হারে

যতক্ষণ না ক্লান্ত হচ্ছে ততক্ষণ উঠানামা করতে বলা হয়। পরীক্ষাধীন ব্যক্তিটি ক্লান্তি বোধ করলে তাকে থামিয়ে পুনর্বার তার নাড়ীর স্পন্দনের হার, রক্তচাপ এবং শ্বসন হার মাপা হয়। পূর্বের ও পরের অবস্থা বিবেচনা করে ব্যক্তিটির শারীরিক সক্ষমতা পরিমাপ করা হয়।

ক্লান্তি (Fatigue) ঃ অধিক ব্যায়ামের ফলে বা অনভ্যাসের জন্য পরিশ্রমের পরিমান অনুযায়ী কোন ব্যক্তির পেশী সঞ্চালন দ্রুত বা দেরীতে স্তিমিত হয় এবং অবসাদ আসে—এই অবস্থাকে **ক্লান্তি** বলে। এই অবস্থা দেহের মধ্যে অক্সিজেনের অভাব, রক্তে হাইড্রোজেন আয়নের আধিক্য ও অন্যান্য পরিস্থিতির দ্বারা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করার ফল। নিয়মিত ব্যায়াম দ্বারা অভ্যাসের ফলে ক্লান্তিবোধ কিছু পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে আনা যায়।

———

অনুশীলনী

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ সালোকসংশ্লেষ ও শ্বসনের তাৎপর্য পৃষ্ঠা ১—২৬

(ক) বর্ণনামূলক প্রশ্নাবলী ঃ

১। সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া কোন্ কোন্ বিজ্ঞানীর কাজের দ্বারা আবিষ্কৃত হয়েছে ? সালোকসংশ্লেষের সংজ্ঞা লিখ ও প্রক্রিয়া বর্ণনা কর। ২। "সৌরশক্তি সকল জীবের খাদ্যের উৎস"—এই উক্তির যথার্থতা প্রমাণ কর। ৩। ফটোলিসিস কি এবং কখন হয় ? সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন অক্সিজেনের উৎস কি ? ৪। সালোকসংশ্লেষের তাৎপর্য বর্ণনা কর। বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও অক্সিজেনের অনুপাত কিভাবে বজায় থাকে ? ৫। "সালোকসংশ্লেষের ফলে প্রাণিজগৎ উপকৃত"—দুইটি উপকারের উল্লেখ কর। শ্বেতসারের মৌলিক উপাদানগুলি কি এবং উদ্ভিদ কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়া সালোকসংশ্লেষ করে ? কি বিশেষ প্রয়োজনে জীবজগৎ সর্বক্ষণ শ্বাসকার্য চালাইয়া যাইতেছে। (মাধ্যঃ ১৯৭৬) ৬। সালোকসংশ্লেষ কি ? সব জীবে কি এই প্রক্রিয়া দেখা যায় ? রাত্রিতে সালোকসংশ্লেষ হয় না কেন ? (মাধ্যঃ কম্পঃ ১৯৭৬, উচ্চ মাদ্রাসা ১৯৭৬) ৭। শ্বাসকার্য কাহাকে বলে ? উদ্ভিদের শ্বাসকার্য কখন হয় ? ছোটাছুটি করিলে আমাদের শ্বাসকার্য দ্রুত হারে হয় কেন ? (মাধ্যঃ কম্পঃ ১৯৭৬) ৮। নিশ্বাস-প্রশ্বাস ও শ্বসনের মধ্যে পার্থক্য কি ? গাছ নিশ্বাস-প্রশ্বাস কার্য করিতে পারে কি ? একটি জৈব অনুঘটকের উদাহরণ দাও। অঙ্গার আত্তীকরণে "শক্তির রূপান্তর ঘটে"—ইহা সংক্ষেপে বুঝাইয়া দাও। (মাধ্যঃ ১৯৭৭) ৯। ফুসফুসের মধ্যে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড কিভাবে বিনিময় হয় ? শ্বাসকার্য নিয়ন্ত্রণ কিরূপে হয় ? পর্বতের উচ্চতায় মানুষের শ্বাসকষ্ট হয়, পাখীর হয় না কেন ? ১০। মানুষের শ্বাসকার্যে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড কিভাবে পরিবাহিত হয় ? শ্বাসকার্য দ্বারা স্থৈতিকশক্তি কিরূপে গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হয় লিখ। ১১। কাঠ, কয়লা ও কেরোসিন ইত্যাদি দাহ্যবস্তুর দহনের সাথে খাদ্যবস্তু জারণের দ্বারা শক্তি উৎপাদনের পার্থক্য কি কি ? এক অণুগ্রাম গ্লুকোজ দহনে কত ক্যালোরি তাপ উৎপন্ন হয় লিখ। ১২। উদ্ভিদের শ্বসন কিরূপে হয় ? উদ্ভিদের সবাত শ্বসনে কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয়—পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ কর। রুটি, মদ ও দই ইত্যাদি উৎপাদনে কি প্রকার শ্বাসকার্য ঘটে ? ১৩। শ্বাসকার্য কয় প্রকার ? সালোকসংশ্লেষ ও শ্বসনের পার্থক্য বর্ণনা কর। (উচ্চ মাদ্রাসা ১৯৭৬)।

(খ) শূন্যস্থান পূর্ণ কর :

(১) যে প্রক্রিয়ায় সবুজ উদ্ভিদ খাদ্য উৎপন্ন করে তাকে —— বলে। (২) —— এবং —— বিক্রিয়া দুইটি সালোকসংশ্লেষের পর্যায়। (৩) সালোকসংশ্লেষে ক্লোরোফিলের —— অন্ধকার পর্যায় এবং —— আলোক পর্যায় ঘটে। (৪) জল অণুর পৃথগীভবনের বিক্রিয়াকে —— বলে। (৫) $6CO_2 + — + \xrightarrow[\text{ক্লোরোফিল}]{\text{সূর্যালোক}} C_6H_{12}O_6 + — + —$। (৬) জীবদেহে যে অপচিতিমূলক বিপাকে দেহের ভার হ্রাস পায় এবং শক্তি উৎপন্ন হয় তাকে —— বলে। (৭) শ্বসনে —— শক্তি —— শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। (৮) সবাত শ্বসনের —— পর্যায়ে অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় না, —— পর্যায়ে প্রয়োজন হয়। (৯) শ্বসনে উৎপন্ন শক্তি কোষের —— মধ্যে সঞ্চিত হয়। (১০) প্রাণিদেহে অবাত শ্বসনের ফলে পেশীতে —— অ্যাসিড উৎপন্ন হয়।

(গ) সঠিক জোড়া নির্ধারণকারী প্রশ্ন : (বামদিকের তালিকার বাক্যাংশের সহিত ডানদিকের তালিকার সঠিক বাক্যাংশ যুক্ত কর)।

বামদিকের তালিকা	ডানদিকের তালিকা
(ক) সূর্য	(১) তাম্র-ঘটিত কণিকা
(খ) সালোকসংশ্লেষে উৎপন্ন অক্সিজেন	(২) মাইটোকনড্রিয়া সরবরাহ করে
(গ) উদ্ভিদের সবুজ পাতা	(৩) শ্বাসকার্য হয় না
(ঘ) হিমোসায়ানিন একপ্রকার	(৪) সকল শক্তির উৎস
(ঙ) শ্বসনের প্রয়োজনীয় উৎসেচক	(৫) খাদ্য উৎপাদনের কারখানা
(চ) ভাইরাসের	(৬) উপজাত বস্তু

(ঘ) সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

১। বাতাসে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের শতকরা পরিমাণ কত? ২। সালোকসংশ্লেষ কখন হয়? (মাধ্যঃ ১৯৭৬) ৩। উদ্ভিদের শ্বাসকার্য কখন হয় এবং ইহাতে কোন্ গ্যাস ব্যবহৃত হয়। (উচ্চ মাদ্রাসা ১৯৭৬) ৪। বাতাসের কোন্ উপাদান সালোকসংশ্লেষের পক্ষে অপরিহার্য? (মাধ্যঃ কম্পঃ ১৯৭৬, ১৯৭৭) ৫। পৃথিবীর যাবতীয় শ্বেতসার পদার্থে কার্বনের উৎস কি? ৬। জলে নিমজ্জিত উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষের জন্য কার্বন ডাই-অক্সাইড কোথা হতে সংগ্রহ করে? (মাধ্যঃ কম্পঃ ১৯৭৭) ৭। সালোকসংশ্লেষে প্রক্রিয়ায় শক্তির উৎস কি? ৮। সালোকসংশ্লেষের

ফলে প্রাণীর প্রয়োজনীয় কি গ্যাস উৎপন্ন হয় ? ৯। উদ্ভিদের শ্বসনের অঙ্গগুলির নাম লিখ। ১০। উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ পদার্থের দহনের ফলে কোন্ গ্যাস উৎপন্ন হয় ? ১১। সালোকসংশ্লেষণের সময় জল বিশ্লেষণ কে করে ? ১২। রাত্রিবেলা গাছের নিচে ঘুমান ক্ষতিকর কেন ? ১৩। জীবদেহে শ্বাসক্রিয়া কোথায় অনুষ্ঠিত হয় ? (মাধ্যঃ ১৯৭৬) ১৪। গাছ রাত্রিবেলায় খাদ্য তৈরী করতে পারে না কেন ? ১৫। এমন একটি জীবের নাম কর যে বায়ুশূন্য স্থানে শ্বাসকার্য করিতে পারে। (মাধ্যঃ ১৯৭৭) ১৬। 'এনার্জি কারেন্সি' কাকে বলে ? ১৭। উদ্ভিদের সবুজকণা কি কি পদার্থ দ্বারা তৈরী ? ১৮। শ্বাসকার্যের জন্য জলজ উদ্ভিদের অক্সিজেনের উৎস কি ? (মাধ্যঃ কম্পঃ ১৯৭৬) ১৯। অতিরিক্ত শ্বাসঅঙ্গযুক্ত একটি প্রাণীর নাম কর। ২০। মাছ নিশ্বাস-প্রশ্বাস কার্য করিতে পারে কি ? (মাধ্যঃ কম্পঃ ১৯৭৭)

(ঙ) ভুল-নিভু্র্ল নির্ধারণকারী প্রশ্ন ঃ (নিম্নের বর্ণনায় যেটি নির্ভুল তার পাশে 'হাঁ' এবং যেটি ভুল তার পাশে 'না' লিখ)।

১। পত্ররন্ধ্র দিয়ে বাতাসের কার্বন ডাই-অক্সাইড সালোকসংশ্লেষে প্রবেশ করে।··· ২। মূলরোম দ্বারা শোষিত জল পাতার সালোকসংশ্লেষ ক্রিয়ায় বিজারিত হয়ে অক্সিজেন ত্যাগ করে।··· ৪। উদ্ভিদের রাত্রেও সালোকসংশ্লেষ ক্রিয়া ঘটে।··· ৫। শীতঘুমের সময় ব্যাঙ চর্মের সাহায্যে শ্বাসক্রিয়া করে।···৬। ব্যাঙের রক্তের হিমোসায়ানিন দ্বারা অক্সিজেন পরিবহন হয়।···

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ পুষ্টি, বিপাক ও পরিপাক পৃষ্ঠা ২৭—৬৫

(ক) বর্ণনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। প্রাণীদের খাদ্যের উৎস কি এবং প্রয়োজনীয়তাই বা কি ? অ্যামিবা, হাইড্রা ও কেঁচো কিরূপে খাদ্য গ্রহণ করে বর্ণনা কর। ২। পরিপাক বলিতে কি বুঝ ? খাদ্য পরিপাকে অংশগ্রহণকারী তিনটি উৎসেচকের নাম বল। উৎসেচককে অনুঘটক বলে কেন ? (মাধ্যঃ কম্পঃ ১৯৭৬) ৩। মানুষের পাকস্থলী রসে যে সমস্ত উৎসেচক থাকে তাহাদের নাম এবং কার্য বর্ণনা কর। (উচ্চ মাদ্রাসা ১৯৭৬) ৪। বিপাক কাকে বলে ? বিপাক ক্রিয়ায় উৎপন্ন বস্তুগুলি কি কি ? ক্যালোরি ও কিলোক্যালোরি কাকে বলে ? মৌল বিপাক কিরূপে নির্ণয় করা হয় লিখ। ৫। উদ্ভিদ দেহে শ্বেতসার ও স্নেহ সংশ্লেষণ কিরূপে হয় বর্ণনা কর। উদ্ভিদ বায়ুর নাইট্রোজেন কিভাবে গ্রহণ করে ? ৬। উদ্ভিদের পুষ্টিসাধনে সারের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর। জৈব ও অজৈব সারের মধ্যে কোন্‌টি চাষের জমিতে অধিক উপযোগী বর্ণনা কর। ৭। ভিটামিন কাকে বলে ? বিভিন্ন প্রকার ভিটামিনের উৎস এবং অভাবজনিত রোগগুলি বর্ণনা কর। ৮। মানুষের

দেহে জলের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর। ৯। এককোষী প্রাণী অ্যামিবার পুষ্টি বর্ণনা কর এবং উদ্ভিদ ও বহুকোষী প্রাণীর পুষ্টির সঙ্গে অ্যামিবার পুষ্টিগত পার্থক্য কোথায়? ১০। খাদ্যের সংজ্ঞা কি এবং সুষম খাদ্য কাকে বলে? খাদ্যের জন্য প্রাণীরা কাদের উপর নির্ভরশীল? প্রাণীর খাদ্যের মূল উপাদানগুলি কি কি? ১১। ম্যাক্রো ও মাইক্রো এলিমেণ্ট কাকে বলে? উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাসিয়াম কি প্রভাব বিস্তার করে? ১২। শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যের রাসায়নিক গঠন, উৎস ও কার্য বর্ণনা কর। ১৩। প্রোটিন গঠনের একক কি? প্রোটিন নামকরণ কোন্ বিজ্ঞানী করেন? উচ্চশ্রেণীর ও নিম্নশ্রেণীর প্রোটিনের গঠন ও কার্য বর্ণনা কর। ১৪। মানুষের খাদ্যে বিভিন্ন প্রকার খনিজের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর। সোডিয়াম ক্লোরাইড শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়ায় কি প্রভাব বিস্তার করে লিখ।

(খ) শূন্যস্থান পূর্ণ কর ঃ

১। (ক) প্রোটিন খাদ্যের একটি মৌলিক উপাদান —। (খ) খাদ্যপ্রাণ — অভাবে স্কার্ভি রোগ হয়। (গ) — পাকস্থলীতে অবস্থানকারী উৎসেচক। (ঘ) — একটি বিপাক ক্রিয়া। (মাধ্যঃ ১৯৭৬) ২। (ক) অন্তঃকোষীয় ও বহিঃকোষীয় পরিপাক সাধারণত যথাক্রমে — ও — তে দেখা যায়। (খ) খাদ্যে লোহের অভাবে প্রাণীতে ও উদ্ভিদে যথাক্রমে — ও — লক্ষণ দেখা যায়। (গ) জীবদেহে সকল উৎসেচক — জাতীয়। (ঘ) গ্লুকোজে ভিটামিন —। (মাধ্যঃ ১৯৭৭) ৩। (ক) স্নেহজাতীয় খাদ্য — উৎসেচকের সাহায্যে বিশ্লিষ্ট হয়। (খ) খাদ্যপ্রাণ — অভাবে বেরিবেরি রোগ হয়। (গ) পাকস্থলীতে — জাতীয় খাদ্য জারিত হয়। (ঘ) উৎসেচককে একপ্রকার জৈব — বলা চলে। (ঙ) পুষ্টির জন্য উদ্ভিদ — ও — জাতীয় দ্রব্য গ্রহণ করে। (মাধ্যঃ কম্পঃ ১৯৭৭)

(গ) সঠিক জোড়া নির্ধারণকারী প্রশ্ন ঃ (বামদিকের তালিকার বাক্যাংশের সহিত ডানদিকের তালিকার সঠিক বাক্যাংশ যুক্ত কর)।

বামদিকের তালিকা	ডানদিকের তালিকা
(ক বিউমণ্ট ১৮২২ খ্রীস্টাব্দে	(১) একপ্রকার পতঙ্গভুক উদ্ভিদ।
(খ) ফুনক্ ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে	(২) খাদ্যে আয়োডিনের অভাব।
(গ) রক্তাল্পতা রোগের কারণ	(৩) সালোকসংশ্লেষ করিতে পারে না।
(ঘ) গলগণ্ড রোগের কারণ	(৪) ভিটামিন নামকরণ করেন।
(ঙ) স্বর্ণলতা	(৫) খাদ্য পরিপাকের পদ্ধতি নির্ণয় করেন
(চ) কলসীপত্রী	(৬) ভিটামিন B_{12}-এর অভাব।

(ঘ) **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ**

(১) খাদ্যের তিনটি প্রধান উপাদানের নাম লিখ। (২) মাটিতে কোন্ কোন্ মৌল দ্রব্যের অভাবে গাছের সবুজ পাতা হলুদ হয়ে যায়? (৩) পুষ্টি বলিতে কি বুঝ? (মাধ্যঃ কম্পঃ ১৯৭৭) (৪) ভিটামিন কি? (মাধ্যঃ কম্পঃ ১৯৭৬) (৫) সুষম খাদ্য কাহাকে বলে? (মাধ্যঃ কম্পঃ ১৯৭৬) (৬) ফ্যাট ও প্রোটিনের মধ্যে দুইটি প্রভেদ উল্লেখ কর। (মাধ্যঃ ১৯৭৭) (৭) প্রাণিদেহে নাইট্রোজেন কিরূপে আসে? (৮) একটি পরভোজী উদ্ভিদের নাম বল। (মাধ্যঃ কম্পঃ ১৯৭৭) (৯) আন্তঃকোষীয় পাচন হয় এমন একটি শ্রেণীর প্রাণীর নাম কর। (১০) উপচিতি বলিতে কি বুঝ? (১১) কিলো-ক্যালোরি কাকে বলে? (১২) দেহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ পরিপাক যন্ত্রের নাম কি? (১৩) গরুর খাদ্যের সেলুলোজ ভেঙ্গে কে পাচন ক্রিয়ায় সাহায্য করে? (১৪) আমাদের বৃদ্ধির জন্য কোন্ খাদ্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী? (১৫) উৎসেচক কাকে বলে? (১৬) খাদ্যে লৌহের অভাবে উদ্ভিদ দেহে কি লক্ষণ দেখা যায়? (মাধ্যঃ কম্পঃ ১৯৭৭) (১৭) শ্বেতসার পরিপাকে সাহায্য করে এমন একটি উৎসেচকের নাম কর। (১৮) লাইপেজ নামক উৎসেচক কোন্ জাতীয় খাদ্যের উপর ক্রিয়া করে? (১৯) মানব দেহে বসবাসকারী ব্যাকটিরিয়ার দ্বারা উৎপন্ন একটি ভিটামিনের নাম কর।

(ঙ) **ভুল-নির্ভুল নির্ধারণকারী প্রশ্ন ঃ** (নিম্নলিখিত বর্ণনাগুলির মধ্যে যেটি নির্ভুল তার পাশে "হাঁ" ও ভুলের পাশে "না" লিখ)।

(১) সবুজ উদ্ভিদেরা নিজেদের খাদ্য উৎপাদন করে, এজন্য এদের স্বভোজী বলে।…… (২) খাদ্যপ্রাণ উৎসেচককে সক্রিয় করে।…… (৩) লিপোলাইটিক উৎসেচক প্রোটিন পরিপাকে সাহায্য করে।…… (৪) পৌষ্টিক নালীর সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র অংশের নাম ক্ষুদ্রান্ত্র।…… (৫) গঠনমূলক বিপাককে উপচিতি বলে।…… (৬) রক্তের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ শর্করা ইনসুলিন ধরে রাখে।…… (৭) প্রতি গ্রাম স্নেহ ৪৫ ক্যালোরি তাপশক্তি উৎপন্ন করে।… (৮) প্রাণিজগৎ খাদ্যের জন্য উদ্ভিদ জগতের উপর নির্ভরশীল।… (৯) যে সকল উপাদান অল্পপরিমাণে থেকে উদ্ভিদের পুষ্টিসাধন করে তাদের ম্যাক্রোএলিমেন্ট বলে।…… (১০) জীবের সকল প্রকার খাদ্যের মূল উপাদান অক্সিজেন।…… (১১) প্রোটিনের একক অ্যামাইনো অ্যাসিড।… (১২) মানুষের অন্ত্রে ভিটামিন K উৎপন্ন হয়।…

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : সংবহন ও রক্ত পৃষ্ঠা

(ক) বর্ণনামূলক প্রশ্ন : ৬৫—৯১

১। সংবহন কাকে বলে? উদ্ভিদ ও প্রাণীর সংবহনের পার্থক্য কি কি? ২। রক্ত সংবহন বিষয়ে কে প্রথম আবিষ্কার করেন? রক্ত কিরূপে হৃদ্‌যন্ত্র থেকে দেহের কোষ ও কলায় পরিবাহিত হয়ে পুনর্বার হৃদ্‌যন্ত্রে প্রত্যাবর্তন করে লিখ। ৩। শরীরের ভিতর রক্তে কি কারণে স্রোতের (প্রবাহের) সৃষ্টি হয়? এই স্রোতের উদ্দেশ্য কি? বিশুদ্ধ রক্ত কাহাকে বলে? (মাধ্যঃ ১৯৭৬) ৪। ব্যাঙের হৃদ্‌যন্ত্র ও মানুষের হৃদ্‌যন্ত্রের মধ্যে প্রধান পার্থক্য কি কি? মানুষের হৃদ্‌যন্ত্রের আভ্যন্তরিক গঠন বর্ণনা কর। ৫। মানুষের হৃদ্‌যন্ত্র প্রতি মিনিটে কতবার স্পন্দিত হয়? নাড়ী কাকে বলে এবং নাড়ী দেখে কি বুঝা যায়? রক্ত চাপের সংজ্ঞা লিখ। কোন্ যন্ত্রের সাহায্যে রক্তচাপ নির্ণীত হয়? ৬। রক্তের তঞ্চন বলিতে কি বুঝ? কি উপায়ে রক্তের তঞ্চন ক্রিয়া ঘটে এবং রক্তবাহের মধ্যে রক্তের তঞ্চন হয় না কেন? ৭। রক্ত কি? ইহার মধ্যে যে সমস্ত কণিকা আছে তাহাদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও (উচ্চ মাদ্রাসা ১৯৭৬) ৮। দেহের অনাক্রম্যতা কি? ভ্যাকসিন ও প্রতিবিষ কাকে বলে? ভ্যাকসিন ও প্রতিবিষের উদাহরণ দাও। ৯। রক্ত যখন বিভিন্ন অঙ্গের মধ্য দিয়া সঞ্চালিত হয় তখন উহা তথায় কিছু পদার্থ গ্রহণ করিতে অথবা কিছু বর্জন করিতে পারে। নিম্নলিখিত অঙ্গগুলির প্রতিটি হইতে রক্ত কি গ্রহণ এবং কি বর্জন করিতে পারে তাহা লিখ :— (ক) ফুসফুস, (খ) বৃক্ক, (গ) ক্ষুদ্রান্ত্র এবং (ঘ) চর্ম। (মাধ্যঃ ১৯৭৭) ১০। জাইলেম ও ফ্লোয়েম কলা কিরূপে উদ্ভিদের সংবহনে সাহায্য করে বর্ণনা কর। উদ্ভিদের সংবহনে সংসক্তির মতবাদ বিষয়ে যা জান লিখ। ১১। বন্ধ ও মুক্ত সংবহন-তন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য কি? পরিবহনের দিক হতে রক্ত প্রাণিদেহে কিভাবে কাজ করে? মানুষের ধমনীর রক্ত উজ্জ্বল লাল বর্ণের কিন্তু শিরার রক্ত কালচে লাল কেন? রক্তের তিনটি প্রধান কাজ কি কি?

(খ) শূন্যস্থান পূর্ণ কর :

(১) উদ্ভিদ মাটি থেকে — দ্বারা জল শোষণ করে। (উচ্চ মাদ্রাসা ১৯৭৭)
(২) কেঁচোর রক্তে হিমোগ্লোবিন — দ্রবীভূত এবং ব্যাঙের রক্তের —— থাকে।
(৩) আরশোলার সংবহনতন্ত্র — শ্রেণীর কিন্তু মানুষের সংবহনতন্ত্র — শ্রেণীর।
(৪) পালমোনারি শিরা — রক্ত এবং পালমোনারি ধমনী — রক্ত বহন করে।
(৫) মানুষের — শ্রেণীর রক্তকে সার্বজনীন দাতা বলে। (৬) জেনারের আবিষ্কৃত — টিকাকে — বলে।

(গ) সঠিক জোড়া নির্ধারণকারী প্রশ্ন ঃ (বামদিকের তালিকার বাক্যাংশের সহিত ডানদিকের তালিকার সঠিক বাক্যাংশ যুক্ত কর)।

বামদিকের তালিকা	ডানদিকের তালিকা
(ক) জাইলেমবাহিকার মাধ্যমে	(১) অস্থির মজ্জায় উৎপন্ন হয়
(খ) লোহিত রক্তকণিকা	(২) পাতায় উৎপন্ন খাদ্য সংবহিত হয়
(গ) AB শ্রেণীর রক্তকে	(৩) মূল দ্বারা শোষিত জল সংবহিত হয়.
(ঘ) ফ্লোয়েমকলার মাধ্যমে	(৪) সার্বজনীন গ্রহীতা বলে

(ঘ) সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(১) রক্তের রং লাল কেন ? (মাধ্যঃ কম্পঃ, ১৯৭৬) (২) কেঁচোর রক্ত লাল কেন ? (৩) আমাদের শরীরের কোনও অংশ কাটিয়া যাইলে, কাটা স্থান হইতে সমস্ত রক্ত বাহির হইয়া যায় না কেন ? (মাধ্যঃ কম্পঃ, ১৯৭৬) (৪) শরীরে লোহিত রক্তকণিকা কোথায় প্রস্তুত হয় ? (মাধ্যঃ ১৯৭৭) (৫) মানুষের লোহিত রক্ত-কণিকায় কি নিউক্লিয়াস আছে ? (মাধ্যঃ কম্পঃ, ১৯৭৭) (৬) সিস্টোল ও ডায়াস্টোল বলিতে কি বোঝ ? (৭) চিংড়ি ও আরশোলার রক্তের বর্ণ লাল নয় কেন ? (উচ্চ মাদ্রাসা ১৯৭৭) (৮) কোন্ রক্তকোষ রোগজীবাণুর আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে ? (৯) লোহিত রক্ত কণিকার শ্বাসক্রিয়া সহায়ক রঙ্গক পদার্থের নাম কি ? (১০) পেরিকার্ডিয়াম কি ? (১১) কোন্ প্রাণীর দেহে রক্তজালক নাই ? (১২) কোন্ শ্রেণীর রক্তকে 'সার্বজনীন দাতা' বলে ?

(ঙ) ভুল-নির্ভুল নির্ধারণকারী প্রশ্ন ঃ (নিম্নলিখিত বর্ণনাগুলির যেটি নির্ভুল তার পাশে "হাঁ" ও ভুলের পাশে "না" লিখ)।

(১) ধমনীর প্রাচীরের পার্শ্বচাপকে রক্তচাপ বলে।...(২) রক্তচাপ নির্ণয় করার যন্ত্রের নাম ব্যারোমিটার।...(৩) জালক হৃদ্‌যন্ত্রে রক্ত ফিরিয়ে আনে।...(৪) ধমনীতে কপাট থাকে।... (৫) মানুষের হৃদ্‌যন্ত্রে চারটি প্রকোষ্ঠ থাকে।... (৬) চিংড়ির রক্তের রঙ লাল।...... (৭) মানুষের রক্তে শ্বেতরক্ত কণিকার পরিমাণ লোহিত রক্ত কণিকা অপেক্ষা অধিক।... (৮) রক্তরসকে লসিকা বলে।... (৯) সব স্তন্যপায়ীর রক্তের লোহিত কণিকায় নিউক্লিয়াস থাকে।... (১০) রক্ততঞ্চনের জন্য প্রয়োজনীয় উৎসেচকের নাম পেপসিন।...

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ চলন ও গমন **পৃষ্ঠা**

(ক) বর্ণনামূলক প্রশ্ন ঃ ৯২—১০৬

১। সঞ্চালন ও চলনের মধ্যে পার্থক্য কি ? জীবের চলন ক্রিয়ার দুইটি উদ্দেশ্য

উল্লেখ কর। এককোষী ও বহুকোষী জীবের একটি করিয়া চলন অঙ্গের নাম লিখ। (মাধ্যঃ ১৯৭৬) ২। প্রোটোপ্লাজমে কি প্রকার চলন দেখা যায়? এই চলনের উদ্দেশ্য কি? প্রাণিকোষে এই চলন দেখা যায় কি? টিকটিকির চলন অঙ্গের দুইটি বৈশিষ্ট্য লিখ। (মাধ্যঃ ১৯৭৭) ৩। উদ্ভিদের যে অংশ মাটির বিপরীত দিকে চালিত হয় তাহার নাম লিখ। আলোকের দিকে চালিত হয় উদ্ভিদের এমন অংশের নাম বল। ইহাদের কি ধরনের চলন বলে? (মাধ্যঃ কম্পঃ ১৯৭৭) ৪। দিগ্‌নির্ণীত ও ব্যাপ্তি (ন্যাস্টিক) চলন কাকে বলে? উভয় প্রকার চলনের তুলনা কর। ৫। অভিকর্ষবৃত্তি কাহাকে বলে? অভিকর্ষবৃত্তিতে কোন্ উদ্ভিদ হরমোন কাজ করে? পরীক্ষার মাধ্যমে অভিকর্ষবৃত্তি বুঝাইয়া দাও। ৬। অ্যামিবা, মনোসিস্টিস ও হাইড্রার চলন বর্ণনা কর। ৭। প্রাণীদের চলনে পেশীর কাজ বর্ণনা কর। পেশীর সংকোচন কিভাবে হয়? ক্লান্তি কেন হয়?

(খ) শূন্যস্থান পূর্ণ কর ঃ

(১) জীবের একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাওয়াকে—এবং জীবের কোষের কোনও অঙ্গের স্থান পরিবর্তনকে—বলে। (২) প্রোটোপ্লাজমের গহ্বরের চতুস্পার্শ্বের চলনকে —এবং অনিয়ত চলনকে—বলে। (৩) অ্যামিবার চলনে যে প্রোটোপ্লাজমীয় অঙ্গ নির্গত হয় তাকে—বলে। (৪) মূল প্রতিকূল এবং কাণ্ড অনুকূল—চলন দেখা যায়। (৫) ডিগবাজি চলন—প্রাণীতে দেখা যায়।

(গ) সঠিক জোড়া নির্ধারণকারী প্রশ্ন ঃ

(বামদিকের তালিকার বাক্যাংশের সহিত ডানদিকের তালিকার সঠিক বাক্যাংশ যুক্ত কর)

বামদিকের তালিকা	ডানদিকের তালিকা
(ক) ক্ষণপদের সাহায্যে চলন অ্যামিবা ব্যতীত উদ্ভিদ জগতের	(১) মনোসিস্‌টিসের বৈশিষ্ট্য
(খ) বল্লী জাতীয় উদ্ভিদের চলনকে	(২) রসস্ফীতির জন্য ঘটে।
(গ) মায়োসিস সূত্রের সাহায্যে চলন	(৩) অস্থিকে যুক্ত করে।
(ঘ) বিভিন্ন অস্থিকে সংযুক্ত করে তার নাম	(৪) মিক্সোমাইটোসিসে দেখা যায়।
(ঙ) লজ্জাবতী লতার পাতা মুড়িয়া যাওয়া	(৫) লিগামেণ্ট।
(চ) টেনডন পেশীর সহিত	(৬) সারকামনুটেশান বলে।

(ঘ) সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। এমন একটি প্রাণীর নাম কর যাহা একস্থান হতে অন্যস্থানে যাইতে পারে না এবং একটি উদ্ভিদের নাম কর যাহা একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইতে পারে। (মাধ্যঃ ১৯৭৭) ২। "গাছের ডালপালা আলোর দিকে যাচ্ছে"—ইহা কি ধরনের চলন ? ৩। "গাছের মূল মাটির তলায় যাচ্ছে"—ইহা কি ধরনের চলন ? ৪। "পদ্মফুল আলোকে প্রস্ফুটিত হয় এবং অন্ধকারে মুদিয়া যায়"—ইহা কোন্ প্রকারের চলন। ৫। "লজ্জাবতী গাছের পাতা স্পর্শ করলে সঙ্গে সঙ্গে মুড়ে যায়"—ইহা কি ধরনের চলন ? ৬। গমন ক্রিয়া হয় এমন একটি উদ্ভিদের নাম কর। ৭। টবের গাছ শুইয়ে রাখলে কাণ্ড উপরে বেঁকে উঠে কেন ? ৮। কেঁচো কিভাবে চলাচল করে ? ৯। ট্রাইসেপস পেশী সংকোচনের ফলে কি ঘটে ?

(ঙ) ভুল-নির্ভুল নির্ধারণকারী প্রশ্ন ঃ (নিম্নের উক্তিগুলি নির্ভুল হলে "হাঁ" এবং ভুল হলে "না" লিখ)।

১। উদ্ভিদের বৃদ্ধির হার নির্ণায়ক যন্ত্র ক্রেস্কোগ্রাফ জগদীশচন্দ্র বসু আবিষ্কার করেন।··· ২। মটর গাছের কাণ্ড আশ্রয়ের চারদিকে জড়িয়ে উঠতে থাকে, এই চলনকে নুটেশান বলে।······ ৩। উদ্ভিদ কাণ্ডের আলোর দিকে ধাবিত হওয়াকে জলবৃত্তি বলে।······ ৪। লজ্জাবতীর পাতায় হাত দিয়ে স্পর্শ করলে নুয়ে পড়ে, এই চলনকে থারমোন্যাস্টি বলে।······ ৫। মূল ও কাণ্ডের বৃদ্ধি অক্সিন নামক হরমোন দ্বারা ঘটে।······ ৬। অ্যামিবার মত শ্বেতরক্ত কণিকাও ক্ষণপদ বিস্তার করে।······ ৭। কেঁচো সিটার সাহায্যে স্থানান্তরে গমন করে।······ ৮। মাছ অগ্রবর্তী জোড়া পাখনার সাহায্যে জলের মধ্যে চলাচল করে।······ ৯। সাপ লেজের সাহায্যে চলতে পারে।··· ১০। অধিক শারীরিক পরিশ্রমে পেশীর মধ্যে ল্যাকটিক অ্যাসিড জমে কর্মক্ষমতা হারানকে ক্লান্তি বলে।······

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ রেচন

পৃষ্ঠা

(ক) বর্ণনামূলক প্রশ্ন ঃ ১০৭—১১৬

১। রেচন ক্রিয়া কাহাকে বলে ? রেচনজাত পদার্থগুলি কিভাবে কাজে লাগে ? (মাধ্যঃ ১৯৭৬) ২। উদ্ভিদের রেচনক্রিয়া কিরূপে হয় এবং বিভিন্ন বর্জ্যবস্তু কি কি ? পাতা ঝরানো ও ফল পাকানোতে উদ্ভিদের কোন্ বর্জ্যবস্তু সাহায্য করে ? ৩। অ্যামিবা, প্যারামেসিয়াম, হাইড্রা ও কেঁচো ইত্যাদি প্রাণীর রেচনযন্ত্র ও রেচনক্রিয়া কিরূপে সাধিত হয় ? বিভিন্ন বর্জ্যবস্তু কিভাবে উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রয়োজনে লাগে লিখ।

৪। মানুষের রেচন যন্ত্রের আভ্যন্তরিক গঠনের বর্ণনা কর এবং কিভাবে মূত্র উৎপন্ন হয় লিখ। ৫। বৃক্ক ব্যতীত আর কোন্ কোন্ অঙ্গ বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশনে সাহায্য করে? সেই সব অঙ্গের কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর। ৬। পরিবেশের মধ্যে রেচনজাত বর্জ্যপদার্থগুলি পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া কিরূপে উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের উপকার করে তাহা লিখ। ৭। বর্জ্যপদার্থ কাহাকে বলে? রেচনের মূল উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য বর্ণনা কর। ৮। আমাদের দেহের রেচনক্রিয়া প্রয়োজনীয় কেন? মূত্রের গঠন কি? মূত্রস্থলী নেই এমন একটি মেরুদণ্ডী প্রাণীর নাম লিখ।

(খ) শূন্যস্থান পূর্ণ কর ঃ

(১) আঙুরগুচ্ছের আকারের $CaCO_3$ কেলাস — পাতায় — পদার্থরূপে সঞ্চিত থাকে। (২) রজন — গাছের — পদার্থ। (৩) — কোনও নির্দিষ্ট রেচনতন্ত্র নাই। (৪) — মধ্যে অ্যামাইনো অ্যাসিডের অ্যামোনিয়ায় রূপান্তরকে — বলে। (৫) চ্যাপ্টা কৃমির রেচনযন্ত্রকে — এবং চিংড়ির রেচনযন্ত্রকে — বলে। (৬) বাওম্যানস্ ক্যাপসিউলের মধ্যে যে ক্যাপিলারিগুলি থাকে তাদের একত্রে — বলে।

(গ) সঠিক জোড়া নির্ধারণকারী প্রশ্ন ঃ (বামদিকের তালিকার বাক্যাংশের সহিত ডানদিকের তালিকার সঠিক বাক্যাংশ যুক্ত কর)।

বামদিকের তালিকা	ডানদিকের তালিকা
(ক) স্থঁচের আকৃতির র‍্যাফাইডগুলি	(১) প্রোটিন ভেঙ্গে উৎপন্ন হয়
(খ) ম্যালপিঘিয়ান কর্পাসলের মাধ্যমে	(২) গুয়ানো বলে
(গ) প্রাণিদেহে উৎপন্ন অ্যামোনিয়া	(৩ রেচন পদার্থ দূরীভূত হয়
(ঘ) পাখীদের রেচনপদার্থ ও মলকে	(৪) আরশোলার রেচনক্রিয়া হয়
(ঙ) পত্রমোচনের মাধ্যমে উদ্ভিদের	(৫) ক্যালসিয়াম অক্সলেটের কেলাস

(ঘ) সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। সালোকসংশ্লেষের ফলে শ্বেতসার খাদ্য উৎপন্ন হয়, কিন্তু মূলতঃ কোন জৈব প্রক্রিয়ার ফলে গাছে রবার উৎপন্ন হয়? (মাধ্যঃ ১৯৭৭) ২। উদ্ভিদের একটি রেচন পদার্থের নাম বল। (মাধ্যঃ কম্পঃ ১৯৭৭) ৩। চিংড়ির রেচন অঙ্গের নাম লিখ। ৪। কেঁচোর রেচন ও জমির উর্বরাশক্তির সম্বন্ধ কি? ৫। মানুষের বৃক্কের কার্যকরী একক কি? ৬। চিংড়ি খোলস ত্যাগ করে কেন? ৭। চ্যাপ্টা কৃমির ফ্লেম কোষ ও মানুষের চর্ম কি কাজ করে? ৮। কেঁচোর রেচন অঙ্গের নাম কি?

৯। বাণিজ্যিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত উদ্ভিদের চারটি রেচন পদার্থের নাম লিখ। ১০। কচু খেলে গলা চুলকায় কেন?

(ঙ) ভুল-নির্ভুল নির্ধারণকারী প্রশ্ন: (সঠিক উক্তির পাশে "হাঁ" এবং ভুল উক্তির পাশে "না" লিখ।)

১। ম্যালপিঘিয়ান কর্পাসল নেফ্রনের প্রথম অংশ।··· ২। 'গুয়ানো' মানুষের বর্জ্যপদার্থ।··· ৩। ট্যানিন্ উদ্ভিদের বর্জ্যপদার্থ।··· ৪। রেচন ক্রিয়া মানুষের দেহে জলসাম্য রক্ষা করে।··· ৫। সিস্টোলিথ্ শ্বেতসার জাতীয় পদার্থ।··· ৬। অ্যামিবার সংকোচনশীল গহ্বর রেচন পদার্থ বহন করে।··· ৭। পৌষ্টিক নালীর মাধ্যমে বহিষ্কৃত মলকে রেচন পদার্থ বলে।··· ৮। ঘর্ম একপ্রকার রেচন পদার্থ।···

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: মাটি, জীবাণু ও ভাইরাস — পৃষ্ঠা ১১৭—১৩০

(ক) বর্ণনামূলক প্রশ্ন:

১। মাটির সংজ্ঞা কি? মাটির উৎপত্তি বিষয়ে যা জান লিখ। মাটির প্রোফাইল কাকে বলে? ২। মাটির তিনটি প্রধান উপাদানের নাম লিখ। মাটির শ্রেণী বিভাগ কিভাবে করা হয়েছে? কৃষিকার্যে কোন্ মাটি ভাল? ৩। মাটি কাকে বলে? জীবনের অস্তিত্ব রক্ষায় মাটির ভূমিকা লিখ। ৪। মাটির উর্বরাশক্তি প্রধানতঃ কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে? মাটির উর্বরাশক্তি বৃদ্ধিতে কেঁচো ও জীবাণুর ভূমিকার বর্ণনা দাও। (উচ্চ মাদ্রাসা ১৯৭৬) ৫। জীবাণু কাদের বলে? নাইট্রিফিকেশান, ডিনাইট্রিফিকেশান, নাইট্রোজেনের বন্ধন, মিথোজীবিতা প্রক্রিয়াগুলি কাহাদের বলে? মানুষের কল্যাণে জীবাণুর ব্যবহার বিষয়ে কি জান? ৬। ব্যাকটিরিয়া কি? ব্যাকটিরিয়ার দ্বারা মানুষের কি কি উপকার হয় লিখ। ৭। ব্যাকটিরিয়া কি উদ্ভিদ? এদের কোষের দৈর্ঘ্য কত? তিন প্রকারের ব্যাকটিরিয়ার নাম উল্লেখ কর। ইহারা কোন্ কোন্ রোগ বিস্তার করে? ৮। ভাইরাস ও ব্যাকটিরিয়ার মধ্যে পার্থক্য কি কি? ভাইরাস কে আবিষ্কার করেন? মাইক্রন ও মিলিমাইক্রন কি তাহা ব্যাখ্যা করে ভাইরাসের আয়তন কত বল? ৯। জীবাণুর আকৃতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। পৃথিবী হঠাৎ যদি জীবাণু শূন্য হয়ে যায় তাহলে জীবজগতের কি বিপর্যয় ঘটতে পারে তা বর্ণনা কর। ১০। উপকারী জীবাণু সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ রচনা কর। (উচ্চ মাদ্রাসা ১৯৭৬)।

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন:

(১) ইনফ্লুয়েঞ্জা কি ভাইরাস-ঘটিত রোগ? ২। ভাইরাস কোন্ ধরনের

পরজীবী ? ৩। জীবাণু কি ? ৪। ব্যাকটিরিয়া কি উদ্ভিদ ? (মাধ্যঃ ১৯৭৭) ৫। ব্যাকটিরিয়ার দ্বারা উৎপন্ন দুটি ব্যাধির নাম লিখ। ৬। শিম্বজাতীয় উদ্ভিদের মূলে অর্বুদ গঠনকারী জীবাণুর নাম কি ? (মাধ্যঃ ১৯৭৬) ৭। ব্যাকটিরিয়া আমাদের কিভাবে উপকার করে ? ৮। 'শারীরবৃত্তীয় শুষ্ক মাটি' কাকে বলে ? ৯। ভাইরাস কিভাবে সংক্রামিত হয় ? ১০। একটি উপকারী ব্যাকটিরিয়ার নাম লিখ। (মাধ্যঃ ১৯৭৭) ১১। ব্যাকটিরিয়ার দ্বারা উৎপন্ন অ্যান্টিবায়োটিক ঔষধের নাম লিখ। ১২। পলিওমাইয়েলাইটিস্ কোন্ জীবাণু আক্রমণের দ্বারা ঘটে ?

(গ) ভুল-নির্ভুল নির্ধারণকারী প্রশ্ন : (সঠিক উক্তির পাশে "হাঁ" এবং ভুল উক্তির পাশে "না" লিখ)।

১। 'শারীরবৃত্তীয় শুষ্ক মাটি' চাষের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী।··· ২। হিউমাস এক প্রকার মাটি।··· ৩। দো-আঁশ মাটিতে কাদা ও বালির ভাগ সমান এজন্য কৃষিকার্যে উপযোগী। ৪। হাম, বসন্ত ইত্যাদি মশার দ্বারা সংক্রামিত হয়।··· ৫। টোব্যাকো মোজাইক ভাইরাস খালি চোখে দেখা যায়।··· ৬। বসন্তের ভাইরাস পরিস্রাবণযোগ্য। ৭। ভাইরাসের দেহ DNA বা RNA দ্বারা তৈরী।·· ৮। ব্যাকটিরিয়ার কোষে নিউক্লিয়াস, মাইটোকনড্রিয়া ইত্যাদি থাকে না।··· ৯। লুইপাস্তুর ভাইরাস আবিষ্কার করেন।··· ১০। বাইজেরিঙ্ক ব্যাকটিরিয়া আবিষ্কার করেন।···

সপ্তম পরিচ্ছেদ : পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্রদের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়

পৃষ্ঠা ১৩১—১৪৮

(ক) বর্ণনামূলক প্রশ্ন :

১। বালুকাকৃষ্টি বা জলকৃষ্টি পরীক্ষার মাধ্যমে উদ্ভিদের NPKর প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর। ২। উদ্ভিদের শ্বসনে প্রাণীদের মত অক্সিজেন গৃহীত এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিত্যক্ত হয় ; একটি পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ কর। ৩। উদ্ভিদদেহে অবাত শ্বসন ক্রিয়া চলে—ইহা একটি পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ কর। ৪। সালোকসংশ্লেষের ফলে অক্সিজেন উৎপন্ন হয়—পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ কর। ৫। সালোকসংশ্লেষ সূর্যালোক ব্যতীত হয় না—পরীক্ষার মাধ্যমে বুঝাইয়া দাও। ৬। আরশোলার পৌষ্টিক নালীর ব্যবচ্ছেদ প্রণালী বর্ণনা কর এবং চিত্র অঙ্কন কর। ৭। ব্যাঙের পৌষ্টিকতন্ত্রের ব্যবচ্ছেদ প্রণালী বর্ণনা করিয়া চিত্র অঙ্কন কর। ৮। শ্বসন ও রক্ত সংবহনের উপর ব্যায়ামের প্রতিক্রিয়াগুলি বর্ণনা কর।

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

(১) উদ্ভিদের পাতার ফলকের ধার এবং মুকুল কোন্ মৌলিক উপাদানের অভাবে শুকিয়ে যায় ? (২) জলকৃষ্টি পরীক্ষায় কোন্ কোন্ বিজ্ঞানীর ফর্মুলা ব্যবহৃত হয় ? (৩) উদ্ভিদের পাতায় হলদে দাগ কেন দেখা যায় ? (৪) অবাতশ্বসনে অক্সিজেনের প্রয়োজনীয়তা আছে কি ? (৫) প্রজাপতি কোন্ কোন্ গাছে ডিম পাড়ে ? (৬) কোকুন বা গুটি কাকে বলে ? (৭) অ্যানোফিলিস মশার পিউপা দেখতে কেমন ? (৮) কিউলেক্স মশার লার্ভা জলের মধ্যে কিরূপে ভাসে ?

(গ) ভুল-নির্ভুল নির্ধারণকারী প্রশ্ন : (নির্ভুল উক্তির পাশে 'হাঁ' এবং ভুল উক্তির পাশে 'না' লিখ) ।

(১) বালুকাকৃষ্টি পরীক্ষায় বালুকাগুলিকে ভালভাবে ধোয়া উচিত।··· (২) নাইট্রোজেন উদ্ভিদের দেহের প্রোটিন গঠন করে।··· (৩) সালোকসংশ্লেষের পরীক্ষায় সূর্যালোক যে প্রয়োজনীয় তা হাইড্রিলার দ্বারা পরীক্ষা করা সহজ।··· (৪) আরশোলাকে চিৎ করে অঙ্কীয়দেশ থেকে ব্যবচ্ছেদ করলে পৌষ্টিকনালী বের করা সহজ।··· (৫) মশার শূককীট খোলস ত্যাগ করে পূর্ণাঙ্গ মশায় পরিণত হয়।······ (৬) ব্যাঙের পৌষ্টিকতন্ত্রের ব্যবচ্ছেদ পৃষ্ঠের দিক থেকে করা উচিত নয়।

———

মৌখিক প্রশ্নমালা

প্রথম পরিচ্ছেদ ॥ সালোকসংশ্লেষ ও শ্বসনের তাৎপর্য পৃষ্ঠা ১—২৬

১। ভন হেলমণ্ট কে? ২। ইনজেন হাউজ কোন্ পরীক্ষা করেছিলেন? ৩। আঁটোয়নি ল্যাভোসিয়র কি আবিষ্কার করেন? ৪। সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয় রঞ্জক পদার্থের নাম কি? এই পদার্থ কোথায় থাকে? ৫। পৃথিবীতে সকল শক্তির উৎস কোথা থেকে হয় বল। ৬। সূর্যালোক বিকিরণের মধ্যে শতকরা কত পরিমাণ সালোকসংশ্লেষে লাগে? ৭। পাতার কোন্ প্রকার কোষে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া ঘটে? ৮। ফোটন্ কাকে বলে এবং এর কাজ কি? ৯। সালোকসংশ্লেষের সময় উদ্ভিদ কোন্ গ্যাস ত্যাগ করে (মাধ্যঃ, ১৯৭৭) ১০। উদ্ভিদ কি প্রক্রিয়ার জন্য CO_2 গ্রহণ করে? কোন্ সময়ে রাত্রে অথবা দিনে? (মাধ্যঃ, ১৯৭৭) ১১। শ্বাসমূল কোন্ উদ্ভিদে থাকে? এই মূল কোন্ দিকে যায়? (মাধ্যঃ, ১৯৭৭) ১২। উদ্ভিদ তাহার খাদ্য কোথা হইতে সংগ্রহ করে? উদ্ভিদের কিছু খাদ্যের নাম কর। (মাধ্যঃ, ১৯৭৭) ১৩। সালোকসংশ্লেষের দুটি পর্যায়ের নাম বল। ১৪। সালোকসংশ্লেষের উৎপন্ন O_2-এর উৎস কি? ১৫। 'এনার্জি কারেন্সি' কাকে বলে? ১৬। সালোকসংশ্লেষের সময় কি কি মৌলিক উপাদান প্রয়োজন হয়? এই ক্রিয়ায় সূর্যালোকের প্রয়োজন কেন? (মাধ্যঃ, ১৯৭৬) ১৭। শ্বসন কোন্ প্রকার বিপাক? ১৮। শ্বাস ক্রিয়ার প্রধান উদ্দেশ্য কি? বায়ুতে O_2 পরিমাণ শতকরা কত? (মাধ্যঃ, ১৯৭৭) ১৯। বায়ুমণ্ডলের শতকরা কতটুকু CO_2? বায়ুতে CO_2 এবং O_2-এর সমতা কি করিয়া বজায় থাকে? (মাধ্যঃ, ১৯৭৬, '৭৭) ২০। নিশ্বাস বায়ু চুণের জলে ত্যাগ করিলে ঘোলাটে হয় কেন? অবাত শ্বসন কাহাকে বলে? (মাধ্যঃ, ১৯৭৭) ২১। অবাত শ্বসনের ফলে কোন্ পদার্থ তৈয়ারী হয়? (মাধ্যঃ, ১৯৭৭) ২২। কঠিন পরিশ্রমের পর শ্বসনের হার বৃদ্ধি পায় না হ্রাস হয়? (মাধ্যঃ, ১৯৭৭) ২৩। আরশোলার শ্বাসছিদ্র কোথায় থাকে? মাছ কিসের সাহায্যে শ্বসন করে? কোথা হইতে O_2 পায়? (মাধ্যঃ, ১৯৭৭) ২৪। চর্মের সাহায্যে কোন্ কোন্ প্রাণীর শ্বাসকার্য হয়? ২৫। কই মাছ শুকনো ডাঙায় কিরূপে শ্বাসকার্য চালায়? ২৬। শ্বাসনিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র মস্তিষ্কের কোথায় অবস্থিত? ২৭। পর্বতারোহীরা অতি উচ্চতায় শ্বাসকষ্টে পড়ে কেন? ২৮। রক্তের মধ্যে অক্সিজেন বহনকারী কণিকার নাম কি? ২৯। শ্বসনের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় দুটি

পর্যায় কি বল। ৩০। কোষের বিদ্যুৎকেন্দ্র কাকে বলে ? ৩১। এক গ্রামমোল গ্লুকোজ জারণের ফলে যে তাপ উৎপন্ন হয় তার পরিমাণ কত ? এর ফলে জীবদেহ পুড়ে যায় না কেন ? ৩২। গাছের কাণ্ডে কি শ্বাসকার্য হয় ? শ্বাসক্রিয়া বেশী হয় গাছের কোন অঙ্গে ? (মাধ্যঃ, ১৯৭৬)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥ পুষ্টি, বিপাক ও পরিপাক ঃ খাদ্য, ভিটামিন এনজাইম, খনিজ লবণ ও জল পৃষ্ঠা ২৭—৬৫

১। প্রাণীরা খাদ্যের জন্য কাদের উপর নির্ভরশীল ? ২। সবুজ কণাবিহীন একটি গাছের নাম বল। এদের মূলের নাম কি ? (মাধ্যঃ, ১৯৭৭) ৩। মাটিতে নাইট্রোজেনের অভাবের জন্য যে উদ্ভিদ পতঙ্গকে খাদ্যরূপে গ্রহণ করে তার নাম কি এবং কোথায় পাওয়া যায় ? ৪। খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা কি ? খাদ্যের প্রধান তিনটি উপাদান কি ? (মাধ্যঃ, ১৯৭৬) ৫। গাছ কঠিন খাদ্য খাইতে পারে না কেন ? (মাধ্যঃ, ১৯৭৭) ৬। বায়ুতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ কত ? (মাধ্যঃ, ১৯৭৭) ৭। অপর গাছ হইতে খাদ্য সংগ্রহ করে এরূপ একটি উদ্ভিদের নাম কর। এই দুই উদ্ভিদের সম্পর্ককে কি বলে ? (মাধ্যঃ ১৯৭৭) ৮। একটি গাছের পাতা হলুদ বর্ণ হইয়া যাইতেছে কেন ? কি করিয়া ইহা রোধ করা সম্ভব ? (মাধ্যঃ, ১৯৭৭) ৯। লাইকেন কোন্ জাতের উদ্ভিদ ? ১০। নাইট্রোজেনঘটিত খাদ্যকে কি বলে ? আমরা প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন কোথা হইতে পাই (মাধ্যঃ, ১৯৭৬) ১১। উদ্ভিদের অধিক মৌল উপাদান কি কি ? ১২। উদ্ভিদ অধিক মৌল উপাদানের মধ্যে কোন্‌গুলি বায়ু থেকে নেয় বল। ১৩। দেহে প্রয়োজনের অধিক পরিমাণ অ্যামাইনো অ্যাসিড কি পদার্থ উৎপন্ন করে ? ১৪। কিলো-ক্যালোরি কাকে বলে ? ১৫। পলিস্যাকারাইড ও মনোস্যাকারাইডেরা কি এক বস্তু ? ১৬। শ্বেতসার খাদ্য পরিপাকের অন্তঃপদার্থ কি ? (মাধ্যঃ, ১৯৭৭) ১৭। তেল ও ঘি-এর মধ্যে প্রধান পার্থক্য কি ? ১৮। বেরিবেরি কোন্ খাদ্যপ্রাণের অভাবে হয় বল। ১৯। রাতকাণা রোগ কোন্ খাদ্যপ্রাণের অভাবের ফল ? ২০। কোয়াশিয়োরকর রোগের হেতু কি ? ২১। ছানা কি জাতীয় খাদ্য ? নাইট্রোজেন কোন্ খাদ্যের উপাদান (মাধ্যঃ, ১৯৭৭) ২২। সুষম খাদ্য কাহাকে বলে ? যুক্তি দেখাইয়া বল দুধ সুষম খাদ্য কি না ? (মাধ্যঃ, ১৯৭৭) ২৩। স্নেহ পদার্থ পরিপাকের অন্তঃপদার্থগুলি কি কি ? ২৪। স্নেহ পদার্থ যুক্ত দুইটি খাদ্যের নাম কর। (মাধ্যঃ,

১৯৭৭) ২৫। প্রাণী ও উদ্ভিদের জল প্রয়োজন কেন? ২৬। উৎসেচক কি? ইহাদের কার্য কি? (মাধ্যমিক, ১৯৭৭) ২৭। পরিপাক ও বিপাকের মধ্যে পার্থক্য কি? (১৯৭৬) ২৮। ক্ষণপদ বিস্তার দ্বারা কোন্ প্রাণী খাদ্য শিকার করে? ২৯। কেঁচো কি খায় বল। ৩০। কোন্ কোন্ প্রাণীর পাকস্থলীতে চারটি প্রকোষ্ঠ থাকে নাম বল। ৩১। যকৃৎ গ্রন্থিটি কি প্রকার গ্রন্থি? ইহার মূল কার্য কি? (মাধ্যঃ, ১৯৭৭) ৩২। আমরা কি সেলুলোজ পরিপাক করতে পারি? কোন্ কোন্ স্তন্যপায়ী পারে? ৩৩। আমাদের পাকস্থলীতে কোন্ অ্যাসিড উৎপন্ন হয়? ৩৪। মানুষের অন্ননালীর কোন্ অংশে জল ও লবণ শোষিত হয়?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ॥ সংবহন ও রক্ত পৃষ্ঠা ৬০—৮৬

১। উদ্ভিদদেহে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড কোন্ কোন্ পথে প্রবেশ করে? ২। গাছ কঠিন খাদ্য খাইতে পারে না কেন? (মাধ্যঃ ১৯৭৬) ৩। উদ্ভিদদেহে জল ও খনিজ-লবণ কোন্ পথে প্রবেশ করে? ৪। খাদ্য কোন্ পথে উদ্ভিদের দেহের মধ্যে সংবাহিত হয়? ৫। রক্ত কি? জীবদেহে রক্তের কার্য কি বল। (মাধ্যঃ, ১৯৭৭) ৬। তুমি কি রক্তকণিকা দেখিয়াছ? ইহা কিসের সাহায্যে দেখা যায়? (মাধ্যঃ, ১৯৭৭) ৭। হিমোগ্লোবিন কি? ইহার কার্য কি? কোন্ অমেরুদণ্ডী প্রাণীর দেহে ইহা পাওয়া যায়? (মাধ্যঃ, ১৯৭৭) ৮। রক্তের রং লাল কেন? ৯। চিংড়ির রক্তের রং নীল কেন? ১০। পূর্ণবয়স্ক মানুষের দেহে কি পরিমাণ রক্ত থাকে? ১১। মানুষের লোহিত রক্তকণিকার আয়ু কতদিন? ১২। লোহিত রক্তকণিকার উৎপন্ন স্থান এবং ধ্বংসের স্থান কোথায়? ১৩। শ্বেত রক্তকণিকার উৎপন্ন স্থান কোথায় ও কতদিন সক্রিয় থাকে? ১৪। রক্তের মধ্যে শ্বেত রক্তকণিকার অত্যধিক বৃদ্ধিজাত রোগকে কি বলে? ১৫। অণুচক্রিকার কার্য কি? ১৬। প্লাজমা এবং সিরামের মধ্যে পার্থক্য কি? ১৭। কোন্ স্তন্যপায়ীর লোহিত রক্তকণিকায় নিউক্লিয়াস আছে? ১৮। ভ্যাকসিন কাকে বলে? একটি ভ্যাকসিনের নাম বল। ১৯। কোন্ শ্রেণীর রক্তকে সার্বজনীন দাতা বলে? ২০। উইলিয়াম হার্ভে কে? ২১। হৃদ্‌পিণ্ডের কার্য কি? (মাধ্যঃ, ১৯৭৭) ২২। হৃদ্‌পিণ্ডের শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়—যন্ত্রটির নাম কি? তোমার হৃদ্‌পিণ্ডের গতির হার কিভাবে গণনা করা যায়? (মাধ্যঃ, ১৯৭৭) ২৩। ব্যাঙের হৃদ্‌যন্ত্রে কয়টি প্রকোষ্ঠ আছে? (১৯৭৬) ২৪। অনুষ্ণশোণিতবিশিষ্ট প্রাণী কারা? (মাধ্যঃ ১৯৭৬) ২৫। ধমনী ও শিরা কি রকম রক্ত বহন করে? (মাধ্যঃ, ১৯৭৬) ২৬। ফুসফুসীয় ধমনী কি রকম রক্ত বহন করে? ২৭। মানুষের

হৃদ্‌যন্ত্র প্রতি মিনিটে কতবার সংকুচিত ও প্রসারিত হয়? ২৮। রক্তচাপ মাপার যন্ত্রের নাম কি?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥ চলন ও গমন পৃষ্ঠা ৮৭—১০৬

১। একজন বিখ্যাত ভারতীয় উদ্ভিদ বিজ্ঞানীর নাম বল। ২। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু কে ছিলেন? তিনি কিসের জন্য বিখ্যাত? (মাধ্যঃ ১৯৭৭) ৩। অভিকর্ষবৃত্তি কাহাকে বলে? (মাধ্যঃ ১৯৭৭) ৪। গমন ও চলনের মধ্যে তফাৎ কি? ৫। উদ্ভিদ কাণ্ডের আলোর দিকে ধাবিত হওয়াকে কোন্ চলন বলে? ৬। লজ্জাবতী লতার পাতায় হাত দিলে পাতাগুলি নুয়ে পড়ে—একে কি বলে? ৭। মূল ও কাণ্ডের বৃদ্ধি কোন্ হরমোন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়? ৮। ক্ষণপদের সাহায্যে কোন্ প্রাণীর চলন ঘটে? ৯। মাছের ও শামুকের চলন অঙ্গ কি? ইহাদের মধ্যে কাহার গতি মন্থর? (মাধ্যঃ ১৯৭৭)। ১০। সাপের পা নেই, তারা কার সাহায্যে চলে? ১১। লিপ্তপাদ প্রাণী কারা? ১২। পাখীদের ডানা কার রূপান্তর?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥ রেচন পৃষ্ঠা ১০৭—১১৬

১। বিপাকক্রিয়ায় উৎপন্ন বস্তুকে কি বলে? ২। গাছ দূষিত পদার্থ কিরূপে পরিত্যাগ করে? (মাধ্যঃ, ১৯৭৬)। ৩। ওল, কচু ইত্যাদি খেলে গলা কুটকুট করে, কিসের জন্য? ৪। সিস্টোলিথ কি? কোথায় থাকে? (মাধ্যঃ ১৯৭৭)। ৫। সিঙ্কোনা গাছ হইতে কি পাওয়া যায়? (মাধ্যঃ, ১৯৭৭)। ৬। তরুক্ষীর কি জাতীয় পদার্থ? ৭। অ্যামিবার রেচন পদার্থ যে গহ্বরের মধ্যে সঞ্চিত থাকে তাকে কি বলে? ৮। কেঁচোর রেচন যন্ত্রের নাম কি? (মাধ্যঃ, ১৯৭৭)। ৯। চিংড়ির রেচন যন্ত্রের নাম কি? এই যন্ত্রের আকার কেমন? (মাধ্যঃ, ১৯৭৭)। ১০। ব্যাঙের দেহে কতগুলি বৃক্ক থাকে? (মাধ্যঃ ১৯৭৭)। ১১। ব্যাঙের শরীরের দূষিত পদার্থ কোন্ পথে বাহির হয়? গাছ দূষিত পদার্থ কিরূপে পরিত্যাগ করে? ১২। মানুষের রেচন যন্ত্রের নাম কি? এই যন্ত্রের আকার কেমন? ১৩। বৃক্কের এককের নাম কি? ১৪। গুয়ানো কোন্ শ্রেণীর প্রাণী উৎপন্ন করে?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ॥ মাটি, জীবাণু ও ভাইরাস পৃষ্ঠা ১১৭ ১৩০

১। মাটি কোন্ জাতীয় শিলা দ্বারা উৎপন্ন হয়? ২। শারীরবৃত্তীয় শুষ্ক মাটি কাকে বলে? ৩। লোনা মাটি ধান চাষের পক্ষে অনুপযুক্ত কেন? (মাধ্যঃ ১৯৭৭) ৪। শিম্ব জাতীয় উদ্ভিদ চাষ করিলে জমির উর্বরতা কেন বৃদ্ধি পায়? (মাধ্যঃ ১৯৭৭)

৫। উর্বর জমির লক্ষণ কি কি? হিউমাস কাকে বলে? (মাধ্যঃ ১৯৭৭) ৬। কোন্ প্রকার মাটি চাষের পক্ষে সর্বাধিক উপযুক্ত। ৭। লাল মাটির রং লাল কেন? ৮। মাটিতে NPK-এর প্রয়োজনীয়তা কেন? ৯। লিউভেনহোক কি কি জীব আবিষ্কার করেন? ১০। কি যন্ত্রের যাহায্যে অণুজীবীদের পরীক্ষা করা হয়? (মাধ্যঃ ১৯৭৬, '৭৭) ১১। ব্যাকটিরিয়া কি? একটি উপকারী ব্যাকটিরিয়ার নাম কর। (মাধ্যঃ ১৯৭৭) ১২। দুইটি অপকারী ব্যাকটিরিয়ার নাম কর। (মাধ্যঃ ১৯৭৭) ১৩। দুধ জমিয়ে দই কোন্ ব্যাকটিরিয়া তৈয়ারী করে? ১৪। মানুষের কোন্ কোন্ রোগ ব্যাকটিরিয়া দ্বারা ঘটে? ১৫। সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র জীবাণুর নাম কি? ১৬। ভাইরাস কি? (মাধ্যঃ ১৯৭৭) ১৭। দুটি ভাইরাস-ঘটিত ব্যাধির নাম কর। ব্যাধি দুটির প্রাথমিক লক্ষণ কি কি? (মাধ্যঃ ১৯৭৭) ১৮। রক্ত আমাশয় কোন্ আদ্যপ্রাণী উৎপন্ন করে? ১৯। লুই পাস্তুর কি আবিষ্কার করেন? ২০। ব্যাকটিরিওফাজ কি?

সপ্তম পরিচ্ছেদ ॥ বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্রদের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়

পৃষ্ঠা ১৩১—১৪৮

১। জলকৃষ্টি পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা কি? ২। উদ্ভিদের সবাত শ্বসন পরীক্ষার জন্য কি কি প্রয়োজন হয়? ৩। অক্সিজেন ব্যতীত শ্বসন পরীক্ষার জন্য কি কি প্রয়োজন? ৪। সূর্যালোক ব্যতীত সালোকসংশ্লেষ হয় না—এই পরীক্ষায় কি কি প্রয়োজন? ৫। মোলের অর্ধপত্র পরীক্ষা কি জন্য করা হয় বল। ৬। কেঁচোর পিঠের দিক কি করিয়া চিনিবে? ৭। কেঁচো বা আরশোলার ব্যবচ্ছেদের সময় পিঠের দিকে চিরতে এবং ব্যাঙ ব্যবচ্ছেদের সময় পেটের দিকে চিরতে হয় কেন? ৮। কুনো ব্যাঙকে ব্যবচ্ছেদের সময় অজ্ঞান করার প্রয়োজন হয় কেন? ব্যাঙ ব্যবচ্ছেদের জন্য কি কি যন্ত্র প্রয়োজন? (মাধ্যঃ ১৯৭৭) ৯। কোন্ মশা ম্যালেরিয়ার জীবাণু বহন করে? (মাধ্যঃ ১৯৭৬) ১০। মশার জীবন-বৃত্তান্তের বিভিন্ন দশা কোথা থেকে সংগ্রহ করা যায়? ১১। শারীরিক পরিশ্রমের ক্ষমতা কোন্ পরীক্ষার মাধ্যমে নির্ণয় করা যায় বল। ১২। পরিশ্রম করিলে শ্বসন ও হৃদপিণ্ডের গতি বাড়ে না কমে? (মাধ্যঃ ১৯৭৭)

[illegible]